ইসলাম ও হিন্দুধর্মে ঐশী প্রেম:

একটি দার্শনিক পর্যালোচনা

মোঃ জামাল হোসেন

দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম ও হিন্দুধর্মে ঐশী প্রেম:

একটি দার্শনিক পর্যালোচনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

মোঃ জামাল হোসেন

দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যাল
ঢাকা
জানুয়ারী, ২০০৩

401594

পরীক্ষার রোল নং ০৩
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এম.ফিল.
নিবন্ধন নং ১৪৩/৯৫-৯৬
শিক্ষাবর্ষ ১৯৯৫/৯৬

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ড. কাওসার মুস্তাফা
সহযোগী অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, অত্র অভিসন্দর্ভে যে সব গ্রন্থ ও জার্নাল থেকে সাহায্য নেয়া হয়েছে তার উল্লেখ তথ্য নির্দেশিকায় রয়েছে। অভিসন্দর্ভটি গবেষকের নিজস্ব গবেষণার ফসল। এও প্রত্যয়ন করছি যে, এই অভিসন্দর্ভ বা এর অংশ বিশেষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানের এম.ফিল. বা পি-এইচ.ডি. বা উচ্চতর কোন ডিগ্রীর জন্য জমা দেয়া হয়নি।

তত্ত্বাবধায়ক

০৭.০১.০৬

ড. কাওসার মুস্তাফা
সহযোগী অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

০৭.০১.০৬

মোঃ জামাল হোসেন
এম. ফিল. গবেষক
দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বর্তমান গবেষণা কর্মের জন্য আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. কাওসার মুস্তাফার নিকট সর্বান্তকরণে ঋণ স্বীকার করছি। তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ নির্দেশনা এবং আন্তরিক তত্ত্বাবধানের ফলে এই অভিসন্দর্ভ রচনা সম্ভব হয়েছে। কেবল গবেষণার জন্যই নয়, বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক অধ্যয়নে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হওয়ার জন্যও আমি তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ। দর্শন বিভাগের প্রফেসর ড. আনিসুজ্জামান, ড. ফজলুল ওয়াহিদ, ড. আজিজুন্নাহার ইসলাম প্রমুখ তুলনামূলক ধর্ম অধ্যয়নে উদ্বুদ্ধ করেছেন, অনেক ক্ষেত্রে সাহায্য করেছেন এবং পাণ্ডুলিপি দেখে মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন আমি তাঁদের নিকটও কৃতজ্ঞ। ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়ন ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান প্রফেসর কাজী নূরুল ইসলাম পরামর্শ ও সহযোগিতা দিয়েছেন।আমি তাঁর প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই বছরের এম.ফিল. কোর্সের প্রথম বর্ষে বিভাগীয় পাঠ্যসূচী অনুযায়ী অধ্যয়ন করতে হয়। তাই আমাকে প্রথম বর্ষে দুইটি কোর্সের অধীনে পাঁচটি টেক্সট বই পড়তে হয়েছে। এই টেক্সটগুলো পড়িয়েছেন বিভাগের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এবং অভিজ্ঞ শিক্ষকবৃন্দ। এঁদের মধ্যে রয়েছেন প্রফেসর ড. নীরু কুমার চাকমা, ড. কাজী নূরুল ইসলাম, ড. কাওসার মুস্তাফা এবং ড.একে এম সালাহ উদ্দীন। তাঁরা প্রত্যেকে নির্ধারিত টেক্সট বইয়ের প্রতিটা অধ্যায় (অনেক সময় অতিরিক্ত সময় নিয়েও) আমাকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। সে সুবাদে আমি ভালভাবে প্রথম বর্ষে উত্তীর্ণ হয়ে বর্তমান অভিসন্দর্ভ রচনার সুযোগ পেয়েছি। এতদ্ব্যতীত তাঁরা আমার গবেষণাকর্মে বিভিন্ন সময় পরামর্শ দিয়েছেন ও উৎসাহ যুগিয়েছেন। আমি তাঁদের প্রত্যেকের কাছে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ। বর্তমান অভিসন্দর্ভের জন্য আমি বিভিন্ন জনের নিকট থেকে বিভিন্নভাবে সাহায্য পেয়েছি। ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ইমেরিটাস ড. সিরাজুল হক এবং মুফতি আবু ইউসুফ সাহেবের নিকট থেকে অনেক সাহায্য পেয়েছি। আমি তাঁদের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ঢাকা সিটি কলেজের অধ্যাপক কাজলেন্দু দে এবং সুভাষ চন্দ্র দাস বিভিন্ন তথ্য দিয়ে আমাকে উপকৃত করেছেন। একই কলেজের সহকারী অধ্যাপক আবুল খায়ের মোঃ ইউনুস তাঁর গুরুত্বপূর্ণ সময় দিয়ে পাণ্ডুলিপির অংশ বিশেষ দেখে মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। আমি তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

দর্শন বিভাগের প্রবীন এবং খ্যাতনামা প্রফেসর ড. আবদুল মতীন এবং ড. আমিনুল ইসলামের মানবতাবাদী, প্রায়োগিক ও বাস্তবমুখী দর্শন এই গবেষণাক্রমে আমাকে উৎসাহ যুগিয়েছে। তাই এই সুযোগে আমি তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বিভাগের চেয়ারম্যান ড. ফজলুল ওয়াহিদ এবং সহযোগী অধ্যাপক রাশিদা আখতার খানম গবেষণা-কর্মের প্রতিনিয়ত খোঁজ-খবর নিয়েছেন এবং উৎসাহ দিয়েছেন। আমি তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞ।

মোঃ জামাল হোসেন

দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা
জানুয়ারী, ২০০৩

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় বিন্যাস

পৃষ্ঠাঙ্ক

ঘোষণাপত্র তিন

কৃতজ্ঞতা স্বীকার চার

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা ১-৮

তথ্যনির্দেশ ৮

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলাম ও হিন্দুধর্মে সত্তা সম্পর্কিত ধারণা ৯-৬১

১. দর্শনে সত্তা ১০-১৩

১.১ ইসলামে পরমসত্তা ১৩-১৭

১.১ হিন্দুধর্মেপরমসত্তা ১৭-২৪

২. জগৎসত্তা (জগৎ সম্পর্কে সূফী ও হিন্দু মরমীদের ধারণা) ২৪-৩৩

২.১ ইসলামী ধারণা ২৪-২৯

২.২ জগৎ সম্পর্কে হিন্দু ধারণা ৩০-৩৩

৩. মানবাত্মার স্বরূপ ৩৩-৪৮

৩.১ আত্মা সম্পর্কে ইসলামী ধারণা ৩৩-৪১

কুরআনে নফ্স শব্দের বিভিন্ন অর্থ ৩৪

নফ্সের বৈশিষ্ট্য ৩৫

রূহ শব্দের বিভিন্ন অর্থ ৩৬-৩৭

চার প্রকার রূহের বর্ণনা ৩৭-৪০

আত্মা বস্তুগত না আধ্যাত্মিক দ্রব্য ৪০-৪১

Dhaka University Institutional Repository

৩.২ হিন্দুধর্মে আত্মা ৪১-৪৮
আত্মার প্রকারভেদ ৪২-৪৪
ব্যবহারিক আত্মা ৪৩-৪৪
বিশুদ্ধ আত্মা ৪৪-৪৫
ব্রহ্ম অর্থে আত্মা ৪৫
জীবাত্মা অর্থে আত্মা ৪৬
আত্মার পরিণাম ৪৬-৪৮
৪. মরণোত্তর জীবন ৪৮-৬১
৪.১. ইসলামে মরণোত্তর জীবন ৪৮-৫২
৪.২. হিন্দুধর্মে মরণোত্তর জীবন ৫২-৫৬
তথ্যনির্দেশ ৫৬-৬১

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামে ঐশী প্রেম ৬২-১১৭

১। ঐশী প্রেম ৬৪-৬৫
২। ঐশী প্রেমের ধারণার উৎস ৬৫-৭১
৩। ঐশী প্রেমের স্বরূপ ৭১-৭৩
৪। ঐশী প্রেমের বৈশিষ্ট্য ৭৩-৮০
৫। ঐশী প্রেম লাভের উপায় ৮০-১০৪
৫.১. শরীয়ত ৮২
৫.১.১ আদেশমূলক কাজ ৮২
৫.১.২ নিষেধমূলক কাজ ৮৩
৫.২ তরীকত বা আত্মশুদ্ধির সাধনা ৮৩-১০৪
৫.২.১ পরিবর্জনীয় মন্দ স্বভাব ৮৪-৯২
৫.২.২ অর্জনযোগ্য সদ্‌গুণ ৯২-১০৪
৬। মারিফাত ১০৪-১০৬
৭। ঐশী প্রেমের অবস্থা ১০৭-১১২
তথ্যনির্দেশ ১১৩-১১৭

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

হিন্দুধর্মে ঐশী প্রেম ১১৮-১৫৭

১. ঐশী প্রেম ১১৯-১২০

১.১ ঐশী প্রেমের লক্ষণ ১২০-১২২

২। ঐশী প্রেমের স্বরূপ ১২২-১২৫

৩। ঈশ্বরের সাথে মানুষের প্রেম ১২৫-১২৬

৪। ঐশী প্রেম লাভের উপায় ১২৬-১৪১

৪.১ ভক্তিযোগের পরিচয় ১২৭-১২৯

৪.১.১ ভক্তির তাৎপর্য ১২৯-১৩০

৪.২। নৈতিক বিশুদ্ধতা ১৩০-১৪১

৪.৩। মুক্তি লাভের উপায় হিসাবে ভক্তি ১৪১-১৪৩

৫। ঐশী প্রেমের অবস্থা ১৪৩-১৪৭

৫.১। ঐশী প্রেম ও ঈশ্বরের করুণা ১৪৭-১৪৮

৫.২। গৌণী ও পরাভক্তি ১৪৮-১৫৩

৫.২.১। গৌণীভক্তি ১৪৮-১৪৯

৫.২.২। পরাভক্তি ১৪৯-১৫৩

তথ্যনির্দেশ ১৫৩-১৫৭

পঞ্চম অধ্যায়

ঐশী প্রেম সম্পর্কে ইসলাম ও হিন্দু মতের তুলনামূলক পর্যালোচনা ১৫৮-১৭১

ঐশী প্রেম সম্পর্কে ইসলাম ও হিন্দু মতের সাদৃশ্য ১৫৯-১৬৫

ঐশী প্রেম সম্পর্কে ইসলাম ও হিন্দু মতের বৈসাদৃশ্য ১৬৫-১৭০

তথ্যনির্দেশ ১৭১

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার ১৭২-১৭৭

গ্রন্থপঞ্জী ১৭৯-১৮৬

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়
ভূমিকা

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

প্রেম শব্দটির ব্যঞ্জনা অতিব্যাপক। এই বিশ্বের বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যায় প্রেমের আশ্রয় নেওয়া হয়ে থাকে। মরমী চিন্তাবিদেরা জগতের সৃষ্টির মূল হিসাবে প্রেমকে বিবেচনা করে থাকেন। জাগতিক রহস্যসমূহ উদঘাটনের প্রয়াস তারা প্রেমের মাধ্যমেই পেয়ে থাকেন। পাশ্চাত্য দর্শনে প্রেম সংক্রান্ত আলোচনা খুব সীমিত আকারে থাকলেও প্রাচ্যে এটি অত্যন্ত গুরুত্ব পেয়েছে। গ্রিক দার্শনিক এম্পিডোক্লিসের চিন্তাধারায় প্রেমের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। তিনি জাগতিক বিভিন্ন ঘটনাবলীর মধ্যকার ঐক্য-বিভাজনের কারণ হিসাবে যথাক্রমে প্রেম ও বিদ্বেষকে নির্দেশ করেছেন। তিনি জগতের বিভিন্ন বস্তুসমূহের ঐক্য ও সংহতির মধ্যে প্রেমের নির্দশন খুঁজে পেয়েছেন।[১]

নব্য প্লেটোবাদী চিন্তাবিদ প্লোটিনাস (২০৪-২৬৭ খ্রিঃ) তাঁর দর্শন আলোচনার এক পর্যায়ে এসে ঈশ্বরের সাথে একীভূত হওয়ার দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, অনুধ্যানমূলক চিন্তার মাধ্যমে ঈশ্বরের সাথে একীভূত হওয়ার স্তরে পৌছা সম্ভব নয়। ঈশ্বরের সাথে একীভূত হওয়ার স্তরটিকে তিনি সর্বোচচ স্তর হিসাবে অভিহিত করেছেন। এবং এই স্তরে পৌছা শুধুমাত্র তন্ময়তার মাধ্যমেই সম্ভব বলে উল্লেখ করেছেন।[২] গভীর প্রেমানুভূতির মাধ্যমেই তন্ময়তা অর্জন সম্ভব হয়। অতএব দেখা যাচেছ যে, প্লোটিনাসের চিন্তাধারায়ও প্রেম সর্বোচচ গুরুত্ব পেয়েছে।

পৃথিবীর প্রায় সবকটি ধর্মেরই উদ্ভব হয়েছে প্রাচ্যে। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণথেকে মানুষের পৃথিবীতে আবির্ভাবের ইতিহাস ও ধর্মের ইতিহাস অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। মানুষ সৃষ্টির মূলে প্রেমই মুখ্য বিষয় ছিল বলে ইকবালসহ অনেক দার্শনিকই উল্লেখ করেছেন। হিন্দুধর্মের অন্যতম গ্রন্থ উপনিষদেও সৃষ্টির

Dhaka University Institutional Repository

কারণ হিসাবে প্রেমের কথা বলা হয়েছে। আবার প্রেম ভক্তির মাধ্যমেই যে, তাকে লাভ করা যায় বেদান্ত দার্শনিক রামানুজ, মাধ্ব প্রমুখ তা স্বীকার করেছেন। মরমীরা সৃষ্টির প্রতিটা ক্ষেত্রেই প্রেমের নির্দশন দেখতে পান। ঈশ্বরকে স্রষ্টা ও পালনকর্তা হিসাবে বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়।

বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মরমী কবি হিসাবে পরিচিত মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমী তাঁর অমর কাব্যগ্রন্থ মসনবীসহ অন্যান্য গ্রন্থে জগতের সবকিছুতেই প্রেমের উপস্থিতি রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। সূফী এবং হিন্দু মরমীদের বিভিন্ন রচনাবলীতে এ বিষয়টির সুস্পষ্ট উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মরমীদের মতে সৃষ্টি রহস্য বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা বা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে উদঘাটন করা সম্ভব নয়। সৃষ্টির সূক্ষ্ম ও জটিল বিষয়সমূহের সম্যক ধারণা একজন প্রেমিকের হৃদয়ে প্রকাশ পায় বলে আল-গাযালীসহ অনেক মরমী দার্শনিকেরা উল্লেখ করেছেন।

ইতোমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, অনেকের মতে মানুষ সৃষ্টির পিছনে প্রেমই ছিল মুখ্য বিষয়। মানব রহস্য উন্মোচনের সাথে ঐশ্বরিক জ্ঞানের একটি যোগসূত্র রয়েছে। প্রচলিত পাশ্চাত্য দর্শনে চিন্তা বা প্রত্যয়ের সাহায্যে ঈশ্বরকে জানতে চেষ্টা করা হয় এবং ধরে নেয়া হয় যে, ঈশ্বর আমাদের বুদ্ধির বিষয়ভূত বস্তু। কিন্তু চিন্তা প্রত্যয়ের মাধ্যমে ঈশ্বরকে বর্ণনা করা গেলেও ঐ বর্ণনা কতখানি পর্যন্ত তা প্রশ্ন সাপেক্ষ। দর্শনে এ বিষয়ক বিতর্ক চলছে হাজার বছর ধরে। মরমী দর্শন অনুযায়ী মানুষকে জানার মত ঈশ্বরকে জানারও প্রকৃত মাধ্যম হলো প্রেম। প্রেম, প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের মধ্যকার পার্থক্য দ্রবীভূত করে ফেলে। মরমীদের নিকট প্রকৃত প্রেমাস্পদ হলেন ঈশ্বর বা আল্লাহ্; সূফী পরিভাষায় যাকে বলা হয়ে থাকে মাশুকে হাকীকী। একজন প্রেমিক চিন্তা-চেতনা ও অনুভূতিতে প্রেমাস্পদ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না। তাই দেখা যায় তার আত্মানুভূতি ও আত্মোপলব্ধি বা আত্মপরিচয় এক পর্যায়ে এসে প্রেমাস্পদের উপলব্ধি বা পরিচয়ে পর্যবসিত হয়। সেই প্রেক্ষিতে হয়তো সমগ্র সূফীদের ইমাম ও জ্ঞানের নগরীর (মাদীনাতুল ইলম) ফটক হিসাবে খ্যাত হযরত আলী এই বিখ্যাত উক্তি করেছিলেন-"মান আরাফা নাফসাহু, ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু"

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ যে নিজের পরিচয় পেয়েছে সেই তার প্রতিপালকের পরিচয় পেয়েছে।

বর্তমান অভিসন্দর্ভে ইসলাম ও হিন্দুধর্মের ঐশী প্রেম বিষয়ক একটি তুলনামূলক আলোচনার বিনীত প্রয়াস চালানো হয়েছে।

পৃথিবীর বৃহৎ ধর্মগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো ইসলাম। ইহা একটি বিশ্বজনীন ধর্ম। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স.) (৫৭০-৬৩২খ্রিঃ) এই ধর্মের প্রবর্তক হলেও আদিমানব হযরত আদম (আ.) থেকে মহান আল্লাহ্ কর্তৃক যুগে যুগে প্রেরিত বিভিন্ন মহাপুরুষ বা বার্তাবাহক (নবী) এর প্রচারক হিসাবে অভিহিত হয়ে থাকেন। শেষ নবী মুহাম্মদ (স.) এর মাধ্যমে এ ধর্মটি পরিপূর্ণতা লাভ করে। তাই এক কথায় বলা যায় আল্লাহ্ মানব সৃষ্টির প্রথম অবস্থা থেকে তাঁর সন্তোষ প্রাপ্তির জন্য যুগে যুগে মানবের জন্য যে যুগোপযোগী জীবন বিধান দিয়েছেন তার সাধারণ নাম ইসলাম।[৩] ইসলাম শব্দটি আরবী সালম শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ আত্মসমর্পন বা শান্তি স্থাপন। আর শান্তি স্থাপনকারীদের বলা হয় মুসলিম। স্রষ্টার প্রতি পরিপূর্ণ আত্মসমর্পন ও সৃষ্টির প্রতি দয়াশীলতা প্রদর্শন ও ভালবাসার বন্ধনে সবাইকে আবদ্ধ করাই ইসলামের মর্মবাণী। খোদার কাছে আত্মসমর্পনের সাথে শান্তি স্থাপনের একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। কেননা আল্লাহ্র কাছে আত্মসমর্পনের অর্থ হলো, নিজের লোভ-লালসা, ক্রোধ, ঘৃণা, হিংসা, বিদ্বেষসহ যাবতীয় নিন্দনীয় কার্যাবলী ও মানসিকতার পরিবর্জন এবং খোদাই সিফাত অর্থাৎ ঔদার্য, সহানুভূতি, দানশীলতা,ক্ষমাশীল, দয়া-দাক্ষিণ্য ইত্যাদি গুণাবলী অর্জন। তাইতো নির্দেশ এসেছে- "তুখাল্লাকু বি আখলাকিল্লাহ্" অর্থাৎ আল্লাহ্র স্বভাব সৃষ্টি কর। তাই মানুষে-মানুষে, জাতিতে-জাতিতে যে এক নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে, সকল মানুষই যে খোদার প্রতিনিধি সে উপলব্ধি ছাড়া প্রকৃত আত্মসমর্পনকারী হওয়া সম্ভব নয়। খোদার সৃষ্টি সকল মানুষের মধ্যেই খোদার বার্তাবাহক আবির্ভূত হয়েছে, প্রত্যেক জাতিই খোদার প্রত্যাদেশ পেয়েছে এসব কথার উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনের সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে: এমন কোন সম্প্রদায় অতীত হয়নি যাদের মধ্যে কোন সর্তককারী প্রেরিত হয়নি'।[৪] আল্লাহ্ আরো বলেন: 'তোমরা বল: আমরা ঈমান এনেছি

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ্‌র উপর এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে ইবরাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তাঁর বংশধরদের প্রতি এবং যা দেওয়া হয়েছে মূসা ও ঈসাকে এবং যা দেয়া হয়েছে অন্যান্য নবীদের উপর তাঁদের প্রতিপালকদের কাছ থেকে। আমরা তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করিনা।"[৫] কাজেই ইহা সুস্পষ্ট যে, সমগ্র মানবজাতিকে এক পরিবারভুক্ত মনে করা এবং জগতের সকল নবী-রাসূল বা প্রেরিত পুরুষদের প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাবোধ প্রত্যেক মুসলমানদের ঈমানের অপরিহার্য অঙ্গ। ইসলামের মূলনীতি, শিক্ষা ও আদর্শ আল্লাহ্‌ কর্তৃক মুহাম্মদ (স.) নিকট অবতীর্ণ হয়েছে।

প্রচলিত ধর্মসমূহের মধ্যে হিন্দুধর্ম সম্ভবত সবচেয়ে প্রাচীন। এ ধর্ম বৈদিক ধর্ম, আর্য ধর্ম, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ইত্যাদি নামেও পরিচিত। আবার শাশ্বত সত্য সম্বলিত এবং প্রাচীনকাল থেকে বিদ্যমান বলে একে সনাতন ধর্মও বলা হয়। ইহা একটি প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম হলেও কোন একজন মাত্র নির্দিষ্ট প্রবর্তক বা ঈশ্বরের অবতার বা মুনিঋষি ধর্মসংস্কারকের সুমহান বাণীর উপর এই ধর্ম প্রতিষ্ঠিত নয়। প্রাচীন যুগের, মধ্য যুগের এবং আধুনিক যুগের একাধিক ভারতীয় মুনিঋষি, সত্যদ্রষ্টা, আচার্য এবং ভক্তের বিচিত্র ধর্ম সম্বন্ধীয় নৈতিক অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষা ও উপদেশের উপর এই ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। এ ধর্ম বৈচিত্র্যময় ধর্মীয় অভিজ্ঞতার সমাহার। হিন্দুধর্মে কোন একক ধর্ম গ্রন্থ অনুসৃত হয় না; এ ধর্মে রয়েছে একাধিক গ্রন্থ। এ সবের মধ্যে বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, ধর্মসূত্র, ধর্মশাস্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত, ভগবতগীতা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ। শান্তি, প্রেম, সহানুভূতি ও সেবাই হিন্দুধর্মের মূলমন্ত্র। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি হিন্দুধর্ম হলো বিভিন্ন ধরনের ধর্ম অভিজ্ঞতার সমাবেশ। তাই পরবর্তীকালে হিন্দুধর্মে শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপাত্য ও বৈষ্ণব এই পাঁচটি সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে।

ইসলাম ও হিন্দুধর্মের মৌলিক নীতি সমূহের মধ্যে অন্যতম হলো প্রেম বা শান্তি। অবশ্য জগতের সকল ধর্মেরই মূলমন্ত্র প্রেম। দর্শনেও প্রেম সম্পর্কে গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করা হয়েছে। সত্য সুন্দর এবং কল্যাণই দর্শনের ভিত্তি। প্রেম একটি মৌলিক ও সার্বজনীন বিষয় হলেও ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের ঐশী প্রেমের ধারণার মধ্যে যেমন সাদৃশ্য রয়েছে, তেমনি কিছু কিছু

Dhaka University Institutional Repository

বৈসাদৃশ্যও লক্ষ্য করা যায়। তবে বৈসাদৃশ্যের তুলনায় সাদৃশ্যই বেশি।এই সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উভয় ধর্মের জীবনবোধের মধ্যেই নিহিত। যেমন ইসলাম ধর্মানুসারে মানুষের পার্থিব জীবন হলো মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের প্রস্তুতি ক্ষেত্র। পার্থিব জীবনে মানুষ যে কর্ম করবে, সে অনুসারে মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে জান্নাত বা জাহান্নামে গমন করবে, কিংবা আল্লাহ্‌র প্রেমময় মিলন লাভ করবে। অন্যদিকে হিন্দুধর্ম কর্ম ও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। কর্মবাদের মূলে হলো মানুষ কর্মানুসারে ফলভোগ করবে। সৎ কাজের জন্য সে পুরস্কৃত হবে এবং পাপ কাজের জন্য সে শাস্তি ভোগ করবে। আর জন্মান্তরবাদের মূল কথা হচ্ছে মানব জীবনের মূল লক্ষ্যমোক্ষ লাভ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মানুষ তার কর্মানুসারে পৃথিবীতে বারবার জন্মগ্রহণ করে তার কর্মের ফল ভোগ করবে। এ পরিক্রমায় কখনো কখনো সে সাময়িক সময়ের জন্য স্বর্গ বা নরকে গমন করবে। তবে মানুষ যখন মোক্ষ বা মুক্তি লাভ করবে তখন সে পরমসত্তার সাথে মিলিত হবে । অতঃপর তার আর পুনঃ জন্ম হবে না।

প্রেম ইসলাম ও হিন্দুধর্মের অন্যতম মূলনীতি হলেও এই প্রেমের ধারণার উপর সবচেয়ে জোর দেয় উভয় ধর্মের মরমীবাদীরা। অর্থাৎ ইসলামে সূফী সম্প্রদায় এবং হিন্দু ধর্মে বৈষ্ণব তথা ভক্তিবাদীরা।ঐশী প্রেমের সাদৃশ্যমূলক বিষয় হচ্ছে- উভয় ধর্মের প্রেমের লক্ষ্য হচ্ছে পরমসত্তার সাথে মিলন; উভয় ধর্ম পার্থিব জীবনকে পরমসত্তার সাথে মিলন লাভের প্রস্তুতি ক্ষেত্র হিসাবে মনে করে; উভয় ধর্ম প্রেম লাভের জন্য আত্মশুদ্ধির উপর জোর দেয়, আর এ জন্য মানব প্রবৃত্তির কুপ্রবৃত্তিগুলো দূর করে মানবিক উৎকর্ষের জন্য কতকগুলো মহৎ গুণ অর্জনের কথা বলে।

বর্তমান অভিসন্দর্ভের মূল অধ্যায়সমূহ হচ্ছে: ইসলাম ও হিন্দুধর্মে সত্তা সম্পর্কিত ধারণা; ইসলামে ঐশী প্রেম; হিন্দুধর্মে ঐশী প্রেম; ঐশী প্রেম সম্পর্কে ইসলাম ও হিন্দু মতের তুলনামূলক পর্যালোচনা এবং উপসংহার।

'ইসলাম ও হিন্দুধর্মে সত্তা সম্পর্কিত ধারণা' শীর্ষক দ্বিতীয় অধ্যায়ে পরমসত্তা, জগৎ সম্পর্কে সূফী ও হিন্দু মরমীদের ধারণা, আত্মা এবং মরণোত্তর জীবন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ঐশী প্রেমের লক্ষ্য

Dhaka University Institutional Repository

হচেছ পরম সত্তার মিলন; আর এই মিলন হয় সাধকের হৃদয় মানসে। আবার এই মিলন লাভের জন্য প্রয়োজন সাধনার। আর এই সাধনার ক্ষেত্র হচেছ পার্থিব জীবন। তাই এই অধ্যায়ে সুস্পষ্ট করা হয়েছে পরম প্রেমময়ের স্বরূপ, আত্মার স্বরূপ ও তার পরিণতি, জগতের স্বরূপ ও পার্থিব জীবনে মানবের লক্ষ্য উদ্দেশ্য এবং মরণোত্তর জীবনে কিভাবে বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে প্রেমিক তার প্রেমাস্পদের সাথে মিলিত হয়।

তৃতীয় অধ্যায়, 'ইসলামে ঐশী প্রেম' শীর্ষক আলোচনায় প্রেম সম্পর্কে ইসলামী মরমী তথা সূফীদের বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে ঐশী প্রেমের স্বরূপ বৈশিষ্ট্য,এই প্রেম লাভের সাধনা, প্রেমিকের অবস্থা। প্রেম লাভের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন প্রেমের স্বরূপকে জানা। তাই প্রথমে ইহা ব্যাখা করা হয়েছে, অতঃপর প্রেমের সাধনা তথা আত্মশুদ্ধির বিভিন্ন স্তর। এখন প্রশ্ন হচেছ আত্মশুদ্ধি হলেই কি সাধক পরমসত্তাকে জানতে এবং তাঁর প্রেম লাভ করতে পারবে? এই প্রশ্নের উত্তরে ব্যাখ্যা করা হয়েছে আত্মশুদ্ধিই প্রেম লাভের জন্য যথেষ্ট নয়; এর জন্য প্রয়োজন আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহেই সাধক আল্লাহ্‌কে জানতে, সর্বোপরি তাঁর প্রেম লাভ করতে পারবে। এই অধ্যায়ের পরিশেষে দেখানো হয়েছে প্রেম লাভের পরে প্রেমিকের বিভিন্ন অবস্থা। আর এভাবে সুস্পষ্ট করা হয়েছে ইসলামের ঐশী প্রেমের ধারণাকে।

চতুর্থ অধ্যায়ে, 'হিন্দুধর্মে ঐশী প্রেম' শীর্ষক আলোচনায় প্রেম সম্পর্কে হিন্দু ধর্মের মতামত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। হিন্দুধর্মে ঐশী প্রেম বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায় ভক্তিবাদীদের মধ্যে। হিন্দুধর্মে প্রেম ভক্তিকে একই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। তাই এখানে ভক্তির স্বরূপকে সুস্পষ্ট করা হয়েছে। এবং পূর্বোক্ত অধ্যায়ের মত হিন্দু মতে ঐশী প্রেমের স্বরূপ, বৈশিষ্ট্য, প্রেমের সাধন তথা আত্মশুদ্ধি, প্রেম ও ঈশ্বরের করুণা সম্পর্ক ঐশী প্রেমের বিভিন্ন অবস্থা ইত্যাদি আলোচনার মাধ্যমে হিন্দুধর্মের বক্তব্যকে তুলে ধরা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে, 'ঐশী প্রেম সম্পর্কে ইসলাম ও হিন্দু মতের তুলনা' শীর্ষক আলোচনায় উভয় ধর্মের ঐশী প্রেমের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। সর্বোপরি ষষ্ঠ অধ্যায়ে 'উপসংহার' শীর্ষক আলোচনায় ব্যবহারিক জীবনে প্রেমের গুরুত্বকে তুলে ধরা হয়েছে। এখানে দেখানো হয়েছে প্রেম

Dhaka University Institutional Repository

মানুষকে ঐক্যবদ্ধ ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে, তাকে নৈতিক, উদার, অহিংস, মানবতাবাদী এবং বিশ্ব প্রেমিক করে। সর্বোপরি প্রেমই যে, পরমসত্তার জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায় তা দেখানো হয়েছে। আর এ প্রচেষ্টার মাধ্যমেই এখানে প্রেমের গুরুত্বকে তুলে ধরা হয়েছে। বর্তমান অভিসন্দর্ভের উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলাম ও হিন্দুধর্মের ঐশী প্রেমের তুলনার মাধ্যমে এ সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা-'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে প্রেম।' আর এ প্রেমই পারে সমগ্র মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে, জীবের প্রেমের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে পৃথিবীকে মানুষের সুন্দর আবাস হিসেবে গড়ে তুলতে; সর্বোপরি পরমসত্তার সাথে মিলনকে সম্ভব করতে।

বর্তমান অভিসন্দর্ভে বর্ণনামূলক, বিশ্লেষণাত্মক এবং বিচারমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। উভয় ধর্মের মরমীবাদের রয়েছে সুদীর্ঘ ইতিহাস ও ঐতিহ্য। এই ঐতিহ্যকে বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে মূল উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে ইসলাম ধর্মের আলোচনায় আল-কুরআন ও আল-হাদীস এবং হিন্দুধর্মের আলোচনা প্রধানত বেদ, উপনিষদ, গীতা এবং পুরাণনির্ভর। প্রতিটা অধ্যায়ের শেষে তথ্যনির্দেশিকা উল্লেখ করা হয়েছে এবং সর্বশেষে গ্রন্থপঞ্জী দেয়া হয়েছে।

তথ্যনির্দেশ

১। Thilly, Frank., *A History of Philosophy*, (3rd ed), Allahabad, Central publishing house, p. 41

২। Ibid, P. 154

৩। আনিসুজ্জামান, *'বাংলাদেশের সূফী দর্শন: জীবনদৃষ্টি ও সাধন পদ্ধতি।'* বাঙালীর দর্শন চিন্তা, সম্পাঃ ওয়াকিল আহমদ, ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯২

৪। *আল কুরআন*, ৩৫:২৪

৫। ঐ ২:১৩৬

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলাম ও হিন্দুধর্মে সত্তা সম্পর্কিত ধারণা

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলাম ও হিন্দুধর্মে সত্তা সম্পর্কিত ধারণা

বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব যখন এই বৈচিত্র্যময় জগতের দিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকায় তখন সে বিস্ময়ে অভিভূত হয় এবং সে ভাবতে শুরু করে নিশ্চয়ই এই বৈচিত্র্যময় জগতের অন্তরালে এক পরমসত্তা রয়েছে। যার ইঙ্গিতে এ জগৎ পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। দর্শন ও ধর্মের কেন্দ্রিয় বিষয়ই হচ্ছে এ সত্তা সম্পর্কিত আলোচনা। জগতের প্রধান প্রধান ধর্মসমূহ যেমন ইসলাম, হিন্দু, খ্রিষ্ট ও ইহুদি ধর্ম এক পরম সত্তায় বিশ্বাসী। বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনে ঈশ্বরের স্থান না থাকলেও ঈশ্বরকে পেলে ও জানলে যে দুঃখ বিমুক্তি হয়, তার আকুণ্ঠ স্বীকৃতি তাতে রয়েছে।[১] বস্তুত কোন এক পরম সত্তাকে স্বীকার না করে কোন ধর্মই তার অনুসারীদের হৃদয়বৃত্তির আধ্যাত্মিকতার অভাবকে পূরণ করতে পারেনা। কারণ সসীম মানব সত্তার প্রকৃতিই হলো এক অসীম আধ্যাত্মিক সত্তার উপর নির্ভরশীলতা; যে সত্তার অনুপ্রকাশই হচ্ছে মানবাত্মা।

১. দর্শনে সত্তা

সত্তা শব্দটি তত্ত্ববিদ্যার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তত্ত্ববিজ্ঞানীগণ মনে করেন যে, অভিজ্ঞতায় আমরা যে বস্তুজগৎ দেখতে পাই তা অবভাস (appearance) মাত্র। এই অবভাসের বাইরে ইন্দ্রিয়াতীত যা তাই সত্তা। অর্থাৎ সত্তা দেশ কালের বাইরে অবস্থিত। ইহা ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা নয় বরং বুদ্ধির মাধ্যমে বোধগম্য। যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীগণ সত্তাকে দুটি অর্থে গ্রহণ করেন তত্ত্ববিদ্যাবিষয়ক ও বৈজ্ঞানিক।[২] তাদের মতে তত্ত্ববিদ্যাবিষয়ক সত্তা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যাচাইযোগ্য নয় বিধায়, বৈজ্ঞানিক আলোচনায় ইহার কোন মূল্য নেই। অন্য দিকে বৈজ্ঞানিক সত্তা বলতে বুঝায় দেশ-কালে অবস্থিত কোন বস্তুকে। কাজেই ব্যাপক অর্থে আত্মা, জগৎসত্তাও সত্তার অন্তর্ভুক্ত। এসবের মাধ্যমেই সত্তা আমাদের নিকট বোধগম্য হয়। দর্শনে সত্তা ও পরম সত্তা শব্দটি প্রায় সমার্থক। পরমসত্তা হচ্ছে সেই সত্তা যা অন্য কোন সত্তা বা তত্ত্বের ওপর নির্ভর না করে নিজে নিজেই অস্তিত্বশীল। অর্থাৎ পরমসত্তা বলতে আমরা বুঝি এক স্বাধীন, স্বয়ং সম্পূর্ণ, আত্মনির্ভরশীল সনাতন পদার্থ। পরমসত্তা সর্বব্যাপক এবং সকল বস্তুর আধার ও অস্তিত্বশীল। সুতরাং সকল বস্তু পরম সত্তার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু পরমসত্তার স্বকীয় অস্তিত্ব অন্য কোন বস্তুর উপর নির্ভরশীল

Dhaka University Institutional Repository

নয়। অর্থাৎ জগৎ ও জীব-সকল বস্তুই পরমসত্তা থেকে উদ্ভূত এবং তার মধ্যেই অবস্থিত ও সংরক্ষিত; পরমসত্তা বহির্ভূত কোন বস্তুই থাকতে পারে না। পরমসত্তা সমগ্র বিশ্বের মূল বা আদি কারণ, কিন্তু তার কোন কারণ বা কর্তা নেই, তা স্বয়ম্ভূ। তা এক সর্বধর (all inclusive) ও সুসংহত, সামগ্রিক ও সার্বজনীন অভিজ্ঞতা। যার মধ্যে সকল বৈচিত্র্যের পারস্পরিক সঙ্গতি ও ঐক্য সংরক্ষিত রয়েছে। পরম সত্তা প্রকৃত পক্ষে এক ও অদ্বিতীয়; তা একাধিক হতে পারেনা। তা একাধিক হলে জগৎ বিভিন্ন স্বতন্ত্র শক্তির নিয়ন্ত্রণে চলত, ফলে বিরোধ, বিশৃঙ্খলা ও সংঘাত দেখা দিত। কিন্তু জাগতিক বস্তুনিচয়ের মধ্যে ঐক্য সামঞ্জস্যপূর্ণ সংগঠন ও সুশৃঙ্খল বিন্যাস থাকায় আমরা এক পরম পদার্থের অধিক অনুমান করতে পারি না। বস্তুত পরমসত্তা সকল বস্তুর ধারক ও ঐক্যসূত্র বলে তা একাধিক হতে পারে না।

এখন প্রশ্ন হল দর্শনের পরমসত্তাই কি ধর্মের ঈশ্বর? এ নিয়ে দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কোন কোন দার্শনিক সম্প্রদায় পরমসত্তার সহিত ঈশ্বরের অভিন্নতা স্বীকার করেন না। আবার কোন কোন দার্শনিক সম্প্রদায় পরম সত্তা ও ঈশ্বরকে এক ও অভিন্ন বলে মনে করেন। যেমন- উইলিয়াম জেমস্, ওয়ার্ড (Ward), রাসভাল (Rashtatl), ম্যাক টাগার্ট (Mc. Taggart) শিলার (Schiller), হাওয়িসন (Howison) প্রমুখ আধুনিক বহুত্ববাদীগণ এবং ব্রাডলি (Bradely), বোসাংকোয়েট (Bosanquet) এবং শঙ্করাচার্য প্রমুখ কেবলাদ্বৈতবাদীগণ (absolutists) এই উভয় সম্প্রদায়ই মনে করেন ঈশ্বর ও পরমসত্তা এক ও অভিন্ন নয়। আধুনিক বহুত্ববাদীগণ বলেন- ঈশ্বর সসীম, অপর পক্ষে পরমসত্তা ঈশ্বর এবং অন্যান্য সসীম বস্তু ও জীবাত্মার সমষ্টি বা সংগঠন। পরমসত্তা ঈশ্বরের তুলনায় উচ্চতর সত্তা তাদের মতে পরমসত্তা হল নৈর্ব্যক্তিক (impersonal) ঐক্য; অপরপক্ষে ঈশ্বর হলেন মূর্ত সসীম পুরুষ। ঈশ্বর জীব ও জড় প্রত্যেকের স্বতন্ত্র সত্তায় বিদ্যমান আছে এবং তাদের সমষ্টি হল পরমসত্তা। বহুত্ববাদী মতবাদের অন্যতম প্রবক্তা হলেন উইলিয়াম জেমস্। তাঁর মতে-যদি কোন পরমসত্তা থাকে তবে তাকে ধর্মের ঈশ্বরের সংগে একক গণ্য করা যুক্তিসঙ্গত নয়।[৩] তাঁর মতে ধর্মের ঈশ্বর এক অতিমানবীয় সত্তা যাকে এক বাহ্য পরিবেশে কাজ করতে হয়, যার সীমা আছে এবং শত্রু আছে। ঈশ্বরের অতিরিক্ত কোন অদ্বৈত সত্তার অস্তিত্ব যদি থাকে তাহলে সেই সত্তা হল ব্যাপকতর জাগতিক সমগ্রতা, ঈশ্বর যার সবচেয়ে আদর্শ স্থানীয় বিন্দু। একইভাবে ব্রাডলী এবং শংকরাচার্য, ঈশ্বরকে পরমসত্তার অবভাস বলে অভিহিত করেন। ব্রাডলীর মতে, 'যদি আপনি পরমসত্তাকে ঈশ্বরের সংগে অভিন্ন গণ্য করেন, তাহলে তা ধর্মীয় ঈশ্বর

Dhaka University Institutional Repository

নয়। আবার যদি এ দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করেন, তাহলে ঈশ্বর সমগ্রের মধ্যে একটি সসীম উপাদান হয়ে দাঁড়ায়।"[৪] অন্যদিকে সর্বেশ্বরবাদী স্পিনোজা। এবং সর্বধরেশ্বরবাদী হেগেল প্রমুখ ঈশ্বর ও পরমসত্তাকে এক ও অভিন্ন বলে গণ্য করেছেন। স্পিনোজার মতে পরমসত্তা হল এক অনন্ত, শাশ্বত, স্বয়ম্ভূ, নির্বিশেষ দ্রব্য।[৫] যিনি নিজেই নিজের আশ্রয় এবং নিজেই নিজের জ্ঞাতা। এ ধারণার ভিত্তিতে তিনি জ্যামিতিক আরোহ পদ্ধতির সাহায্যে সিদ্ধান্ত করেন যে শেষ বিচারে কেবলমাত্র একটি পরমসত্তারই অস্তিত্ব থাকবে। আর এ সত্তা হলেন ঈশ্বর। ঈশ্বর পরিণামী জগতের সব বস্তুর নিত্য সত্তা। জগতে যা কিছু আছে সব ঈশ্বরে আছে এবং ঈশ্বর ব্যতীত কিছুই থাকতে পারেনা।[৬] অনুরূপ ভাবে হেগেলও বলেন-পরমসত্তা ঈশ্বর হলেন এক শাশ্বত, স্বনির্ভর সর্বব্যাপক সত্তা; যিনি হলেন পরমাত্মা। তিনি অমূর্ত নন বরং মূর্ত। স্পিনোজার সাথে হেগেলের মতের পার্থক্য হলো স্পিনোজার মতে ঈশ্বর হলেন জগতের অন্তবর্তী কিন্তু হেগেলের মতে ঈশ্বর জগৎ ও জীবের অন্তর্বর্তী হয়েও তিনি এর অতিবর্তী। একইভাবে বিশিষ্ট দ্বৈতবাদী দার্শনিক রামানুজ বলেন-ব্রহ্মাই একমাত্র পরমসত্তা এবং তাঁর বহির্ভূত অন্য কোন বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা নেই। জীব জগৎ ব্রহ্মাশ্রিত তথা তাঁরই অংশ। ব্রহ্ম নির্গুণ নন বরং সগুণ। এই সগুণ ব্রহ্মকেই তিনি আবার ঈশ্বর বলে অভিহিত করেন। এ প্রসঙ্গে রাধা কৃষ্ণানের মত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন যে, ঈশ্বর এবং পরমসত্তা একই পরম ও অসীম আধ্যাত্মিক সত্তার অভিব্যক্তি। আত্মা হল দেহ ও মনের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে এই আধ্যাত্মিক সত্তার অভিব্যক্তি। যখন এই আধ্যাত্মিক সত্তা জগতের মধ্য দিয়ে নিজেকে ব্যক্ত করে তখন তাঁকে ঈশ্বর বলা হয়, আর যখন তাঁকে অনন্ত সম্ভাবনারূপে ধারণা করা হয় (যার মধ্যে বর্তমান জগৎ হল একটি মাত্র বাস্তব বিকাশ), তখন তাঁকে পরমসত্তা বলা হয়।[৭]

উপরোক্ত আলোচনায় ইহা সুস্পষ্ট যে, সকল দার্শনিক সম্প্রদায় ধর্মের ঈশ্বরকে পরমসত্তা বলতে রাজি নন। এ নিয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে পরমসত্তা সম্পর্কে দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও প্রায় সকল আস্তিক্যবাদী ধর্ম পরমসত্তাকে ঈশ্বর বলে অভিহিত করেন। ঐশী প্রেম এই পরম সত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট। পরম সত্তা প্রেমবশত এ জগৎ ও তার অন্তর্গত সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন; যাতে জীব তথা মানব তাকে জানতে, ভালবাসতে পারে। মানুষ হলো দেহ ও আত্মার সমষ্টি। আত্মা হলো পরম সত্তার আবাস তথা অভিব্যক্তি। আবার জগৎ হলো তাঁরই প্রকাশ। পার্থিব জীবনে মানুষের লক্ষ্য হলো পরমসত্তা যে উদ্দেশ্য মানুষকে সৃষ্টি করেছেন সেই উদ্দেশ্যকে

Dhaka University Institutional Repository

বাস্তবায়িত করা অর্থাৎ হৃদয়ের মধ্যে তাঁর প্রেমকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। কাজেই ঐশী প্রেম আলোচনার পূর্বে এর সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় যেমন এই প্রেমের লক্ষ্য-পরম সত্তা, এর মাধ্যম আত্মা, জগৎসত্তা মৃত্যুর পরবর্তী জীবন ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন।

১. ১ ইসলামে পরমসত্তা

ইসলাম ধর্মানুসারে পরমসত্তা হল মহান আল্লাহ্তায়ালা। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোন শরীক নেই; তাঁর সমতূল্য কেউ নেই; তিনি চির-বর্তমান। তিনি আদি তার অন্ত নেই; তিনি স্বয়ম্ভু। তাঁর অস্তিত্ব অন্য কোন কারণের উপর নির্ভর করে না, বরং সকল পদার্থের অস্তিত্ব তাঁর উপর নির্ভর করে। তিনি সকল স্থিতির কারণ। তা হতে সমস্ত পদার্থের স্থিতি। তিনি কোনও পদার্থে সীমাবদ্ধ নহেন, তিনি নির্মুক্ত। তিনি কোন পদার্থের সদৃশ নহেন, আর কোন পদার্থও তাঁর সদৃশ নয়। তাঁর কোন অকার নেই, আকার ও প্রকার যা মানব কল্পনায় আসতে পারে, তা হতে তিনি মুক্ত; তিনি সর্বগুণাতীত, সমস্ত গুণ তাঁরই সৃষ্ট। তিনি কোন স্থানের অন্তর্ভুক্ত বা বহির্ভূত নহেন। দেশ ও কাল বাচক গুণ তাঁতে প্রযোজ্য নয়। আরশ তাঁকে ধারণ করে না; বরং তাঁর করুণা ও ক্ষমতা আরোশকে ধারণ করে আছে। সৃষ্টির প্রক্কালে তিনি যে অবস্থায় ছিলেন এখনও সেই অবস্থায় আছেন ও চিরদিন সেই অবস্থায় থাকবেন। তাঁর ক্ষমতা অতুলনীয় ও অপ্রতিহত। তাঁর কোন প্রকার ত্রুটি বা অপূর্ণতা নাই। তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন ও করবেন। আসমান জমিন আরশ ও কুরছী এবং এর অর্ন্তগত সমুদয় বস্তুই তার ক্ষমতাধীন।

আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়

তৌহিদ বা আল্লাহ্র একাত্ববাদই (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ অর্থাৎ এক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই) হচ্ছে ইসলামের মূলবাণী। এ কারণে ইসলাম ধর্ম বহুঈশ্বরবাদকে অস্বীকার করে একেশ্বরবাদের প্রচার করে। এখানে বহু মিথ্যা ও অলীক। আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়। তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য বা মা'বুদ নেই। তিনি সর্বেসর্বা, সর্বশক্তিমান, সর্বব্যাপী এবং যাবতীয় করুণার উৎস। ইসলাম ধর্ম মতে এই এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্র আনুগত্য এবং তাঁর আদেশ লালন করাই প্রকৃত মানব ধর্ম। এই তৌহিদ বা আল্লাহ্র একত্বের তাৎপর্য এই যে, প্রকৃতি (জাত), গুণ ও কার্যের দিক থেকে আল্লাহ্ এক, তিনি

Dhaka University Institutional Repository

একমাত্র উপাস্য; একাধিক সত্তা আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের বিরোধী। এক আল্লাহ্ সৃষ্টি, পালন ও ধ্বংসের অধিপতি; তিনি সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞাতা, মহাপরাক্রমশালী, বিশ্বজগতের নিয়ন্তা। সেফাতের দিক দিয়ে আল্লাহ্‌র একত্বের অর্থ হল স্বর্গ-মর্তের কোন জীবই পরিপূর্ণরূপে খোদার এক বা একাধিক গুণের অধিকারী হতে পারে না। কর্মের দিক দিয়ে আল্লাহর একত্বের তাৎপর্য এই যে আল্লাহ্ যা করেছেন বা করতে পারেন তা তাঁর সৃষ্ট জীব করতে পারেনা।[৮] কুরআনের সূরা এখলাসের মধ্যে আল্লাহর একত্ববাদের সুন্দর অভিব্যক্তি ঘটেছে: আপনি বলুন: তিনি আল্লাহ্ এক-অদ্বিতীয়, অভাব শূন্য, অমুখাপেক্ষী (স্বয়ম্ভু); তিনি কাউকে জন্মদেননি এবং তাঁকেও কেউ জন্ম দেননি। আর কেউই তাঁর সমতুল্য নয়।[৯]

আল্লাহ্ জগতের স্রষ্টা

বিশ্বজাহানের স্রষ্টা, প্রতিপালক ও অধিপতি আল্লাহ্ তায়ালা পরমদাতা ও দয়ালু। তার করুণা ও দয়া শতধারায় প্রবাহিত। বিশ্বের সর্বত্র তাঁর করুণা, দয়া ও প্রেমের অভিব্যক্তি। বিশ্বে এমন কিছুই নাই যেখানে তার দয়া ও ভালবাসা প্রবাহমান নয়। পবিত্র কুরআনের সর্বত্র সৃষ্টির প্রতি তার করুণা ও ভালবাসার চিত্র এতই জীবন্ত ও আন্তরিক হয়ে ফুটেছে যে মনে হয় আল্লাহ্‌তায়ালা একজন মহাপ্রেমিক এবং তাঁর অসীম প্রেম প্রকাশের জন্যই তিনি বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ্ নিরাকার

আল্লাহ্‌তায়ালা নিরাকার এবং অপরিমেয়। অন্য কিছুর মত তিনি দেহ বিশিষ্ট নন। তাঁর মধ্যে অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তু অনুপ্রবিষ্টও নয়। তিনি কোন কিছুর উপর ভর করে প্রতিষ্ঠিত নন। কোন বিরাজমান বস্তুর মত তিনি নন, কোন বিরাজমান বস্তুও তাঁর মত নয়। কোন পরিমাণ দ্বারা তিনি সীমিত নন। কোন দিক দ্বারা তিনি পরিবেষ্টিত নয়। আসমান ও যমিন তাকে পরিবেষ্টনে অক্ষম। তিনি আরশে আজীমের উপর এমনভাবে অবস্থিত, যেমন তিনি নিজে বলেছেন এবং যেভাবে তিনি ইচ্ছা করেছেন। আরশ তাকে বহন বা ধারণ করে না; বরং আরশ ও আরশ বহনকারীদেরকে তাঁর কুদরত বহন করছে। সব কিছুই তাঁর কুদরতের আয়ত্তাধীন। তাঁর অবস্থান এমনভাবে যে, তিনি আরশের বেশী নিকটে এবং দুনিয়া থেকে বেশী দূরে নন। তাঁর মর্যাদা তাঁর নৈকট্য এবং দূরত্ব হতে অনেক ঊর্ধ্বে। তিনি স্থান ও কালের বেষ্টনীমুক্ত। তিনি স্থান ও কালের জন্মের পূর্বেও বিদ্যমান ছিলেন। তিনি তখনও যেমন ছিলেন এখনও তেমনি

Dhaka University Institutional Repository

আছেন। বেহেশ্‌তে সৎকর্মশীলদের প্রতি তার নিয়ামত ও অনুগ্রহ এই হবে যে, তাঁর পবিত্র সাক্ষাতের আনন্দ পূর্ণ করার জন্য তিনি স্বীয় সত্তাকে মানুষের চর্মচক্ষে দেখিয়ে দেবেন।

আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ

আল্লাহ্ সর্বজ্ঞাতা। আকাশ, পৃথিবীতে স্বর্গে-মর্তে যা কিছু আছে সকলই তার অর্ন্তভুক্ত।[১০] কেননা তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। কাজেই স্বর্গ-মর্তে এমন কিছু নেই, যে সম্পর্কে তাঁর পরিপূর্ণ জ্ঞান নাই। তাঁর সৃষ্ট প্রক্রিয়া বিস্ময়কর। কোন কিছু সৃষ্টি করতে হলে তাঁকে শুধু ইচ্ছা করতে হয়। তিনি যা ইচ্ছা করেন তা সেভাবে বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ ঘোষণা করেন: ভূমন্ডল ও নভোমণ্ডলের আদি স্রষ্টা তিনিই। তিনি কোন কার্য সম্পাদনের ইচ্ছা করলে শুধু বলেন হও আর সাথে সাথে হয়ে যায়। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে যে, সকল কার্যই তার নির্দেশক্রমে ঘটে থাকে। তবে আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মধ্যে নিয়ম আছে যা স্রষ্টার ইচ্ছার সাথে সংহতিপূর্ণ। আল্লাহ্‌র সৃষ্ট নীতির মধ্যে কোনরূপ ব্যতিক্রম নেই।

আল্লাহ্ বিশ্বভূবনের সর্বময় কর্তা

আল্লাহ্ বিশ্বভূবনের সর্বময় কর্তা। তিনি পৃথিবীর সব কিছুর স্রষ্টা এবং তাঁরই নিকট সবকিছুর প্রত্যাবর্তন করবে। তাঁর ইচ্ছার বাইরে কিছুই ঘটেনা। তার ইচ্ছানুসারেই সৃষ্টি, স্থিতি, ধ্বংস নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। স্বর্গে- মর্তে আল্লাহ্ ব্যতীত কারও সার্বভৌম ক্ষমতা নেই। স্বর্গ মর্তের সব কিছু তাঁর এবং সকল প্রশংসা একমাত্র তাঁরই প্রাপ্য। তিনি জীবিতকে মৃত করেন, মৃতকে জীবন দান করেন। ভাল মন্দ সবই তার সৃষ্টি, সকল সৃষ্টির পেছনে তার উদ্দেশ্য কাজ করছে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেন: 'আপনি বলুন হে রাজ্যাধিপতি আল্লাহ্! তুমি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান কর এবং যা হতে ইচ্ছা হয় রাজ্য পরিগ্রহণ কর এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর ও যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছনা প্রদান কর। তোমার হস্তে কল্যাণ; নিশ্চয়ই তুমি সর্বশক্তিমান তুমি রজনীকে দিবাতে এবং দিবাকে রজনীতে আনয়ন কর এবং মৃত হতে জীবিতকে নির্গত কর ও জীবিত হতে মৃতকে বহির্গত কর এবং যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান কর।' কাজেই আল্লাহ্ সর্ব শক্তিমান, তিনি বিশ্বজগতের সমুদয় দৃশ্য-অদৃশ্য সকল জীব ও বস্তুর নিয়ামক।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ্ সর্বব্যাপী

আল্লাহ্ সর্ব ব্যাপী: সমগ্র বিশ্ব তাঁরই শক্তির প্রকাশ। এমন কোন স্থান বা সত্তা নেই যার মধ্যে তাঁর শক্তির প্রকাশ ঘটেনি। ক্ষুদ্র বীজের মধ্যে যেমন প্রকাণ্ড বৃক্ষ বিদ্যমান, সেইরূপ সৃষ্টির ভিতর স্রষ্টাও বর্তমান। তিনি সকল বস্তুর অন্তর্নিহিত শক্তি, সৃষ্টি ও বাহ্যজগৎ তাঁরই বহিঃপ্রকাশ। মানুষের জীবন, বুদ্ধি-জ্ঞান তাঁরই দান। বিশ্বের সর্বদেশ তাঁর অবস্থান। তিনি বিশ্বে ওতপ্রোতভাবে বিরাজমান। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, যেদিকে মুখ ফিরাও সেদিকে আল্লাহ্র মুখ।[১১] আমি তাঁর কণ্ঠশিরা হতেও নিকটতর।[১২] অতিবর্তী ধারণা অনুসারে সাধারণ মানুষ ধারণা করেন আল্লাহ্ সপ্তআকাশের উপর একখানা বিরাট সিংহাসনে বসে এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রাজত্ব করেন। কিন্তু ইহা ঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ কোন স্থানে আবদ্ধনন, কোন সময়ের মুখাপেক্ষীনন, তিনি দেশ কালের অতীত, দেশকালের সৃষ্টিকর্তা। আমরা যেখানেই থাকি তিনি সেখানে আছেন।

সূফীদের মত

ইসলামী মরমীদের (সূফীদের) মতে আল্লাহ্ কেবল অনাদি, অনন্ত সর্বজ্ঞানময় ও সর্বশক্তিময় নন। একই সাথে তিনি দয়াময়, করুণাময়, প্রেমময়, আনন্দময় ও বটে। আনন্দের অভিব্যক্তি প্রেমে। তাই প্রেম স্বরূপতাই তাঁর মূল স্বরূপ। তাঁদের মতে এই সৃষ্টি মূলে রয়েছে প্রেমের প্রেরণা, মানবের সাথে আল্লাহর সম্বন্ধ প্রেমের এবং সাধনার পথও এই প্রেম মিলনের পথ। এ প্রসঙ্গে বাংলার একসূফী আলী রেজা বলেন, 'প্রথমে আছিল প্রভু এক নিরঞ্জন। প্রেমরসে ডুবিকৈল যুগল সৃজন' কাজেই জগতের বুকে প্রেমের শুরু হয়েছে আল্লাহর দিক হতে। আল্লাহ্ প্রেম করতে ও পরিচিত হতে চাইলেন বলেই প্রেমের বিকাশ শুরু হয়েছে। আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টিকে প্রেম শিখাতে গিয়ে পূর্বেই তাঁর সৃষ্টির প্রেমে আবদ্ধ হন এবং মানুষকে তাঁর প্রেমাস্পদরূপে গ্রহণ করেন। হাদীস-ই কুদসীতে আল্লাহ্ বলেন: 'আসমান ও যমীন আমাকে ধারণ করতে পারে না, কিন্তু মুমিনের হৃদয়ে আমার স্থান;' 'মানুষ আমার রহস্য এবং আমি মানুষের রহস্য।'

অধিকাংশ সূফীর মতে আল্লাহ্ বিশ্বের অন্তর্বর্তী ও অতিবর্তী; বিশ্বলীন ও বিশ্ববহির্ভূত উভয় সত্তা, বিশ্বজগৎ ও আল্লাহ্র সত্তায় কোন ভেদ নেই। সমগ্র বিশ্বজগৎ আল্লাহ্ এবং সমগ্র আল্লাহ্ বিশ্বজগৎ। এই মতবাদ পাশ্চাত্য দর্শনে

Dhaka University Institutional Repository

অদ্বৈতবাদ বা সর্বেশ্বরবাদ নামে পরিচিত। কিন্তু সূফীদের মতবাদ ঠিক সর্বেশ্বরবাদ নয়। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক নিকলসন বলেন যে, সূফীবাদ সর্বেশ্বরবাদই হবে এটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। আল্লাহ জগতের অন্তর্ব্যাপী সত্তা, আল্লাহ সমগ্র বিশ্বজগতে এবং সমগ্র বিশ্বজগৎ আল্লাহ্‌র সত্তার মাঝে ধারণারূপে অবস্থিত। কিন্তু সমগ্র আল্লাহ সমগ্র বিশ্বজগৎ নয়। একদিকে যেমন আল্লাহ্ জগতের অন্তর্ব্যাপী সত্তা, অন্যদিকে যেমনি জগতের অতিবর্তী সত্তা। অর্ন্তব্যাপী সত্তার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপের ফলে সূফী মতবাদকে অন্য কোন উপযুক্ত অর্থ প্রকাশকারী শব্দের অভাবে অদ্বৈতবাদ বা সর্বেশ্বরবাদ বলা হয়।[১৪] ইবনুল আরাবীর ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ দর্শনে অদ্বৈতবাদী মতবাদ প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও অতিবর্তী খোদাবাদের অনেক চিহ্ন বর্তমান। রুমীর মতবাদকেও সর্বেশ্বরবাদী মতবাদ না বলে সর্বধরেশ্বরবাদী মতবাদ বলা হয়, কেননা তাঁর দর্শনে আল্লাহ্ অন্তর্ব্যাপী ও অতিবর্তী উভয় প্রকার সত্তারূপে বর্তমান। তাঁর মতে আল্লাহ্ সৃষ্টিতে লীন না সৃষ্টির বহির্ভূত; না এই দুটির মধ্যাবস্থা এসব কিছুই নয়। এসব বিষয় বুদ্ধি বিচার ও বিতর্কমূলক জ্ঞানের অন্তর্গত: এসব দিয়ে আল্লাহর পূর্ণ স্বরূপ জানা যায় না।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি ইসলামী মতে আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়। তিনি জগতের স্রষ্টা ও পালন কর্তা, তিনি সর্বব্যাপী ও সয়ম্ভু, তিনে জগতের অতিবর্তী ও অন্তর্বর্তী, তিনি নির্গুণ এবং অবর্ণনীয়, মানবীয় জ্ঞানের মাধ্যমে তা উপলব্ধি করা যায় না। তবে তিনি প্রেমময়। আর এই প্রেম স্বরূপতার জন্যই তিনি মানুষের নিকট প্রকাশিত হন, যাতে মানুষ তাঁকে জানতে ও ভালবাসতে পারে।

১.২ হিন্দুধর্মে পরমসত্তা

হিন্দুধর্মে পরমসত্তাকে ঈশ্বর, ব্রহ্ম, পরমেশ্বর, ভগবান প্রভৃতি গুণের নামে অভিহিত করা হয়। তবে ঈশ্বর এবং ব্রহ্ম পরমসত্তার সমর্থক হিসেবে এ ধর্মে বহুল প্রচলিত। হিন্দু মতে পরমসত্তা এক ও অদ্বিতীয়।

ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়

ইহুদী, খ্রিষ্ট এবং ইসলাম ধর্মের মতো হিন্দুধর্মেও মূলত একেশ্বরবাদী ধর্ম, যদিও বিভিন্ন দেব-দেবীর অর্চনা করা এ ধর্মের একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। বেদে এ বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। ঋগবেদের বিভিন্ন মন্ত্রে ইন্দ্র,

Dhaka University Institutional Repository

অগ্নি, বায়ু ও বরুণ আরো বহু দেবতার স্তুতি কীর্তন করা হয়েছে। বেদে যখন যে দেবতার স্তব করা হয়েছে তখন তাঁকে পরম দেবতা বলে অভিহিত করা হয়েছে।[১৫] এবং প্রত্যেক দেবতার মধ্যে অপর দেবতাকে আশ্রিত বলা হয়েছে। এই বিষয়টি লক্ষ্য করে প্রখ্যাত ভারত তত্ত্ববিদ ম্যাক্সমূলার বলেন যে, আসলে বেদের যে দেবতাতত্ত্ব তাকে বহু ঈশ্বরবাদ (Polytheism) বলে আখ্যায়িত না করে, তাকে একাতিদেববাদ (Henotheism) বা এক পরমসত্তায় বহু দেবতার মিলন বলে অভিহিত করাই শ্রেয়।[১৬] বেদিক যুগের পরবর্তীকালে হিন্দুধর্মের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্মে অসংখ্য দেব-দেবীতে বিশ্বাস স্থাপন করল। এই দেবদেবীর সংখ্যা কালক্রমে তেত্রিশ কোটিতে গিয়ে দাঁড়াল। এই অসংখ্য দেবতার মধ্যে পাঁচটি দেবতা বিশেষ উপাসনার বিষয় হয়ে দাঁড়াল। এই পঞ্চ দেবতা হলো- বিষ্ণু, শিব, শক্তি, সূর্য এবং গনেশ। এই পঞ্চ দেবতাকে কেন্দ্র করে পরবর্তী কালে পাঁচটি ধর্ম বিশ্বাসের উদ্ভব হলো। এরও অনেক পরে পুরাণের যুগে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিন দেবতা হিন্দুধর্মে বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। এই তিন দেবতার মধ্যে ব্রহ্মা সৃষ্টিকারক, বিষ্ণু সংরক্ষক এবং শিব সংহারক। আসলে এই তিন দেবতা এই পরমেশ্বরের তিনটি রূপ, তিনটি ভিন্ন দেবতা নয়। জগতের সব কিছুর মূলে একই চৈতন্য সত্তার অস্তিত্ব, আর ইহা হলো অদ্বৈতবাদের মূল কথা। সমস্ত দেবতার সত্তা এক পরমসত্তায় অধিষ্ঠিত। সেই পরমসত্তা ভিন্ন দেবতাদের স্বতন্ত্র কোন সত্তা নাই। হিন্দু ধর্মের এই বহু দেবতা সম্বন্ধে রেমন্ড হ্যামার বলেছেন যে, দেবতারা প্রাকৃতিক শক্তির বহিঃপ্রকাশ। যেহেতু ব্রহ্ম এক সেহেতু এই বহুত্বকে বহু ঈশ্বরবাদ বলা যায় না। দেবতারা ব্রহ্মকে বুঝায় উপায় মাত্র।[১৭] তাই রাধাকৃষ্ণাণ যথার্থই বলেছেন যে, বহু ঈশ্বরবাদকে স্বীকার করা চলেনা, কেননা ধর্মীয় চেতনাই তার বিরোধিতা করে। তাঁর মতে একাতিদেববাদ হলো একেশ্বরের দিকে অজ্ঞাতসারে এগিয়ে যাওয়া।[১৮]

উপনিষদে ও ঈশ্বরকে এক ও অদ্বিতীয় সত্তা বলে অভিহিত করা হয়েছে। যিনি সর্বশক্তিমান অনন্ত, অসীম, এই জগতের স্রষ্টা, পালক ও সংহারক। তিনি এই জগতের আলোক ও প্রাণ। তিনিই একমাত্র পূজা ও উপসনার বস্তু বৃহদারণ্যক উপনিষদে শাকল্য যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করলেন দেবতারা ঠিক কজন? যাজ্ঞবল্ক্য বললেন এক। তখন আবার প্রশ্ন করা হল অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, কাল প্রাণ, অন্ন, ব্রহ্ম, রুদ্র এবং বিষ্ণু এদের মধ্যে কার উপাসনা শ্রেয়? তখন এর উত্তরে বলা হল, এরা সকলেই এক সর্বোত্তম অমর অশরীরী ব্রহ্মের প্রকাশ। সুতরাং এক ব্রহ্মেরই ধ্যান করা যেতে পারে। কাজেই একথা বলা খুবই

Dhaka University Institutional Repository

যুক্তিসংগত হিন্দুধর্ম একটি মাত্র পরম সত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে এবং অন্যান্য সকল কিছুকে তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ বলে মনে করে।

ঈশ্বর সর্বত্র বিদ্যমান

হিন্দুধর্ম অনুসারে ঈশ্বর সর্বব্যাপী এবং সর্বত্র বিরাজমান। সমগ্র বিশ্বকে তিনি আচ্ছাদিত করে রেখেছেন। আর এই অর্থে তিনি বিভূ, বিষ্ণু, বাসুদেব নামে অভিহিত। তিনি শুধু বিশ্বচরাচরকে আবৃত করে রেখেছেন তা নয়, বরং যা কিছু পরিদৃশ্যমান বা অনুমেয় তার সবই তিনি ছাড়া আর কিছু নাই। বিশ্ব জগৎ তাঁরই অভিব্যক্তি। অর্থাৎ সর্বংখাল্বিদং ব্রহ্ম।[১৯] ঋগবেদের সমস্ত দেবতাকে এক অদ্বিতীয় পরমাত্মার অভিব্যক্তি বলে বর্ণনা করা হয়েছে।[২০] এবং ঐ পরমাত্মাকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র বিদ্যমান বলা হয়েছে। ঈশ্বরের সর্বব্যাপীত্ব সম্পর্কে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে, "তার হাত, পা সর্বত্র, তাঁর চক্ষু-মুখ সর্বত্র, কর্নও সর্বত্র বিদ্যমান, তিনি সর্বলোকব্যাপী অবস্থান করছেন।"[২১] তিনি সৃষ্টির মধ্যেও আছেন, বাইরেও আছেন।

জগতের প্রত্যেকটি ক্রিয়ার পশ্চাতে রয়েছে কোন চিৎ শক্তির আলোড়ন। এই বৈজ্ঞানিক সত্যকে অবলম্বন করে উপনিষদের ঋষিগণ উপলব্ধি করেন যে, এই চরাচর সৃষ্টির পশ্চাতে রয়েছে সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মের বহুধা হবার উদ্দেশ্যে চিৎ শক্তির আলোড়ন।[২২] এই সৃষ্টি কুম্ভকারের ঘট সৃষ্টির মত একটি পৃথক বস্তুর প্রস্তুতি নয়। ঊর্ননার্ভ যেমন জালের দ্বারা নিজেকে বিস্তৃতি করে,[২৩] অগ্নি হতে যেমন সহস্র স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়,[২৪] তেমনি অব্যক্ত ব্রহ্ম নিজেকে বিস্তৃত করে, বহুরূপে ব্যক্ত হলেন। স্ফুলিঙ্গ যেমন অগ্নি হতে পৃথক নয়, তন্তু যেমন ঊর্ননাভ হতে পৃথক নয়, সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ড তেমনি ব্রহ্ম হতে পৃথক নয়। সবই সেই অখণ্ড বিশ্বাত্মার অভিব্যক্তি।[২৫] স্থাবর জঙ্গম সবই ব্রহ্ম।[২৬] হিন্দুধর্মে আত্মা এবং ব্রহ্মকে অভিন্ন বলে কল্পনা করা হয়েছে।[২৭] যেমন- বৃহদারণ্যকোপনিষদে বলা হয়েছে যে, এই সমস্তই আত্মা। যিনি আত্মা তিনি অবশ্যই ব্রহ্ম।[২৮] এ আত্মা অজ, অজর অমর, অমৃত ও ব্রহ্ম।[২৯] হিন্দুধর্মে আত্মা (জীবাত্মা) ও পরমাত্মা (ব্রহ্ম)কে অভিন্ন বলে বর্ণনা করা হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে আবার জীবাত্মাও পরমাত্মার ভিন্নতার কথাও বলা হয়েছে। যেমন- কঠোপনিষদে জীবাত্মা ও পরমত্মাকে যথাক্রমে ছায়া এবং আলোর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।[৩০]

Dhaka University Institutional Repository

ঈশ্বর জগতের মূলতত্ত্ব

হিন্দুধর্ম অনুসারে জগতের মূলতত্ত্ব ব্রহ্ম বা ঈশ্বর। এ বিশ্ব সৃষ্টি কোন যন্ত্রের সদৃশ নহে, ইহা বিবর্তন বা নামরূপ পরিবর্তন মাত্র। সৃষ্টির পূর্বে এই নামরূপে অভিব্যক্ত জগৎ অব্যাকৃত ব্রহ্মরূপেই ছিল। সেই অসৎ শব্দ বাচ্য ব্রহ্ম হতে এই নামরূপে অভিব্যক্ত জগৎ উৎপন্ন হলো।[৩১] কাজেই তিনিই সকল পদার্থের মূল শক্তি। তাঁর শক্তিতে জগতের সকল কিছু সত্তাবান। তিনিই একাধারে জগতের উপাদান কারণ, আকারগত কারণ, নিমিত্ত কারণ ও পরিণাম কারণ। ব্রহ্মই যে জগতের উপাদান কারণ উপনিষদে এ বিষয়টির উপর অত্যন্ত জোর দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ছান্দোগ্যোপনিষদে মৃন্ময় পাত্রের উদাহরণ দিয়ে বলা হয়েছে যে, মৃন্ময় পাত্রের উপাদান যেমন মৃত্তিকা এবং পাত্ররূপে তার প্রকাশ। সেইরূপ বিশ্বের মূল তত্ত্ব হল ব্রহ্ম। এবং তিনিই উপাদান হয়ে বিভিন্নরূপে প্রকট হয়ে নামের দ্বারা চিহ্নিত হয়ে বহুরূপে প্রকাশিত হয়েছেন।[৩২] এ প্রসঙ্গে গীতায় বলা হয়েছে- আমাকে সর্বভূতের সনাতন বীজ বলে জানি ও (৭/৩০)। ব্রহ্ম যেমন উপাদান কারণ তেমনি আকারগত কারণ। কঠ উপনিষদে বলা হয়েছে- একই ব্রহ্ম বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছেন এবং বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে যোগসূত্র হিসেবে প্রচ্ছন্নভাবে বর্তমান আছেন।[৩৩] বহুকে ব্যক্ত করেই তাঁর একত্ব। বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার জন্য উপনিষদে একটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে- একই অগ্নি বিভিন্নস্থানে বিভিন্ন রূপে প্রকাশ হলেও অগ্নি বলেই তাকে আমরা চিনি। সেইরূপে একই আত্মা বিভিন্ন জীব রূপে প্রকট হয়েও তাদের অন্তরে প্রচছন্নভাবে বিরাজ করছেন। বিশ্বে একই শক্তির বহুরূপে প্রকাশ ঘটেছে। এ প্রসঙ্গে গীতায় বলা হয়েছে- ক্ষিতি অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি অহংকার এই রূপে আমার প্রকৃতি অষ্ট ভাগে ভেদ প্রাপ্ত হয়েছে। (৭/৪) নিমিত্ত কারণ হলো তাই যা সৃষ্টির নিয়ামক শক্তি। ব্রহ্ম যে বিশ্বের অভ্যন্তরে থেকে বিশ্বকে নিয়ন্ত্রিত করেন এ বিষয়টি উপনিষদে অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। উপনিষদে বলা হয়েছে- ব্রহ্ম নিয়ামক শক্তি হিসেবে বিশ্বে দু'ভাবে কাজ করেন। প্রথমত, তাঁর প্রশাসনে সমগ্রবিশ্ব বিধৃত এবং পরিচালিত। সূর্য-চন্দ্র, দ্যাবা পৃথিবী, নিমেষ-মুহূর্ত অহোরাত্র ইত্যাদি তাঁর প্রশাসনে বিবৃত হয়ে আছেন।[৩৪] দ্বিতীয়ত বলা হয়েছে যে, তিনি বিভিন্ন জীবের অন্তরে থেকে তাদের অজানিতভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন বলেই তিনি অন্তর্যামী। দেহ পরিবর্তিত হয় কিন্তু তার নিয়ামক শক্তি নিত্য এবং সেই কারণে অমৃত।[৩৫] ব্রহ্ম আবার পরিণাম কারণ, পরিণাম কারণ রূপে তিনি রসস্বরূপ। তিনি শিল্প

Dhaka University Institutional Repository

রসিক। তাই তিনি শিল্পের ভূমিকা গ্রহণ করে আনন্দ পান। হিন্দু মরমীগণ ঈশ্বরের এই রসস্বরূপতার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। এখানে উল্লেখ্য যে বিশ্ব শক্তি ব্যবহারিক প্রয়োজনে শিল্পের ভূমিকা পালন করেন না। কারণ তিনি ব্যবহারিক প্রয়োজনের অতীত এক পূর্ণ সত্তা। রস উপলব্ধি করার জন্য প্রয়োজন দুটি ভিন্ন প্রকৃতির সত্তার। কারণ বিশুদ্ধ একত্বের মধ্যে রসের উপলব্ধির অবকাশ নাই। তার জন্য প্রয়োজন দ্বৈতবোধের। প্রয়োজন রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ গন্ধের জগৎ, প্রয়োজন মন। দুয়ের জানাজানি, দুয়ের পরিচয়, প্রীতি-এরই মাধ্যমে রসের ধারা প্রবাহিত হয়। সেজন্য আদিতে একক সত্তা অবস্থায় ব্রহ্ম তাঁর একাকিত্ব উপভোগ করলেন না। তাই রসের উপলব্ধির জন্য তিনি বহু ও বিচিত্র্য রূপে প্রকট হলেন। একাকী থেকে আনন্দ পেলেন না বলেই তিনি দ্বিতীয়কে চাইলেন।[৩৬] তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বিবৃত হয়েছে-

প্রেমরস নির্যাস করতে আস্বাদন
রাগমার্গে ভক্তি লোকে করতে প্রচারণ
রসিক শেখর কৃষ্ণ পরম করুণ
এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছায় উদ্‌গম॥

জগতের অন্তবর্তী ও অতিবর্তী

পরমসত্তাকে হিন্দুধর্মে এক পরম পুরুষ রূপে কল্পনা করা হয়েছে। ঈশ্বর হলেন এই পরমপুরুষ। তিনি হলেন পুরুষোত্তম (গীতা-১৫/১৮)। ঈশ্বরের দুটি রূপ-তিনি জগতের অন্তবর্তী ও অতিবর্তী।[৩৭] জগতের অন্তর্বর্তী সত্তারূপে ঈশ্বর সমগ্র জগৎকে আচ্ছাদিত করে আছেন। তিনি সমস্ত জীব জগৎ ও বস্তু জগতের অন্তর্যামী। এপ্রসঙ্গে উপনিষদে বলা হয়েছে- সেই পরমাত্মা কামনা (ইচ্ছা) করলেন আমি বহু হবো, আমি উৎপন্ন হবো। তিনি তপস্যা (অর্থাৎ সৃষ্টি বিষয়ে সংকল্প) করলেন। তিনি তপস্যা করে এই যাহা কিছু সেই সমস্তই সৃষ্টি করলেন। এই সমস্ত সৃষ্টি করে তিনি তাতে অনুপ্রবিষ্ট হলেন।[৩৮] কিন্তু ঈশ্বর শুধু জীবজগতের অন্তবর্তী নয়, তিনি এর অতিবর্তীও। এই দেশ কালের দ্বারা পরিছিন্ন সমস্ত জগৎ, কাছের ও দূরের সমস্ত বস্তু, অতীত ও ভবিষ্যতের সকল ঘটনা-সমস্তই এক ব্রহ্মের বিকাশ। তিনি যেমন এই জগতের মধ্যে অনুস্যূত হয়ে আছেন, তেমনি বিশ্বের বাইরেও আছেন।[৩৯] তাই উপনিষদে বলা হয়েছে- তিনি দূরে আছেন, তিনি নিকটেও আছেন। তিনি সমুদয়ের অন্তরে আছেন। তিনি সমুদয়ের বাইরেও আছেন। আবার ঋগবেদের পুরুষ সূক্তে এক

Dhaka University Institutional Repository

পরমপুরুষের বর্ণনায় বলা হয়েছে- তিনি বিশ্বব্যাপী হয়েও বিশ্বকে অতিক্রম করে আছেন। অর্থাৎ তিনি সমস্ত পৃথিবীকে ব্যাপ্ত করে দশ অঙ্গুলি পরিমাণ অতিরিক্ত হয়ে আছেন। বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ সেই পুরুষের আত্মাস্বরূপ। নিখিল বিশ্ব তার এক চতুর্থাংশ মাত্র। তার এক অংশে তিনি জীব জগতে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন অপর তিন চতুর্থাংশ অমৃতলোকে বিরাজমান।[৪০] একই ধারণা উপনিষদ ও গীতায়ও প্রকাশিত হয়েছে।[৪১] কাজেই ইহা সুস্পষ্ট যে পরমসত্তা-ঈশ্বর জগতের সাথে অভিন্ন হয়েও একই সাথে তিনি তা থেকে ভিন্ন। তিনি অব্যক্তরূপে সমস্ত জগৎ জুড়ে আছেন। সমস্ত ভূত তাতে অবস্থিত কিন্তু তিনি সমুদয়ে অবস্থিত নয়। অর্থাৎ ঈশ্বরের ব্যাপ্তি কেবল জগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ঈশ্বরের ব্যাপ্তি জগতেরও অতীত। তাই বলা হয়ে থাকে ঈশ্বর বিশ্বানুগ হয়েও বিশ্বাতিগ। সুতরাং ঈশ্বর সম্পর্কিত হিন্দুদের ধারণা একেশ্বরবাদ বা সর্বেশ্বাবাদ নয় বরং সর্বধরেশ্বরবাদ।

ঈশ্বর সগুণ ও নির্গুণ

হিন্দুধর্মে ব্রহ্মের দুটি রূপ রয়েছে- সগুণ ব্রহ্ম ও নির্গুণ ব্রহ্ম। সগুণ ব্রহ্মকে উপনিষদে বলা হয়েছে অপর ব্রহ্ম এবং নির্গুণ ব্রহ্মকে বলা হয়েছে পরব্রহ্ম।[৪২] বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে- ব্রহ্মের দুটি রূপ-মূর্তও অমূর্ত, মর্ত্য অমৃত, স্থিতিশীল ও গতিশীল, সৎ (সত্তাশীল) ও ত্যৎ (অব্যক্ত)।[৪৩] যখন ব্রহ্মকে বলা হয় নির্গুণ তখন এর দ্বারা বুঝান হয় পর ব্রহ্মকে কোন বৈশিষ্ট্যসূচক চিহ্ন দ্বারা নির্দেশ করা যায় না। ইহা কোন গুণ কিংবা প্রতীকের দ্বারা বোধগম্য নয়। ইহা সর্বপ্রকার উপাধি বর্জিত। অন্যদিকে সগুণ ব্রহ্মকে বর্ণনা করা যেতে পারে কতিপয় বৈশিষ্ট্যসূচক চিহ্ন দ্বারা। ইহাকে উপলব্ধি করা যেতে পারে তাঁর গুণাবলীর মাধ্যমে। এ প্রসঙ্গে শংকরাচার্য ব্রহ্মসূত্রের উপর টিকায় (ব্রহ্মসূত্র ১/১/২) বলেন- ব্রহ্ম দু'ভাবে বোধগম্য: প্রথমত, সসীম জগতে বিবর্তিত (প্রকাশিত) নাম রূপের বহু বস্তুর মাধ্যমে। দ্বিতীয়ত, সকল সসীমতার উর্ধ্বে এক অদ্বৈত সত্তা হিসেবে। অর্থাৎ নির্গুণভাবে। উপনিষদে পর ব্রহ্ম ও অপর ব্রহ্ম তথা নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মকে বিপরীতধর্মী ধারণার মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমন-পরব্রহ্ম হল অভিশেষিত এবং দুর্জ্ঞেয়, অপর ব্রহ্ম হল বিশেষিতও এবং জ্ঞেয়। পরব্রহ্ম হল অ-দৈশিক, অকালিক, অকারণ এবং জগৎ রহিত। অপর ব্রহ্ম দৈশিক, কালিক এবং জগতের প্রভু। পর ব্রহ্ম সৎ, চিৎ ও আনন্দ স্বরূপ।[৪৪] অপর ব্রহ্ম অনাদি, অনন্ত সর্বব্যাপক, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, জগতের স্রষ্টা, পালক ও সংহারক। পর ব্রহ্মকে নেতি নেতি ভাবেও বর্ণনা করা

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে। অপর ব্রহ্মকে বর্ণনা করা হয়েছে সদর্থক ভাবে। নির্গুণ ব্রহ্ম বাক্য দ্বারা অবর্ণনীয় এবং মনের দ্বারা অবোধগম্য। তাই উপনিষদে একে বলা হয়েছে অজ্ঞাত, অজ্ঞেয় এবং অব্যাঙমানসগোচর। ইহা যদিও অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয় . তবুও ইহা নিত্য। ইহা জ্ঞানের বিষয় এবং সকল জ্ঞানের লক্ষ্য।

হিন্দু মতে নির্গুণ ব্রহ্ম সৃষ্টির উদ্দেশ্যে স্বীয় মায়ার সহায়তায় সগুণকর্তার পদ গ্রহণ করেন। সৃষ্টিকর্তারূপে তাকে ব্রহ্ম,[৪৫] প্রজাপতি, হিরণ্যগর্ভ[৪৬] প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। কিন্তু ব্রহ্ম থেকে পৃথক সত্তা এদের কারও নেই। ব্রহ্মই ঈশ্বররূপে বিশ্ব সৃষ্টি করেন এবং বিশ্বকে পরিচালিত করেন। তাই মায়াবী ঈশ্বর স্বীয় শক্তির প্রভাবে বহুরূপ ধারণ করলেও তিনি এক অদ্বিতীয়। কাজেই নির্গুণ ব্রহ্মের বিবর্ত এবং প্রকাশ হচ্ছে মায়াধীশ ঈশ্বর এবং সেই ঈশ্বরের বিবর্ত হচ্ছে মায়াপ্রসূত এই বিশ্ব এবং তার অন্তর্গত মায়াবদ্ধ জীবসমূহ।[৪৭] তাই উপনিষদে বলা হয়েছে পরমেশ্বরের মায়াকেই প্রকৃতি বলে জানিও এবং মায়ার অধিষ্ঠাতাকে মহেশ্বর বলে জানিও।[৪৮] সগুণ ঈশ্বর হল সবিশেষ, সোপাধি সবিকল্প তিনি সর্বব্যাপী সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান। তিনি জগতের স্রষ্টা, পালক ও সংহারক। তিনি এই জগতের ও জীবের অন্তর্যামী, কর্মনিয়মের নিয়ন্ত্রক, নৈতিক শাসনকর্তা এবং জগতের সংগতি বিধান কর্তা। তিনি হলেন কর্মাধ্যক্ষ। তিনি জীবকে কর্মানুযায়ী ফল দান করেন। পাপিদের শাস্তি দেন, সাধুদের পুরস্কৃত করেন। তাঁর অনুগ্রহেই জীব দুঃখ-কষ্টের জীবন থেকে চির মুক্তি লাভ করে।

ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়সমূহ ঈশ্বরকে এককভাবে নির্গুণ বা সগুণভাবে আখ্যায়িত করেছেন। ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায় ঈশ্বরকে সগুণ বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৪৯] তারা সগুণ ও নির্গুণকে পৃথক আকারে দেখেছেন। তাদের মতে ঈশ্বরের নির্গুণত্ব প্রমাণ করা যায়না বিধায় তিনি নির্গুণ নয়। পাতঞ্জল দর্শনে সগুণ ও নির্গুণ উভয় ব্রহ্মের কথা বলা হয়েছে। পাতঞ্জল ভাষ্যে বলা হয়েছে যে প্রথমে নির্গুণে চিত্ত প্রবেশ করতে পারেনা। একারণে সগুণে মনোনিবেশ করবে। সাংখ্য দর্শনেও সগুণ ঈশ্বরের কথা বলা হয়েছে। সাংখ্য দর্শনে পুরুষকে যে সব গুনে ভূষিত করা হয়েছে, সে সব গুণে ধর্মের ঈশ্বরের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বেদান্ত দর্শনে ব্রহ্মকে সগুণ এবং নির্গুন বলে অভিহিত করা হয়েছে। শংকরাচার্যের মতে পারমার্থিক দৃষ্টিতে ব্রহ্ম ই একমাত্র সৎ বস্তু, সৃষ্টিও নাই জগৎ ও নাই। এবং ব্রহ্ম হলেন শুদ্ধ নিষ্ক্রিয়, ভেদরহিত। কিন্তু ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ব্রহ্ম হলেন ঈশ্বর। অর্থাৎ মায়াশক্তির সাহায্যে বিশ্বচরচরের স্রষ্টা,

Dhaka University Institutional Repository

পালনকর্তা ও ধ্বংসকর্তা। সুতরাং পারমার্থিক দৃষ্টিতে ব্রহ্ম হলেন নির্গুণ এবং ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ব্রহ্ম হলেন সগুণ। রামানুজের মতে ব্রহ্ম নির্গুণ নয় সগুণ। কেননা ব্রহ্মের নির্গুণত্ব কোন প্রমাণের দ্বারাই স্থাপিত করা যায় না। তিনি ব্রহ্ম ও ঈশ্বরকে একই অর্থে গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে ব্রহ্মর অসংখ্য গুণাবলীর মধ্যে সৎ চিৎ ও আনন্দ ব্রহ্মের স্বরূপ ও গুণ। সৎও সত্তাবান রূপে তিনি জগতের স্রষ্টা ও পালক, জ্ঞাতারূপে তিনি জ্ঞানের কারণ এবং আনন্দরূপে তিনি সকল আনন্দের উৎস। কাজেই উপর্যুক্ত আলোচনায় ইহা সুস্পষ্ট যে, হিন্দু মতে ব্রহ্ম নির্বিশেষ ও সবিশেষ। নির্বিশেষরূপে তিনি নির্গুণ। কিন্তু জীব জগতের সাথে সম্পর্কের দিক থেকে তিনি সবিশেষ বা সগুণ। অন্য কথায় ব্রহ্ম নির্গুণ হয়েও সগুণ, নিরাকার হয়েও সাকার। আর এ উভয় স্বরূপেই তিনি পূর্ণ।

২. জগৎ সত্তা (জগৎ সম্পর্কে সূফী ও হিন্দু মরমীদের ধারণা)

২.১ ইসলামী ধারণা

ইসলাম ধর্মানুসারে আল্লাহই জগতের একমাত্র সত্তা। তিনি ব্যতীত দ্বিতীয় কোন সত্তা নেই। পবিত্র কুরআনের ভাষায়: "তিনিই আদি এবং তিনিই অন্ত; তিনিই প্রকাশ্য এবং তিনিই গুপ্ত।"[৭১] যা কিছু দৃশ্যমান, যা কিছু প্রকাশিত, সবই তাঁর বিকশিত রূপমাত্র। এ বিশ্ব সংসার সেই পরম সুন্দরের প্রকাশ। জগতের সব কিছুই তাঁর থেকেই নিঃসৃত এবং জগতের সকল কিছুতে তাঁরই মহিমা, তাঁরই গুণ ও সৌন্দর্য বিচ্ছুরিত। কাজেই সৃষ্টি তার ঐচ্ছিক প্রক্রিয়া মাত্র। যেমন হাদীসে কুদ্‌সীতে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন: আল্লাহ্ বলেন, আমি ছিলাম একটি গুপ্ত মনি (ধনভাণ্ডর)। সৃষ্টি বলতে যখন কোন কিছুই ছিলনা, তখন আমি আমার আপন রূপের সৌন্দর্য দর্শনে বিভোর ছিলাম। আমাকে আমি প্রকাশ করতে চাইলাম। সমুদয় বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে দিয়ে আমি আমায় প্রকাশ করলাম। তাহলে সৃষ্টি জগৎ আমায় জানবে। (আমিও এদের জানতে পারব) আবার পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেন: তিনি যখন কোন বিষয় (সৃষ্টির) ইচ্ছা করেন তখন কেবলমাত্র 'হও' (কুন) এই আদেশবাণীই উচ্চারণ করেন আর সঙ্গে সঙ্গেই ইহা হয়ে যায় (ফাইয়াকুন)।[৭২] সৃষ্টি তাই তাঁরই ঐচ্ছিক এক বিশিষ্ট পদ্ধতি, যেখানে তিনি নিজে মহিত (ভিতরে ও বাহিরে ঘিরে) আছেন। এবং এ বিশ্ব জগতে দ্বিতীয় কোন সত্তা নেই। আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে আরো বলেন, তোমরা আমার নিকট থেকে নিঃসৃত হয়েছ এবং আমার কাছেই প্রত্যাগমন করবে। অর্থাৎ আমরা (সিফাত) প্রথমে তাঁতে (যাতে) ছিলাম এবং পরে এই পৃথিবীতে আগমন করি এবং পরিশেষে একটা

Dhaka University Institutional Repository

নির্দিষ্ট কাল পরে তাঁতেই (যাতে) ফিরে যাব। এখানে যাত ও সিফাতের এরূজ (আরোহণ) ও নুযুল (অবরোহন) এর কথাই বলা হয়েছে। যাত ও সিফাতের অপূর্ব প্রেম সম্পর্ক এবং তার বিরহ ও মিলনের মাধুর্যকে বিকশিত করা হয়েছে সৃষ্টি নামক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। যাত ও সিফাতের মিলন বিরহে তাই সূফীরা বেহেশ্‌ত-দোজগের তাৎপর্য ও রহস্য খুঁজে পান: এবং কুরআন ও হাদীসের পথ অনুসরণ করেই সূফীরা সেজন্য এ জগতকে (সিফাত) তাঁরই মূর্ত প্রকাশ বলে মনে করেন। তাই তাদের মতে জগৎ বাস্তব; কারণ পরমসত্তার স্থান এ জগতেই বিদ্যমান। আর এ কারণেই বেদান্ত দর্শনের মায়াবাদ বা বৌদ্ধ শূন্যতাবাদ থেকে সূফীদর্শনের মূলত স্বতন্ত্র।

আল্লাহ্ আসমান-জমিন এবং এদুয়ের মধ্যবর্তী সকল কিছু ছয়দিনে সৃষ্টি করেন।[৫৩] এই ছয় দিনের বর্ণনা ইহুদী ও খ্রিষ্টধর্মের সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনাও রয়েছে। পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে যে, ছয় দিনে পৃথিবী সৃষ্টি সমাপ্ত করে আল্লাহ্ আরো দুই দিনে আকাশকে সপ্ত স্তরে বিভক্ত করেন।[৫৪] এই দুই বক্তব্যকে আপতবিরোধ বলে মনে হলেও মূলত এর মধ্যে কোন বিরোধ নেই।[৫৫]

জগৎ সৃষ্টির উপাদান সম্পর্কে ইসলামী মত হচ্ছে- আল্লাহ্ জগতের বস্তুগুলোকে বিভিন্ন উপাদানে সৃষ্টি করেন। যেমন মানব সৃষ্টি প্রসঙ্গে তিনি বলেন: আর আমিতো মানুষকে সৃষ্টি করেছি। মাটির নির্যাস (সারাংশ) থেকে।[৫৬] প্রাণীজগতের সৃষ্টি প্রসঙ্গে বলেন: আর আল্লাহ্ প্রত্যেক প্রাণীকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন; এদের কতক পেটেভর দিয়ে চলে, কতক দু'পায়ে ভর দিয়ে চলে এবং কতক চার পায়ে ভর দিয়ে চলে।[৫৭] এভাবে জগতের বিভিন্ন বস্তু বিভিন্ন উপাদানে সৃষ্টি হলেও সকল বস্তুর মূলে রয়েছে নূরে মোহাম্মদী। কারণ আল্লাহ্ পাক সৃষ্টির সর্বাগ্রে মুহাম্মদ (স.) এর নূর বা জ্যোতির্ময় সত্তা সৃষ্টি করেন। হাদীস শরীফে আছে যে, "...অতঃপর হযরত মুহাম্মদ (স.) এর নূরকে তিনি সৃষ্টি করেছেন।... অতঃপর আল্লাহ্‌তায়ালা নূরে মুহাম্মদী (স.) এর দিকে তাকালেন, ফলে সে নূর লজ্জায় ঘর্মাক্ত হয়ে যায়। সর্ব শরীর হতে অজস্র ঘাম বের হয়। অতঃপর আল্লাহ্ তাঁর মাথার ঘাম হতে ফেরেশতা জাতিকে সৃষ্টি করেন এবং তাঁর চেহারার ঘাম হতে আরশ, কুরছী, লৌহ, কলম, চন্দ্র, সূর্য, পর্দা, নক্ষত্ররাজি এবং আকাশে যতকিছু আছে তা সৃষ্টি করেন।... আর উভয় পায়ের ঘাম হতে সৃষ্টি করেছেন ভূ-মণ্ডল ও তাতে অবস্থিত সবকিছু।"[৫৮] মুহাম্মদ (স.) আরো বলেন: ... অতঃপর আল্লাহ্ পাক এই নূরকে চারভাগে

Dhaka University Institutional Repository

ভাগ করলেন। একভাগ দ্বারা আল্লাহ্ পাকের মহান আরশ সৃষ্টি করলেন, দ্বিতীয় ভাগ দ্বারা আল্লাহ্ পাক কলম তৈরী করলেন। তৃতীয় ভাগ দ্বারা বেহশ্‌ত বা স্বর্গরাজ্য পয়দা করলেন। চতুর্থ ভাগ দ্বারা আলমে আরওয়া (আত্মজগৎ) ও সমুদয় সৃষ্টি জগতের উদ্ভব ঘটালেন। আবার এই চারভাগ থেকে আরও চার প্রকারের নূর উদ্ভব ঘটালেন।[৫৯] তন্মোধ্যে তিন প্রকারের দ্বারা বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা, লজ্জা ও প্রেমের সৃষ্টি করলেন আর প্রথম ভাগ দ্বারা আমার অস্তিত্বের আবির্ভাব ঘটালেন। সূফীদের মতে সৃষ্টির মূলে রয়েছে প্রেম, প্রেমের কারণে আল্লাহ্ নূর নবীকে সৃষ্টি করেন এবং নূর নবী হতে সমগ্র বিশ্বজগৎ ও তন্মধ্যস্থ সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেন। তাই সূফীরা বলেন, "প্রভুবুলি নাম ধরে আপে নিরঞ্জন, প্রেম হেতু করিলেন সংকার সৃজন। প্রেমরসে বান্ধিয়া সৃজিল ত্রিভুবন। প্রেম বিনে রেনু এক না কৈলাসৃজন। প্রেম হন্তে সকল সৃজিছে নিরঞ্জন।"[৬০]

মানবকে আরবীতে ইনসান বলা হয়। ইনসান শব্দের তিনটি অর্থ রয়েছে। যেমন- 'ইনসান' শব্দের প্রথম অর্থ নয়নমনি, নয়নপুতলি। মানব দেহের মধ্যে নয়ন পুতলির মর্যাদা যেমন সর্বোচ্চ তেমনি সৃষ্টির মধ্যে মানবের মর্যাদা সর্বোচ্চ বিধায় মানবকে ইনসান বলা হয়। ইনসান শব্দের আরেক অর্থ ভুল ভ্রান্তি। যেহেতু মানুষকে ভুল ভ্রান্তির দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে, তাই তাকে ইনসান বলা হয়। সর্বোপরি ইনসান শব্দের আরেক অর্থ প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা বা মহব্বত অথবা প্রণয়। কেননা প্রেমই সৃষ্টির মূল। এই প্রেমের অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েই আল্লাহ্ তায়ালা স্বেচ্ছায় মানবকে সৃষ্টি করেছেন। এই প্রেম-প্রীতি ভালবাসার অনুরাগ থেকেই আল্লাহ্ স্বয়ং তার আপন জ্যোতির্ময় সগুণ সত্তা থেকে সৃষ্টির সর্বাগ্রে আহমদ সত্তার বিকাশ ঘটান। নিরাকার এ জ্যোতির্ময় অশরীরী আহমদ সত্তা থেকে আকার বিশিষ্ট মুহম্মদ শরীরী সত্তার বিকাশ ঘটান। নিখিল সৃষ্টি জগতের উৎসমূলে নূরে মুহাম্মদ (স.) এর জ্যোতির্ময় সত্তার অনুপরমাণুগুলো সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। কাজেই সমুদয় জগৎই প্রেমময়ের প্রেমোত্তেজনা প্রসূত বিকাশ লাভের মূল উৎস বা কারণ স্বরূপ। সমুদয় বিশ্বজগৎ যেমন প্রেমময়ের প্রতি অনুরক্ত, আসক্ত, আকৃষ্ট তেমনি প্রেমময়ও তাঁর সৃষ্টিজগতের প্রতি নিবিষ্ট। এই আকর্ষণ ও বিকর্ষণ থেকেই সৃষ্টিজগতের স্থিতিশীলতা সংরক্ষিত হয়ে আসছে। এই স্থিতি স্থাপকতা সৃষ্টিজগতের প্রত্যেক বস্তুতেই পরিদৃষ্ট হচ্ছে। স্রষ্টা, সৃষ্টির প্রতি তাঁর নিবিষ্টতা (তাওয়ায়ু)র বলেই তাঁর সৃষ্টি জগতের স্থিতি স্থাপকতা সংরক্ষণ করছেন। যখন তিনি তাঁর এই তাওয়ায়ু বা নিবিষ্টতাকে সরিয়ে নেবেন, তখনই মহাপ্রলয় বা কিয়ামতের সূচনা হবে। স্রষ্টার স্বীয় যাত তাঁর যাতে হাকীকীতে মিলনার্থে সদা

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাকুল। তাই মাওলানা জালাল উদ্দিনরুমী বলেন- শোন মানব আত্মার ফরিয়াদ। সে যে তার আপন সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং সেই বিরহের অভিযোগ সে করছে। সে চায় তার আপন সত্তার সাথে মিলতে এ নিয়েই তার বিরহ বিধুর যাতনা চলছে।

স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির এই যে মিলন কামনা, একেই বলা হয় ইশ্‌ক বা প্রেম। ইশ্‌ক দু'ভাবে বিভক্ত। যথা ইশ্‌কে হাকীকী ও ইশ্‌কে মাজাযী। জীবাত্মায় ইশ্‌কে মাজাযী বিদ্যামান। আর মানবাত্মায় হাকীকী বর্তমান। কেননা, মানুষ যাতে কাদীম বা বিশ্বাত্মা থেকে উক্ত পদ্ধতিতে ইশ্‌কে হাকীকী লাভ করেছে। ফলে মানব চরিত্রে ঐশী গুণাবলীর বিকাশ ঘটেছে। এজন্য সে তার মৌল সত্তার সাথে মিলনার্থে সদা উদগ্রীব। এ প্রসঙ্গে ইমাম কাশ্‌তলাগী তার মাকসূদ-এ আউয়াল-এ হাকীকতে মুহাম্মদী সম্পর্কে বলেছেন: আল্লাহ্‌ পাক তাঁর আহদিয়াতের যাতী নূরের মাধ্যমে হাকীকতে আহমদিয়াতের বিকাশ সাধন করেছেন। অতঃপর তিনি স্বীয় যাত ও সিফাতের দ্বারা গুণান্বিত করে নবুওয়াত ও বিলায়ত দ্বারা হাকীকাতে মুহাম্মদীকে সুসজ্জিত করছে। এই কারণেই তিনি নূরুম মিন নূরুলুল্লাহ্‌ (আল্লাহ্‌র জ্যোতিতে জ্যোতির্ময়) আখ্যায় বিভূষিত হয়েছেন। তিনি মানবাকৃতিতে সর্বোৎকৃষ্ট সত্তার অধিকারী। এই অর্থেই রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: আমি একটি স্বচ্ছ দর্পনসদৃশ। আমার প্রতি যেই দৃষ্টি করুকনা কেন, সেই এই দর্পনের মধ্যে নিজের দোষ-ত্রুটির প্রতিবিম্ব দেখতে পাবে।

সুতরাং সমুদয় বিশ্বসৃষ্টি মূলে রয়েছে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জ্যোতির্ময় সত্তা। এই জ্যোতির্ময় নূরের বিচ্ছুরণ থেকেই মহাবিশ্বের আবির্ভাব ঘটেছে। এই শক্তি থেকেই মানবের আত্মশক্তির বিকাশ ঘটেছে এই জন্যই মানবাত্মার প্রবৃত্তির মধ্যে প্রেমময়ের বিরহ-ব্যাকুলতা বা মিলন আকাঙ্খা পরিদৃষ্ট হয়। এককথায় স্রষ্টার সঙ্গে সৃষ্টির মিলনের আগ্রহ ও আকর্ষণ কমবেশী সর্বস্তরের সৃষ্টির মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়। ইহাকেই বিজ্ঞানীগণ মহাকর্ষ নামে অভিহিত করেছেন। এই অর্থেই মহানবী (স.) বলেছেন: প্রত্যেক বস্তু তার মৌল সত্তার দিকে প্রত্যাগমন করে। কিন্তু সসীম জগৎ অসীমের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ সাধনে অক্ষম বলেই মুহাম্মদ (স.) এর মাধ্যমে সংযোগ সাধনের পথ সুগম করে দিয়েছেন আল্লাহ্‌পাক।

Dhaka University Institutional Repository

ইবনুল আরাবীর মত

জগতের আদি অবস্থা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রখ্যাত সূফী ইবনুল আরাবী বলেন যে, স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্টি সহনিত্য।[৬১] সৃষ্টিজগৎ আদিতে ছিল স্বর্গীয় মনের স্থির উপকরণ হিসেবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত লুকায়িত আল্লাহ্ চাইলেন নিজেকে দৃশ্যমান করে প্রকাশ করতে। তাই এক আদেশের বলে তিনি সৃষ্টি করলেন এ সমগ্র জগৎ। কাজেই ইবনুল আরাবী ছিলেন আকস্মিক সৃষ্টিবাদ (শূন্য থেকে জগৎ সৃষ্টির ধারণা) এর বিরোধী। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "একথা ঠিক নয় যে, এক সময় জগৎ ছিলনা এবং পরবর্তী কোন এক পর্যায়ে এর উদ্ভব ঘটেছে। আসলে জগৎ অনাদি, অনন্ত অসীম ও চিরস্থায়ী একক সত্তা (আল্লাহ্) এর বহিঃপ্রকাশ।"[৬২] ছায়া যেমন বস্তুর প্রতিবিম্ব, তেমনি এ জগৎ ও আল্লাহ্র প্রতিবিম্ব স্বরূপ। কোন অভাববোধ থেকে নয়, নিজেকে সৃষ্টিজীব ও জগতে অভিব্যক্ত করার ইচ্ছা এবং জীব ও জগতের প্রতি অনুরাগের কারণেই আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন এ বিশ্বজগৎ। আল্লাহ্ তাঁর এ অনুরাগ বা প্রেমেরই অভিব্যক্তি ঘটালেন তার নিজের আদলে সৃষ্টি আদি মানব আদমসৃষ্টির মধ্য দিয়ে। আরাবির ভাষায় আদমের যে লোগস থেকে সৃষ্টি তা সেই আদমীয় লোগস যা কিনা পূর্ণ মানুষের নামান্তর। পূর্ণ মানবের মধ্যেই আল্লাহ্ নিজেকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করেন। আর এই পূর্ণমানব এমন ব্যক্তি যিনি আল্লাহ্কে পূর্ণভাবে জানেন এবং আল্লাহ্র গুণাবলী পূর্ণরূপে প্রকাশ করেন। তারই মাঝে আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টিকে নিরীক্ষণ করেন এবং তারই মাধ্যমে তাদের উপর দয়া প্রদর্শন করেন। পূর্ণ মানবই সৃষ্টির কারণ।[৬৩] কেননা তাঁরই মধ্যে সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়েছে। অর্থাৎ পূর্ণ মানবের খাতিরেই আল্লাহ্সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি করেন। আল্লাহ্ বিশ্ব ও পূর্ণমানবের মধ্যদিয়ে নিজেকে প্রকাশ করেছেন।[৬৪] তাঁর মতে পূর্ণ মানব কেবল সৃষ্টির কারণই নয় বরং বিশ্বের রক্ষক ও পরিচালক। যতক্ষণ পূর্ণমানব বিশ্বের মাঝে আছেন ততক্ষণ বিশ্ব অস্তিত্বশীল থাকবে। কাজেই পূর্ণ মানুষের অস্তিত্বের কারণেই পৃথিবীর যাবতীয় গতি প্রকৃতি এবং এরই সুবাদে পৃথিবীর অস্তিত্ব ও স্থিতি। আর এ পূর্ণ মানবই আল্লাহ্র সত্যিকার প্রেমিক।

পার্থিব জীবনের তাৎপর্য

ইসলাম মতে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কিছুকে আল্লাহ্ মানব কল্যাণে সৃষ্টি করেছেন। আর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্য। মানুষের পার্থিব

Dhaka University Institutional Repository

জীবন দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে গঠিত। দেহের জন্য প্রয়োজন পার্থিব জগতের বিষয়াবলী। অন্যদিকে আল্লাহ্তায়ালার পরিচয় লাভ এবং তাঁর মহব্বতই আত্মার খাদ্য। দেহ হচ্ছে আত্মাকে তাঁর লক্ষ্য স্থলে পৌঁছানোর বাহনসদৃশ। কিন্তু মানুষ যদি পার্থিব জীবনে সদাসর্বদা দেহের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান যেমন- আহার সংগ্রহ, বাসস্থান নির্মাণ পোশাকপরিচ্ছদ ইত্যাদির আয়োজনে ব্যাপৃত থাকে তবে সে পারলৌকিক সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত থাকবে। আল্লাহ্ আত্মার বাহন দেহকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য মানুষের মধ্যে কামনারূপ রিপু প্রদান করেছেন। কিন্তু কামনাচায় সর্বদা নিজের সীমা অতিক্রম করতে। তাই উহাকে নিয়ন্ত্রণে জন্য আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন বুদ্ধির। আবার কামনা বা আকাঙ্ক্ষার সীমা নির্ধারণ করার জন্য আল্লাহ্ তার প্রেরিত পুরুষদের মাধ্যমে দিয়েছেন ধর্মীয় (জীবন) বিধান। কিন্তু কামনা প্রবৃত্তি বুদ্ধির পূর্বে মানব দেহের সাথে সন্নিহিত হয় বলে পূর্বাহ্নে বলবান হয়ে পড়ে। ফলে মানুষ বুদ্ধি ও ধর্ম বিধানের অবাধ্য হয়ে দেহের জন্য ভোগ্য বস্তু সংগ্রহে ব্যাপৃত থাকে। পরিণামে তাঁর মধ্যে লোভ-লালসা, কৃপণতা, সার্থপরতা প্রভৃতি নিকৃষ্টভাবের উদয় হয়। পরবর্তীতে ইহাই আত্মার বিনাশের কারণ হয়। কিন্তু মানুষ ভুলে যায় দেহ রক্ষা করা উচিত কেবল আত্মার উৎকর্ষের জন্য আর আত্মার উপস্থিতি আল্লাহ্র পরিচয় লাভ ও তার মহব্বতের জন্য। উল্লেখ্য যে দুনিয়ার মন্দ ও ক্ষতিকর পদার্থের সাথে কিছু পারলৌক পদার্থ আছে। যেমন সৎ জ্ঞান ও সৎ কর্ম। এই দুই বস্তু মানবাত্মার সাথে পরকালের বিদ্যমান থাকবে। পার্থিবজীবনে সৎকর্ম বা নেককাজের উদ্দেশ্য হচ্ছে দ্বিবিধ: ক) আত্মার পরিশুদ্ধি ও উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করা: যা পাপবর্জনের ফলেই সম্ভব। খ) আল্লাহ্র যিকিরের প্রতি আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি করা, যা ইবাদতের কারণে উৎপন্ন হয়। উল্লেখ্য ইসলামে বংশবৃদ্ধির কাজ পারলৌকিক কাজের সহায়ক। এবং এই উদ্দেশ্যে বিবাহ, পানাহার পোশাক বাসস্থান ইত্যাদি প্রয়োজন মত ব্যবহার পরকালের পক্ষে হিতকার। মানুষের উচিত এই সব বস্তু প্রয়োজন অনুযায়ী এবাদতের সুযোগ লাভের আশায় ব্যবহার করা এবং সন্তুষ্ট থাকা।

সুতরাং ইহা সুস্পষ্ট যে পার্থিব জীবনে মানুষের মূল লক্ষ্য আল্লাহ্র মহব্বত অর্জন। তাই এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য মানুষের উচিত সৎ জ্ঞান (আত্মা ও আল্লাহ্র পরিচয় জ্ঞান) ও নেক কাজের মাধ্যমে হৃদয়ের মধ্যে আল্লাহর মহব্বত সুপ্রতিষ্ঠিত করা এবং এরই মাধ্যমে আখেরাতে আল্লাহ্র অনন্ত সৌন্দর্য দর্শনের জন্য ব্রতী হওয়া।

Dhaka University Institutional Repository

২.২ জগৎ সম্পর্কে হিন্দু ধারণা

হিন্দু ধর্ম একটি বৈচিত্র্যময় ধর্ম। বহু বিচিত্র মতের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এ ধর্মে। এমনকি একই বিষয় সম্পর্কে এ ধর্মে একই গ্রন্থেও বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। তাই জগৎ সম্পর্কেও হিন্দু মত বৈচিত্র্যময় তবে বৈচিত্র্যের মধ্যেও হিন্দু ঋষিরা ঐক্য স্থাপনে ছিলেন প্রয়াসী।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি হিন্দু মতে পরমসত্তা ব্রহ্ম হলেন সয়ম্ভূ, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, সর্বময়, করুণাময় ও প্রেমময় হিন্দু মতে ব্রহ্মই হলেন জগতের স্রষ্টা। ব্রহ্ম তাঁর সর্বময় ক্ষমতা বলে জগৎ সৃষ্টি করেন। এ সম্পর্কে বেদে বলা হয়েছে, "সে এক প্রভু তাঁর সকল দিকে চক্ষু, সকল দিকে মুখ, সকল দিকে হস্ত সকল দিকে পদ, ইনি দু'হস্তে এবং বিবিধ পক্ষ সঞ্চালন পূর্বক নির্মাণ করেন, তাতে বৃহৎ দ্যুলোক ও ভূলোক রচনা হয়।"[৬৫] বেদে যদিও উল্লেখ রয়েছে ব্রহ্ম বা বিশ্বকর্মা তাঁর সর্বময় ক্ষমতা বলে এ বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন তবে পূর্বস্থিত উপাদান থেকে জগতের সৃষ্টি হয়েছে এরূপ আভাষও বেদে রয়েছে। যেমন- "সর্ব প্রথমে অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। সমস্তই চিহ্নবর্জিত ও চতুর্দিকে জলময় ছিল। অবিদ্যমান বস্তু দ্বারা সে সর্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন। তপস্যার প্রভাবে সে এক বস্তু জন্মিলেন। সর্বপ্রথমে মনের উপর কামের আবির্ভাব হল, তা হতে সর্বপ্রথম উৎপত্তির কারণ নির্গত হল। বুদ্ধিমানগণ বুদ্ধি দ্বারা আপন হৃদয় পর্যালোচনাপূর্বক অবিদ্যমান বস্তুতে বিদ্যমান বস্তুর উৎপত্তি স্থান নিরূপণ করলেন।"[৬৬] এখানে অবিদ্যমান বস্তু থেকে বস্তুর বিদ্যমান বস্তুর উৎপত্তি এর তাৎপর্য হচ্ছে এক অস্পষ্ট সত্তা থেকে স্পষ্ট সত্তার উদ্ভব হয়েছে।[৬৭] জগতের প্রকৃতি ব্যাখায় বেদে বলা হয়েছে- জগতের তিনটি স্তর রয়েছে। সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছে স্বর্গ। এখানে স্বর্গীয় দেবতারা বাস করেন। এর নীচে রয়েছে বায়ুমণ্ডলীয় স্তর, এখানে বায়ু দেবতা-ইন্দ্র, বায়ু প্রমুখ বাস করেন। এর নীচে রয়েছে পৃথিবী। এটি হচ্ছে সমতল ও বৃত্তাকার। এখানে দেবতারা ছাড়াও বিভিন্ন প্রকার প্রাণী বাস করে। এ তিন স্তরের জগৎ আবার ২১টি অঞ্চলে বিভক্ত। পৃথিবীর নিম্নে রয়েছে ৭টি পাতাল। আর এ পাতালের নিম্নে রয়েছে ৭টি নরক। এগুলো হচ্ছে নিম্নাত্মাদের শাস্তিমূলক আবাস স্থল।[৬৮]

জগতের উৎপত্তি সম্পর্কে উপনিষদের বক্তব্য হচ্ছে ব্রহ্ম কোন বহিঃস্থিত বা পূর্বস্থিত কোন জড় পদার্থ থেকে জগৎ সৃষ্টি করেননি। মাকড়সা যেমন নিজের

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে থেকেই আঁশ সৃষ্টি করে আবার নিজের মধ্যে গ্রহণ করে তেমনি ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করার পর আবার তাকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করেন, অন্যদিকে পূর্বস্থিত কোন জড় পদার্থ থেকেও ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করেননি কেননা সৃষ্টির পূর্বে কোন জড়ের অস্তিত্ব ছিল না। একমাত্র আত্মারই অস্তিত্ব ছিল। ঐতরেয় উপনিষদের প্রথমেই বলা হয়েছে, "সৃষ্টির পূর্বে এই দৃশ্যমান জগৎ একমাত্র অদ্বিতীয় আত্মস্বরূপেই বর্তমান ছিল, নিমেষাদি ক্রিয়াযুক্ত অপর কিছুই ছিল না। সেই আত্মা এইরূপে ঈক্ষণ (চিন্তা) করলেন- আমি লোক সকল সৃষ্টি করব। অতঃপর অম্বো লোক, মরীচি লোকসমূহ, মরলোক ও অপ্‌লোক সৃষ্টি করলেন। অম্বোলোক দ্যুলোকের উপরে অবস্থিত এবং দ্যুলোকই উহার আশ্রয়। অন্তরীক্ষ বা আকাশই মরীচিলোকসমূহ। পৃথিবীই মরলোক, যেসকল লোক পৃথিবীর নিম্নে অবস্থিত তারাই অপ্‌লোক।"[৬৯] তৈত্তিরীয় উপনিষদের বলা হয়েছে- "পরমাত্মা কামনা (ইচ্ছা) করলেন, আমি বহু হব, আমি উৎপন্ন হব। তিনি তপস্যা (সৃষ্টি বিষয়ে সংকল্প) করলেন। তিনি তপস্যা করে এই যা কিছু সেই সমস্তই সৃষ্টি করলেন। এই সমস্ত করে তাতে অনুপ্রবিষ্ট হলেন।[৭০] এই উপনিষদে আরো বলা হয়েছে যে, এই আত্মা (ব্রহ্ম) হতে আকাশ উৎপন্ন হয়েছে। আকাশ হতে বায়ু, বায়ু হতে অগ্নি, অগ্নি হতে জল, জল হতে পৃথিবী, পৃথিবী হতে ওষধিসমূহ, ওষধিসকল হতে অন্ন, অন্ন হতে দেহধারী পুরুষ (মানুষ) উৎপন্ন হয়েছে। হিন্দু মতে এই সমস্ত জগৎ স্বরূপতঃ ব্রহ্মই কারণ ইহা তা হতেই জাত হয়, তাতে লীন হয় এবং তাঁতে জীবিত থাকে।[৭১]

জগৎ সৃষ্টি মূলে রয়েছে ব্রহ্মার রস আস্বাদন। একাকি তিনি আনন্দ পেলেন না বলেই তিনি জগৎ সৃষ্টি করেন। এ প্রসঙ্গে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর গীতাঞ্জলি কাব্যে বলেন- জগৎ সৃষ্টি, জগৎ লীলা, আনন্দ ময়ের আনন্দ লীলা। জীব সেই লীলার সাথী-

আমার মাঝে তোমার লীলা হবে
তাই তো আমি এসেছি এভবে।

তিনি আরো বলেন-

তোমায় আমায় মিলন হবে বলে
আলোয় আকাশ ভরা
তোমায় আমায় মিলন হবে বলে
এমন ফুল্লশ্যামল ধরা।

Dhaka University Institutional Repository

ব্রহ্মার এই রস আস্বাদনের কথা সুস্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে বৈষ্ণব দর্শনে। জগতে মানুষ ও ভগবানের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তারা বলেন: ভগবান রস স্বরূপ: রসো বৈ সঃ। আবার তিনি সবার প্রিয়, বন্ধু ও আত্মা স্বরূপঃ প্রেষ্ঠো ভবান তুনুভূত্যাং কিল বন্ধুরাত্মা। তিনি এক ছিলেন, জীবনলীলা আস্বাদনের জন্য বহু হলেন: একোহম বহু স্যাম। সৃষ্টির মাধ্যমে তিনি লীলারস আস্বাদন করেছেন; পিতা, পুত্র, মাতা, কন্যা ভগ্নী জায়া, সখা প্রভৃতিরূপে তিনি প্রেম দিচ্ছেন এবং নিচ্ছেন। শান্ত, দাস্য সখ্য, বাৎসল্য মধুর কৃষ্ণভক্তির মধ্যে প্রধান। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন:

বন্ধু হয়ে পিতা হয়ে জননী হয়ে
আপনি তুমি ছোট হয়ে এস হৃদয়ে।

আবার স্রষ্টা ও সৃষ্টি সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বৈষ্ণবরা বলেন:

রাধাবৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি
অনোন্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি।

অর্থাৎ ভগবান এক ছিলেন লীলা রস উপভোগের জন্যই নিজ অংশ থেকে রাধা রূপা সৃষ্টিকে সৃষ্টি করলেন। আর একই কারণে তিনি সৃষ্টি রূপে বহু হলেন। অর্থাৎ বৈষ্ণবদের মতে কৃষ্ণ হলেন ঈশ্বর আর জগৎ হলো রাধা সদৃশ।

হিন্দুধর্মে পার্থিব জীবনের তাৎপর্য

হিন্দুধর্মানুসারে মানবজীবনের রয়েছে চারটি পরম উদ্দেশ্য- ধর্ম (ন্যায়পরায়ণতা), অর্থ (ধন-সম্পত্তি), কাম (সুখ-সম্ভোগাদি) এবং মোক্ষ (আধ্যাত্মিক মুক্তি)। 'ধর্ম' নীতি-নৈতিকতা, সততা, সাধুতা, ন্যায়পরায়ণতা প্রভৃতি চর্চার কথা বলে। 'অর্থ' বৈষয়িকতার স্বীকৃতি দেয়। 'কাম' মানসিক, নান্দনিক ও সাংস্কৃতিক তৃপ্তির প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে। 'মোক্ষ' পরম শান্তি ও আনন্দের কথা বলে। এই চারটি উদ্দেশ্যের মধ্য দিয়েই মানবজীবনের সার্থকতা অর্জিত হয়। এর মধ্যে মোক্ষ হচ্ছে মানবজীবনের মূল লক্ষ্য।

জীবনসার্থকতার জন্য হিন্দুধর্মে চারটি আশ্রম বা স্তর অতিক্রমের কথা বলা হয়েছে। আশ্রমগুলো হচ্ছে- ব্রহ্মচর্য (প্রশিক্ষণ কাল), গার্হস্থ্য (গৃহস্বামী হিসাবে সাংসারিক ক্রিয়াদি সম্পাদন), বানপ্রস্থ (নির্জনবাস) এবং সন্ন্যাস (সংসারের মায়া ত্যাগ ও মুক্তির জন্য অপেক্ষমান কাল)। প্রথম আশ্রম হচ্ছে দেহ-মনের নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রশিক্ষণকাল। কিশোর বয়সে এই আশ্রম গ্রহণ করবে। দ্বিতীয় স্তরে সে পারিবারিক ও সামাজিক জীবন যাপন করবে। বিবাহের মধ্য দিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

সংসারব্রত ও সামাজিক দায়িত্ব পালন করবে। তৃতীয় স্তরে গৃহস্থালির দায়িত্ব পরবর্তী প্রজন্মের ওপর ন্যস্ত করে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বনে গমন করবে। মনুর মতানুসারে, এই তৃতীয় স্তরটি গ্রহণের অধিকার আসে পিতামহ হওয়ার পর, অথবা যখন চর্মে ক্ষুদ্র ভাঁজ পড়ে যায় অথবা চুল ধূসর বর্ণের হয়ে যায়। মূলত সামাজিক সম্পর্ক শিথিল করে ধ্যাণের অভ্যাস করার জন্যই এই আশ্রমটি গ্রহণ করা হয়। চতুর্থ স্তরে এসে মানব আধ্যাত্মিক মুক্তির অবস্থা অর্জন করে। তার বাহ্যজীবন থাকে ঠিকই, কিন্তু ধন, যশ, সফলতা, ব্যর্থতা কিছুই তার জীবনে প্রভাববিস্তার করতে পারে না। এই স্তরে সে আত্মার প্রশান্তি অর্জন করে। আসক্তি, আবেগ তার মন থেকে বিলীন হয়ে যায়। আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক কর্মে তার কোন সম্পৃক্ততা থাকে না, সে পরিণত হয় একজন যথার্থ মানুষে। সে যেন পরমাত্মা বা ব্রহ্মের সঙ্গে মিলনের জন্য অপেক্ষা করছে।

অতএব, হিন্দুধর্ম অনুসারে মানবজীবনের তাৎপর্য হচ্ছে, বৈষয়িকতা এবং জাগতিক কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে আত্মার উৎস পরমাত্মার বা ব্রহ্মের সঙ্গে একীভূত হওয়ার সাধনায় ব্রতী হওয়া। আর এটি অর্জনে ব্যর্থ হলে বারবার জন্মমৃত্যুর অধীন হয়ে এই পার্থিব দুঃখ-কষ্টের মোকাবিলা করতে হয়।

৩. মানবাত্মার স্বরূপ

আত্মা সম্পর্কিত আলোচনা দর্শন ও ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আত্মার ধারণার সাথেই মানুষের পারলৌকিক জীবনের সুখ-দুঃখ ভোগের বিষয়টি জড়িত। আবার এর মাধ্যমেই মানুষ ঈশ্বরকে এবং তাঁর প্রেমকে উপলব্ধি করতে পারে। তাই আত্মার রহস্য উদঘাটনের জন্য সকল ধর্মই প্রয়াসী।

৩.১ আত্মা সম্পর্কে ইসলামী ধারণা

ইসলামী মতে আত্মা এক আধ্যাত্মিক দ্রব্য। এর স্বরূপ যথার্থ ভাবে উপলব্ধি করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। তাই পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে: আত্মার প্রকৃতি অনুধাবনের জন্য মানুষকে নিতান্ত অল্প জ্ঞানই দেওয়া হয়েছে।[৭২] আবার মহানবী (স.)ও আত্মার রহস্য সকলের নিকট ব্যক্ত করেননি। বরং বুদ্ধের ন্যায় তিনিও আধ্যাত্মিক বিষয়ে সাধারণ মানুষকে নিরুৎসাহিত করেছেন। কারণ, তিনি মনে করতেন অধিবিদ্যক প্রশ্নাবলীর আলোচনা অন্তহীন বিতর্কের জন্ম

Dhaka University Institutional Repository

দিবে এবং এর ফলে সাধারণ মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তবে পরবর্তী সময়ে কোন কোন সূফী এবং ধর্মতত্ত্ববিদ আত্মার প্রকৃতি ব্যাখ্যায় প্রয়াসী হন, যদিও তারা কোন সর্ব সম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেননি। তাদের অনেকেই মনে করতেন আত্মা বস্তুগত দ্রব্য নয় বরং আধ্যাত্মিক দ্রব্য। ইহা আমাদের দেহের মধ্যে অবস্থিত সূক্ষ্ম দেহের ন্যায়। ইহা এমন একটি সত্তা, যা অপরিবর্তনীয়, অবিভাজ্য, অদৃশ্য এবং অনির্বচনীয়। আত্মাকে বুঝতে সাধারণত নফস, রূহ এ জাতীয় শব্দ ব্যবহৃত হয়। এ শব্দ গুলো কুরআনে পরস্পর বিনিময়ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। আবার একই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। নফ্স, রূহ ইত্যাদি শব্দ কুরআনে যেসব অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হলো:

কুরআনে নফ্স শব্দের বিভিন্ন অর্থ

কুরআনে নফ্স এবং ইহার বহুবচন আনফুস এবং নুফূস নিম্নোক্ত অর্থ সমূহে ব্যবহৃত হয়েছে।

ক) ব্যক্তি অর্থে: কুরআনে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নফ্স শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ব্যক্তি অর্থে। যেমন আল্লাহ্ বলেন: অফী আনফুছিকুম; আফালা তুবছিরূন। অর্থাৎ এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও। তবুও কি তোমরা অনুধাবন করবেনা।[৭৩] কুরআনে অন্যস্থানে আল্লাহ্ বলেন: বাদশাহ্ বলল: ইউসুফকে আমার কাছে নিয়ে এসো, আমি তাকে আমার একান্ত সহচর করে রাখব। তারপর সে যখন তার সাথে কথা বলল, তখন সে বলল: নিশ্চয় আজ আপনি আমার কাছে অতিশয় মর্যাদাবান ও বিশ্বস্ত।[৭৪]

খ) আল্লাহ্ অর্থে: কুরআনের অনেক আয়াতে নফ্স শব্দ দ্বারা আল্লাহ্কে নিদের্শ করা হয়েছে। যেমন- আপনি জিজ্ঞেস করুন। আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে তার মালিকানা কার? আপনি বলে দিন: আল্লাহ্র। তিনি অনুগ্রহ করাকে নিজের উপর (নাফছিহী) কর্তব্য হিসাবে স্থির করে নিয়েছেন।[৭৫]

গ) মানবাত্মা অর্থে: নফ্স শব্দটি কুরআনে মানবাত্মা অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে যেমন- আর যদি আপনি দেখেন যখন জালিমরা মৃত্যু যন্ত্রনায় থাকে এবং ফেরেশ্তারা হাত বাড়িয়ে বলে: বের কর তোমার প্রাণ (আনফুছাকুম)[৭৬]

Dhaka University Institutional Repository

নফ্সের বৈশিষ্ট্য

কুরআনে মানবাত্মা অর্থে ব্যবহৃত নফ্স শব্দটি তিনটি বৈশিষ্ট্য বা তিন ধরনের আত্মাকে নির্দেশ করেছে। যথা-

১) নফ্সে আম্মারা বিচ্ছুয়ি অর্থাৎ মন্দ আদেশ দাতা আত্মা বা ভোগাত্মা

২) নফ্সে লাওয়ামা অর্থাৎ ধিক্কারদাতা আত্মা ৩) নফ্সে মুত্মাইন্না বা প্রশান্ত আত্মা।

১) নফ্সে আম্মারা বিচ্ছুয়ি: নফ্সে আম্মারা বিচ্ছুয়ি হচ্ছে এমন আত্মা যা মানুষকে মন্দ কাজে প্রবৃত্ত করে। সূফীদের মতে দৈহিক ভোগ বিলাসের যে তীব্র আকঙ্ক্ষা মানব হৃদয়ে জাগ্রত হয়, তাকেই নফ্সে আম্মারা বা ভোগাত্মা বলে। ইহা সর্বদা মানবকে বিভ্রান্ত করার চক্রান্তে লিপ্ত থাকে। তাই আল্লাহ্ বলেন: "মানুষের মন (নাফ্ছী) তো মন্দ কাজেরই প্ররোচনা দিয়ে থাকে।"[৭৭]

মহানবী (স.) তাঁর সাহাবীদের (সাথীদের) জিজ্ঞাস করলেন: এরূপ সাথী সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কী, যাকে সম্মান-সমাদর করলে অর্থাৎ অন্ন-বস্ত্র দিলে সে তোমাদেরকে বিপদে ফেলে দেয়। অপরদিকে তার অবমাননা করা হলে অর্থাৎ তাকে নিরান্ন ও উলঙ্গ রাখা হলে সে তোমাদের সাথে সদ্ব্যবহার করে? সাহাবারা বললেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ্! এর চেয়ে অধিক মন্দ আর কিছু হতে পারেনা। মুহাম্মদ (স.) বললেন: ঐ সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের বুকের মধ্যে যে আত্মা আছে সে-ই এ ধরনের সাথী।[৭৮]

২) নফ্সে লাওয়ামা: নফ্সে লাওয়ামা হচ্ছে সতত পরিবর্তনশীল আত্মা। ইহা কখনো আল্লাহ্র ইবাদত করে আবার কখনো বিপরীত কাজ করে। ই মধ্যম অবস্থা, ইহা পাপ প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করে না বটে, কিন্তু স্বীয় কারণে তাকে দমন রাখতে পারে না, পরে কৃত পাপের জন্য দুঃখিত হয় এবং নিজেকে তিরস্কার করে। এরূপ আত্মার ইঙ্গিত করে কুর হয়েছে" অলা উকছিমু বিন্নাফ্ছিল লাওয়্যামাহ্" অর্থাৎ আর কসম সে যে নিজেকে তিরস্কার করে থাকে।[৭৯] হযরত হাসান বসরীর মে লাওয়ামা হচ্ছে মোমিন অথবা ধার্মিক ব্যক্তির আত্মা।

৩) নফ্সে মুতমাইন্না: মুতমায়িন্না অর্থ পরিতুষ্ট আত্মা। কোন মানুষ কাছে যা আছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে তখন তার আত্মাকে বলে মু

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ যখন মানুষ মনের ও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সাধনা করতে করতে মনকে এমন স্তরে পৌছে দেয় যে, তখন তার মনে মন্দ কাজের কোন স্পৃহা থাকে না, মন্দ ক্রিয়ার ইচ্ছা তার মন থেকে বিদূরিত হয়, সব কর্মে সে আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করে, তার মনে কোন প্রকার দুশ্চিন্তা পেরেশানি অবশিষ্ট থাকে না, সকল অবস্থায়ই সে আল্লাহ্‌র উপর সন্তুষ্ট থাকে; কারো বিরুদ্ধে তার কোন অভিযোগ থাকে না, এরূপ আত্মাকে কুরআনে নফ্‌সে মুতমায়িন্না বা প্রশান্ত আত্মা বলে অভিহিত করা হয়েছে। এদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌ বলেন: ইয়া অইয়্যাতুহান নাফ্‌ছুল মুতমাইন্নাহ্‌

ইরজ্বিঈ ইলা রাব্বিকা রাদিয়াতাম মারদিয়্যাহ্‌ অর্থাৎ হে প্রশান্ত আত্মা, তুমি তোমার রবের কাছে ফিরে এসো এমন ভাবে যে, তুমি তার প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট।[৮০]

রূহ্‌ শব্দের বিভিন্ন ব্যবহার

রূহ্‌ শব্দটি কুরআনে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন-

ক) প্রাণ অর্থে: পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌ আদম (আ.) এর মধ্যে স্বীয় রূহ ফুঁকে দিলেন। এতে আদম (আ.) প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠলেন। আল্লাহ্‌ বলেন: তারপর যখন আমি তাকে ঠিকঠাকমত গঠন করব এবং তার মধ্যে আমর রূহ থেকে ফুঁকে দেব, তখন তোমরা তার প্রতি সিজদাবনত হবে।[৮১] এখানে নফ্‌স শব্দের অর্থ ফুঁকে দেয়া বা সঞ্চার করা। কাজেই আল্লাহ্‌ রূহ ফুঁক দিলেন অর্থ হচ্ছে প্রাণ সঞ্চার করলেন।

খ) আল্লাহ্‌র আদেশ অর্থে: মুহাম্মদ (স.) কতিপয় ইহুদী কর্তৃক আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে আল্লাহ্‌ প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ করেলন: বলে দিন, রূহ আমার পালনকর্তার আদেশে গঠিত। এ বিষয়ে তোমাদের সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে।[৮২]

রূহ এবং নফ্‌স: রূহ এবং নফ্‌স শব্দের অর্থ একই, কারণ এ শব্দ দুটি পরস্পর বিনিময়েভাবে ব্যবহৃত হয়। পবিত্র কুরআনেও তারা একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন- আল্লাহ্‌ই মানুষের জান কবজ করেন তার মৃত্যুর সময় এবং যার মৃত্যু আসেনি তারও নিদ্রাকালে। অতঃপর যার জন্য তিনি মৃত্যুর ফয়সালা করেন তার প্রাণ তিনি রেখে দেন এবং অন্যান্যগুলো এক নির্দিষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

সময়ের জন্য ছেড়ে দেন। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল লোকদের জন্য।[৮৩]

মুসলিম চিন্তাবিদদের মতে রূহ আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। ইহা ঐশী শক্তির স্ফুলিঙ্গ স্বরূপ, যা আল্লাহ্ হযরত আদম (আ.) এর মধ্যে ফূৎকার বা দম্ করে দিয়েছেন এবং মানব বংশ পরম্পরা ক্রমে লাভ করেছে। আলোকরশ্মি থেকে যেরূপ জ্যোতির ছটা বেরিয়ে আসে, তদ্রুপ রূহ থেকেও আলোর ছটা প্রতিফলিত হয়ে থাকে। এই রূহ দ্বারাই মানবদেহ সঞ্জীবিত হয়।

রূহ বা মানবাত্মা সাধারণত চার রকমের। রূহে জিসমানী, রূহে রূহানী, রূহে সুলতানী এবং রূহে কুদসী (কুর্সী)। এসব বিভিন্ন রকমের রূহ স্বয়ং আল্লাহ্ তালার বিভিন্ন প্রকার নূরের প্রতিভাস মাত্র। অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের যাতী নূর (নির্গুণ জ্যোতি) তথা স্বজাতীয় দীপ্তি বা আদিম প্রভা থেকেই সব রকমের রূহ প্রদীপ্ত।

মহান আল্লাহ্ মানবজাতির রূহসমূহকে তাঁর একত্ববাদের বীজ (তাওহীদ) দ্বারা সৃষ্টি করে প্রথমে আলমে লাহুত বা ব্রহ্মলোকে স্থিতি করে রাখেন। এই আলমে লাহুতে অবস্থানরত রূহসমূহকে রূহে কুদসী বলা হয়। আলমে লাহুত থেকে আলমে যাবরুত বা তেঃজলোকের প্রতি অবতীর্ণ করে থাকেন। আলমে লাহুত ও আলমে যাবরুত তথা ব্রহ্মলোক ও তেজঃলোক এই দুই হেরেমের মাঝখানে অবস্থি যাবারূত নামক স্থানে নূরের পোশাক দ্বারা রূহসমূহকে আচ্ছাদিত বা আবৃত করা হয়। এই স্তরে অবস্থানরত রূহকে রূহে সুলতানী বলা হয়। রূহে সুলতানীকে নূরের পোশাক পরিয়ে বা স্বআবরণে আলমে মালাকূতে প্রেরণ করা হয়। এই স্তরের রূহকে রূহে রূহানী বা পরমাত্মা নামে অভিহিত করা হয়। অতঃপর এইসব রূহে রূহানীকে আলমে মালাকুত থেকে আলমে নাসুত বা জীবলোক অথবা জীবজগতে অর্থাৎ দেহে পাঠানো হয়। তারপর এইসব রূহকে আলমে মূলক বা পার্থিব জ্যোতি দ্বারা আবৃত ও আচ্ছাদিত করা হয়। এইসব রূহকেই রূহে জিসমানী বা জীবত্মা বলা হয়।

চার প্রকার রূহের বর্ণনা

১) রূহে জিসমানী: রূহে জিসমানী জীবন বা দেহের সাথে সম্পর্কিত। রূহে জিসমানীকে বাংলায় জীবাত্মা বলা হয়। ইহাকে জীবনী শক্তিও বলা যেতে

Dhaka University Institutional Repository

পারে। কেননা জীবাত্মা দ্বারাই জীবনী শক্তি সক্রিয় থাকা। ইহা দ্বারা দেহের সতেজতা রক্ষা পায়।

২) রূহে রূহানী: রূহে রূহানী পবিত্র যাতে কাদীমের সাথে সম্পর্কিত যাতে কাদীম হচ্ছে পরম সত্তার আদিমত্ব। রূহে রূহানী স্বয়ং আল্লাহ পাকের দর্শন লাভে ব্যস্ত। রূহে রুহানীকে বাংলায় পরমাত্মা বলা হয়। বস্তু বা জড় জগৎ আল্লাহ পাকের যাতে কাদীমে প্রবেশ করতে অক্ষম। রূহানী শক্তির প্রভাবে নফ্স বা প্রবৃত্তি নিচয় যখন অস্তিত্বহীন হয়ে যায়, তখনই হৃদয়ে তত্ত্বজ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায় এবং আল্লাহ্ পাকের দর্শন লাভ সম্ভব হয়ে উঠে। ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমেই আল্লাহ্ পাকের প্রকাশ্যদান (অনুগ্রহ) লাভ করা সম্ভব কিন্তু আল্লাহ্ পাকের দর্শন লাভ সম্ভব নয়। কেবল আল্লাহ্র ওলীগণই আল্লাহ্ পাকের সুমহান নৈকট্য লাভ করতে পারেন। কেননা তারা যাহিরী ও বাতিনী উভয় প্রকার ইল্ম এবং তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে থাকেন। এবং আল্লাহ্তায়ালা তাঁর প্রেমিক ওলীদেরকে বিনা উপলক্ষ ও উপকরণেই ইলমে মারিফাত, ইলমে লাদ্দুনী তথা আত্ম তত্ত্বজ্ঞান দান করে থাকেন। এইরূপ আত্মতত্ত্বজ্ঞদের ইবাদতে আল্লাহ্ পাকের সুমহান অস্তিত্বের উপলব্ধি হয় এবং আপন মাশুক বা প্রেমময়ের সংগে চির মিলনের শুভ বাণী লাভ করে।

৩) রূহে সুলতানী: ইহার পরম লক্ষ্য আল্লাহপাকের সান্নিধ্য লাভ করা প্রেমময় আল্লাহ্ তাঁর প্রেমিকদের অন্তকরণে তাওহীদের বীজ থেকে রূহে রূহানী শক্তির প্রতিফলন ঘটিয়ে থাকেন। এই রূপ অন্তকরণ পার্থিব সকল কামনা থেকে মুক্ত। এইরূপ নির্মল-নিষ্পাপ অন্তরেই আল্লাহ্ তায়ালার পবিত্রতম যাত পাকের জ্যোতির্ময় নূর প্রতিবিম্বিত হয়ে থাকে। আল্লাহ্ পাক তখন এইরূপ নির্মল নিষ্পাপ ও অনাবিল হৃদয়ের বান্দাদের পবিত্র আত্মাকে ডেকে বলতে থাকেন: 'ওহে রূহ নামক পাখী, তুমি এই শোকাচ্ছন্ন জল ছিন্ন করে উড়ে গিয়ে আল্লাহ পাকের সান্নিধ্যে পৌঁছে যাও।" এই অর্থেই মহানবী (স.) বলেছেন: মানুষের উদ্যম-উদ্যোগ পাহাড় পর্যন্ত ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে সক্ষম। ৪) রূহে কুদসী: বাকাবিল্লাহে উন্নীত সাধকের হৃদয় হলো রূহে কুদসী। এ অবস্থায় জাগতিক সমুদয়ে দুঃখ-কষ্ট তিরোহিত হয়ে খোদা প্রেমিকের হৃদয়ে এক অপূর্ব আনন্দ অনুভূত হয়। এরূপ রূহের দিকে লক্ষ্য করেই আল্লাহ্ বলেন: আমি তোমাদের দেহে অবস্থান করছি অথচ তোমরা আমাকে অনুভব করতে পারছনা।[৮৪] এ প্রসংগে নবী (স.) বলেন- মুমেন বা খোদা বিশ্বাসী লোকের হৃদয়ে আল্লাহ্ পাকের আরশ অবস্থিত। আল্লাহ্ বলেনঃ ভূ-মণ্ডল ও নভোমণ্ডল

Dhaka University Institutional Repository

সমূহ জুড়ে আমার স্থিতি সম্ভব নয়, অথচ খোদা বিশ্বাসী মুমেনের অন্তকরণে আমার সমাবেশ সম্ভব।

আল্লাহর সর্বশক্তিমত্তা, ক্ষমতা ও আত্মার স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কুরআনে খালক ও আমর এই শব্দ দুইটি ব্যবহৃত হয়েছে। খালক শব্দের অর্থ এবং আমর শব্দের অর্থ আদেশ। একমাত্র আল্লাহ্ সৃষ্টি ও আদেশের মালিক। ড. খলিফা আব্দুল হাকিম খালক ও আমর শব্দ দুটিকে দর্শনের পরিভাষা অনুসারে যথাক্রমে প্রকৃতি ও ইচ্ছা হিসেবে ভাষান্তর করে বলেন যে, শব্দ দু'টি সৃষ্টির জগৎ বা প্রাকৃতিক জগৎ ও আধ্যাত্মিক জগৎ বা আত্মার জগৎ বুঝায়। সূফীদের মতে আত্মা প্রভুর আদেশ হতে উদ্ভূত। কুরআনে এই আয়াতে আত্মার স্বরূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং আদেশ জগৎ বা আধ্যাত্মিক জগৎ যে আত্মার উৎপত্তিস্থল সে কথা উল্লেখ করেছে। এ আদেশের জগৎই ইচ্ছার জগৎ। আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী আত্মার উৎপত্তি হয়েছে। কুরআনের অন্যত্র কুন বা হও শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। আল্লাহ কোন কিছু সৃষ্টি ইচ্ছা করলে 'কুন' বা হও শব্দ দিয়ে আদেশ করেন আর সবকিছু শূন্য হতে সৃষ্টি হয়। এই ধারণা হতে রুমি মনে করেন যে, আল্লাহ্র আদেশ স্বগতরূপে অবিভক্ত ঐক্য। এই ঐক্য হতে প্রকৃতি ও তন্মধ্যস্থ সবকিছুর উৎপত্তি হয় এবং এই অবিভক্ত ঐক্যই অবিভক্ত পরম ঐক্যের প্রতি ইঙ্গিত দেয়। অন্য কথায় প্রকৃতির মধ্যে অবস্থিত সত্তারূপে মানবাত্মা এক হিসেবে সৃষ্ট বস্তু অন্য হিসাবে অসৃষ্ট বস্তু।[৮৫] রুমির বহুপূর্বে মুসলিম যুক্তিবাদী দার্শনিক আল ফারাবি কুরআনের খালক ও আমর শব্দ দিয়ে আত্মার প্রকৃতি ব্যাখা করেছেন। অতএব, দেখা যায় যে, দার্শনিক এবং সূফী উভয়ই কুরআনের শব্দ ব্যবহার করেছেন। আত্মার প্রকৃতি ব্যাখা করার জন্য। তাদের মতে আত্মা সৃষ্ট জগতের বস্তু হয়েও অসৃষ্ট, আত্মার এই সৃষ্ট জগতে মানব দেহের মধ্যে অবস্থান করে কিন্তু সৃষ্টি বস্তুর কোন বৈশিষ্ট্য আত্মায় আরোপ করা যায়না। সৃষ্টি জগৎ দেশ-কালের অধীন, আত্মা দেশ কালের বহু ঊর্ধ্বে, অতীন্দ্রিয় জগতের বা আধ্যাত্মিক জগতের সত্তা। তাই দেশ - কালের কোন বৈশিষ্ট্য আত্মায় আরোপিত হয়না। সুতরাং আত্মায় বহুত্বগুণ আরোপ করা যায় না। রুমির মতে মানবাত্মা এক পরমাত্মা হতে সৃষ্টি হয়েছে এবং সকল আত্মা মূলত এক। তিনি আত্মার ঐশী একত্বের উপর খুব বেশী গুরুত্বারোপ করেন, ঐশী একাত্বই সকল আত্মা বা বহুত্বের মূল সত্তা।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, আত্মা পরম সত্তা থেকে উদ্ভূত। পরম সত্তা কখনো সৃষ্টি বস্তু হতে পারেনা। কাজেই স্বরূপগতভাবে আত্মা অসৃষ্ট, অনন্ত ও

Dhaka University Institutional Repository
চিরন্তন। কিন্তু আত্মা একটি অসৃষ্ট সত্তা এই ধারণা আপাতদৃষ্টিতে কুরআনের শিক্ষার বিপরীত মনে হয়। সূফীরা আত্মা অসৃষ্ট এই ধারণাকে কুরআনে বর্ণিত আত্মা 'সৃষ্ট' এ ধারণার সাথে সামঞ্জস্য বিধানে সচেষ্ট হন। তারা বলেন মাটি দিয়ে আদমের দেহ তৈরী করে তার মধ্যে আল্লাহ্ নিজ আত্মার অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে আদমকে চেতনাপূর্ণ জীবে পরিণত করেন। আদম যদি শুধু মাটির দেহধারী জীব হতো তাকে সেজদা করার জন্য আল্লাহ্ কখনও ফেরেশতাদের আদেশ করতেন না। সূফীরা বিশ্বাস করেন যে, ফেরেশতা কর্তৃক আদমকে সেজদাই প্রমাণ করে যে আদমের দেহের মাঝে ঐশী সত্তা আছে, আদম কেবল মাত্র কাদামাটির মানুষ নয় বরং আদমের মাঝে যে ঐশী শক্তি রয়েছে তা আল্লাহ্র সত্তা। আল্লাহর সত্তা অসৃষ্ট ও চিরন্তন। তাই সূফীরা মানবাত্মাকে পরমাত্মার তুলনা করেন এবং অসৃষ্ট ও চিরন্তন বলে বিশ্বাস করেন।

আত্মা বস্তুগত না আধ্যাত্মিক দ্রব্য

আত্মা বস্তুগত দ্রব্য না আধ্যাত্মিক দ্রব্য এ নিয়ে ধর্মতাত্ত্বিক, দার্শনিক এবং সূফীদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। মুসলিম ধর্মতাত্ত্বিক ও দার্শনিকদের অনেকে মনে করেন যে, আত্মা বস্তুগত দ্রব্য। ইসলামের প্রথম দিকের ধর্মতত্ত্ববিদরা (Mutakallimin) আত্মাকে অনেকটা বস্তুগত দ্রব্য হিসাবে মনে করতেন। তাদের মতে আধ্যাত্মিক শক্তি থেকে যে সব প্রাণী আত্মা উদ্ভূত তা হলো দেহ বা দৈহিক স্বভাবের। এমনকি যারা আত্মাকে বস্তু হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেন না তারাও আত্মাকে দেহের উপবস্তু বলে মনে করেন। মুসলিম পরমাণুবাদীদের মতে সমস্ত জগৎ পরমাণুর দ্বারা সৃষ্টি। পরমাণুর মত আত্মারও সৃষ্টি ও ধ্বংস আছে; আল্লাহ্ প্রতি মুহূর্তে নতুন নতুন পরমাণু সৃষ্টি করছেন। আবার কোন কোন ধর্মতত্ত্ববিদরা মনে করেন আত্মা হলো ভৌতিক উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। আত্মা সম্পর্কে ধর্মতাত্ত্বিকদের উক্ত মত গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, আত্মা আল্লাহ্র আদেশ; আর যা কিছু আদেশের জগতের অর্ন্তগত তার দেহের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে বস্তুগত বা আধ্যাত্মিকভাবে থাকতে পারে। অন্যদিকে নাজ্জাম (Nazzam) এবং তার অনুসারীদের মতে আত্মা হলো সম্পূর্ণভাবে আধ্যাত্মিক দ্রব্য; ইহা বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা এবং বিশুদ্ধ ইচ্ছাশক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। তারা আত্মাকে সংজ্ঞায়িত করেছেন অভ্যন্তরীণ সাঙ্কল্পিক কর্ম হিসেবে। একইভাবে সূফীরা আত্মাকে দেহ থেকে পৃথক আধ্যাত্মিক দ্রব্য বলে অভিহিত করেন। ইমাম গাযালী, মহিউদ্দিন ইবনুল আরাবী, ফখরুদ্দীন রাজী প্রমুখ মনে করেন আত্মা বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক দ্রব্য।

Dhaka University Institutional Repository

এ দ্রব্য যদিও দেহের সাথে সম্পৃক্ত হয়, দেহে অবস্থান করে তবুও দেহ কখনও তাকে আত্মস্থ করতে পারেনা, বরং আত্মা দেহকে পরিচালনা করে। আল্লাহ্‌র আদেশ হিসেবে, সূক্ষ্ম, মৌলিক আধ্যাত্মিক দ্রব্য হিসেবে এ পরিচালনা সম্ভব। একইভাবে Sayad Sabiq বলেন, "আত্মা কোন বস্তুগত দ্রব্য নয়; ইহা হলো আধ্যাত্মিক দ্রব্য। ইহা স্বর্গীয়, অপরিবর্তনীয় ও অবিভাজ্য দ্রব্য। কারণ ইহা যদি বস্তুগত দ্রব্য হতো তবে ইহা পরিবর্তনশীল এবং বিভাজ্য হত।"[৮৬]

বস্তুত আল্লাহ্‌ কুরআনে যে ধারণা দিয়েছেন তা থেকে বলা যায় যে, আত্মা দৈহিক বস্তুর গুণাবলীর উর্ধ্বে। ইহা অপরিমেয়, অবিভাজ্য, অদৃশ্য। আর এসব বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে আত্মাকে আধ্যাত্মিক দ্রব্য হিসেবে সংজ্ঞায়িত করাই শ্রেয়।

৩.২ হিন্দুধর্মে আত্মা

আত্মা সম্পর্কিত সমস্যাটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে হিন্দুধর্মে। সম্ভবত আত্মার ধারণাটি হিন্দুধর্ম ও দর্শনের সব চেয়ে পুরাতন ও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা।[৮৭] ঋগবেদের সংহিতায় এ ধারণার উৎপত্তি। পরবর্তিতে ব্রাহ্মণ, অরণ্যক ও উপনিষদের মধ্য দিয়ে আত্মার ধারণা ক্রমান্বয়ে গুরুত্ব লাভ করতে থাকে। গীতা ব্রহ্মসূত্র এবং ষড়দর্শনেও বিষয়টি ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে। আর এভাবে ব্যাপক আলোচনার ফলে আত্মা সম্পর্কে সৃষ্টি হয়েছে নানা বিভ্রান্তির।

হিন্দুধর্মে আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে যে বিষয়টি সমস্যার সৃষ্টি করে তা হচ্ছে এর যথেচ্ছ ব্যবহার। আত্মা (Self) বলতে সাধারণত যা বুঝায় সে অর্থে 'আত্মা' 'ব্রহ্ম' 'জীব' 'পুরুষ' 'অহংকার' 'বুদ্ধি' 'প্রাণ' 'পুদগল' ইত্যাদি শব্দগুলো যথেচ্ছভাবে ব্যবহৃত হয়েছে ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনে। এছাড়া এদের প্রত্যেকটি একাধিক অর্থে হিন্দু শাস্ত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন- ঋগবেদে 'আত্মা' শব্দটি সাতটি স্বতন্ত্র অর্থে ব্যহৃত হয়েছে।[৮৮] (এ সাতটি অর্থ হলো-বায়ু, শ্বাস, স্বয়ং দেহ নিয়ন্তা সত্তা ও বাহ্যিকনীতি। সংস্কৃত অভিধান রচায়িতাগণ আত্মাকে এগারটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেন।[৮৯] (এ এগারটি অর্থ হলো- সৃষ্টি, প্রকৃতি, চেষ্টা, দৃশ্য, বুদ্ধি, পরম সত্তা, দেহ, মন, সূর্য, অগ্নি ও বায়ু)। বৈদিক সাহিত্যে আত্মা শব্দটির অর্থের দিক থেকে অধিকতর ঘনিষ্ট শব্দ হচ্ছে 'ব্রহ্ম'। ঋগবেদে ব্রহ্ম শব্দটি দুইশতবার ব্যবহৃত হয়েছে।[৯০] এ শব্দটি পুংলিঙ্গ এবং উভয়লিঙ্গ- এ উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে এ গ্রন্থে। তাছাড়া আত্মা শব্দটির পরিভাষা নিয়েও রয়েছে অনেক সমস্যা। ধর্ম, মায়া, ব্রহ্ম ইত্যাদি শব্দের যেরূপ কোন ইংরেজী

Dhaka University Institutional Repository

পরিভাষা নেই ঠিক তেমনিভাবে আত্মারও কোন ইংরেজী পরিভাষা নেই। আর এসব কারণই আত্মার স্বরূপ নিয়ে অনেক বিরোধী ধারণার উদ্ভব ঘটেছে।

হিন্দুধর্মে ব্যক্তি আত্মাকে বলা হয় জীবাত্মা আর ঈশ্বর বা ব্রহ্মকে বলা হয় পরমাত্মা, ঋগবেদে এবং উপনিষদে একই দেহ বৃক্ষে আশ্রিত দুটি পাখির রূপকের সাহায্যে জীবাত্মা এ পরমাত্মার স্বরূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।[১] এ পাখি দুটি সর্বদা মুক্ত ও পরস্পর সখ্যভাবাপন্ন। এদের মধ্যে একটি দেহ বৃক্ষের ফলভোগ করছে আর অন্যটি ভোগ না করে কেবল দর্শন করে। এ দুটি পাখির প্রথমটি হলো জীবাত্মা আর দ্বিতীয়টি হলো পরমাত্মা। উভয় উভয়ের সখা- জীব ও ঈশ্বর পরস্পর সখ্য বন্ধনে আবদ্ধ। দেহের হৃদয়াকাশেই উভয়ের উপলব্ধি স্থান। অর্থাৎ জীব ঈশ্বরকে ভালবাসার আগেই ঈশ্বর স্বেচ্ছায় তাকে প্রেমাস্পদ রূপে গ্রহণ করে তার হৃদয় ও দায় অবস্থান নিয়েছে।

যদিও জীবের হৃদয় ঈশ্বরের আবাসস্থল।[২] তবুও মোহাচ্ছন্ন জীব মনে করে আমি ক্ষুদ্র, অতি দীন, শক্তিহীন। এর ফলে তার মধ্যে সৃষ্টি হয় অভাবের অনুভূতি। অভাববোধ হতে মনে কামনা-বাসনা জন্মে। আর কামনা পূরণ না হলেই সে শোক দুঃখে ম্রিয়মান হয়ে পড়ে। কিন্তু জীব যদি ঈশ্বরের অনুগ্রহে জ্ঞান লাভ করে তবে সে দেখতে পায় যে, সে কেবল দেহ বিশিষ্ট ক্ষুদ্র জীব নয়, বরং ঈশ্বরের অনুপ্রকাশ। তখন তার সমস্ত দৈন্য ঘুচে যায়। শোক দুঃখ আর তাকে স্পর্শ করতে পারে না। সুতরাং মানব জীবনের পরম লক্ষ্য তার প্রেমাস্পদকে হৃদয়ে উপলব্ধি করা।

হিন্দুধর্ম অনুসারে জীবাত্মা পরমাত্মারই প্রকাশ। তৎসত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। জীবাত্মা দেহের সাথে সম্পৃক্ত সীমাবদ্ধও নয়। অর্থাৎ ইহা অসীম। জীবাত্মা দেহের সংগে সম্পৃক্ত হলেও ইহা দেহ, ইন্দ্রিয় এবং মন থেকে পৃথক। দেহের সাথে সম্পৃক্ত অবস্থায়ও আত্মা দেহের সাথে এর পার্থক্য অনুভব ও উপলব্ধি করতে পারে এবং সচেতন সত্তা হিসেবে নির্লিপ্তভাবে দেহে অবস্থান করতে পারে। কাজেই হিন্দু ধর্মে আত্মার স্বরূপ কি তা বুঝতে হলে আত্মার সাথে দেহ ও মনের পার্থক্য বুঝতে হবে।

শরীরের সাথে সম্পৃক্ততার দিক থেকে হিন্দুধর্মে আত্মাকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা- ব্যবহারিক আত্মা ও বিশুদ্ধ আত্মা।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবহারিক আত্মা

ব্যবহারিক আত্মার তিনটি দিক রয়েছে। যথা- দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক।[৯৩]

দৈহিক দিক

জীবাত্মা যখন পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে তখন তার তিন ধরনের শরীর থাকে: স্থূল শরীর, সূক্ষ্ম শরীর ও কারণ শরীর। মাতৃগর্ভ হতে যে আত্মা ভূমিষ্ট হয় ইহা ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চমহাভূতের সমন্বয়ে গঠিত। এটা হচ্ছে স্থূল শরীর। স্থূল শরীর আত্মার অভিজ্ঞতা ও জাগতিক বস্তুর ভোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। সচেতন অবস্থায় আমরা যা জানি তার ভিত্তি হলো স্থূল শরীর। মৃত্যুতে এই পঞ্চভূতাত্মক স্থূল শরীর বিনষ্ট হয় এবং তখন সূক্ষ্ম শরীর নিয়ে নতুন আর একটি দেহ গ্রহণ করে।

সূক্ষ্ম শরীর স্থূল শরীরের চেয়ে আরও অনেক বেশী সূক্ষ্ম উপাদান দ্বারা গঠিত। বাহ্য ইন্দ্রিয় দ্বারা একে প্রত্যক্ষ করা যায়না। এটা জন্মান্তরবাদের ভিত্তি। কেননা আত্মা কোন দেহ পরিগ্রহ করবে তা নির্ভর করে অতীত জীবনের সমস্ত কামনা, বাসনা চিন্তা ও কার্যের উপর। আর এগুলো মন, বুদ্ধি, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞনেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ প্রাণ দ্বারা গঠিত।

কারণ শরীর হচ্ছে স্থূল শরীর ও সূক্ষ্ম শরীরের মূল ভিত্তি। স্থূল শরীর এবং সূক্ষ্ম শরীর এটি হতে উৎপন্ন হয় এবং এটিতেই লীন হয়। তৈত্তীরিয় উপনিষদে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, আত্মা থেকে আকাশের উদ্ভব ঘটে, আকাশ থেকে বায়ু, বায়ু থেকে আগুণ, আগুণ থেকে পানি, পানি থেকে গাছ-পালা, গাছ-পালা হতে খাদ্য এবং খাদ্য এবং খাদ্য হতে উদ্ভূত হয় ব্যক্তির।[৯৪] কারণ শরীর হচ্ছে প্রশান্ত নিদ্রার ভিত্তি।

মানসিক দিক

মানসিক আত্মার গুণাবলী হচ্ছে- কামনা-বাসনা, ভয়, ঘৃণা, ইচ্ছা, আনন্দ, বেদনা, জ্ঞান ইত্যাদি। এগুলো প্রত্যক্ষভাবে দেহের সাথে সম্পৃক্ত নয়। তবে আত্মা যখন দেহের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে তখনই আত্মা এ সকল গুণাবলী ধারণ করে এবং আত্মার মুক্তির সাথে সাথেই এসব গুণাবলীর বিনাশ ঘটে। আত্মার চারটি অবস্থা।[৯৫] স্থূল শরীরের সাথে সম্পর্কযুক্ত থাকাকালে আত্মাকে তিনটি

Dhaka University Institutional Repository

অবস্থা অতিক্রম করতে হয়। এ তিনটি অবস্থা হলো: জাগ্রত অবস্থা, স্বপ্নাবস্থা এবং গভীর নিদ্রাবস্থা। চেতনার চতুর্থ অবস্থাকে বলা হয় তূরীয় অবস্থা। এটি ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য অনুমানের অযোগ্য এবং প্রমাণ বর্হিভূত। কেবল মাত্র একে আত্মারূপে অনুভব বরা যায়। এটি শান্ত শিব ও অদ্বৈত।

নৈতিক দিক

আত্মার নৈতিক বৈশিষ্ট্য গুলো দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলোর চেয়ে মৌলিক এবং গুরুত্বপূর্ণ। আত্মার দৈহিক ও মানসিক অবস্থা নৈতিক বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল। জীবাত্মার নৈতিক গুণসমূহ তার নিজের কর্মের ফল। নৈতিক উৎকর্ষের দিক থেকে জীবাত্মাকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। যথা- নিত্য, (চির যুক্তা) মুক্ত ও বদ্ধ। বদ্ধ আত্মা হচ্ছে সেসব আত্মা যা হিংসা-বিদ্বেষ, ভয়-ঘৃণা, কামনা-বাসনা ও লোভ-লালসার দ্বারা পরিচালিত। আর সে কারণেই তারা বন্ধী অবস্থায় আছে। এসব আত্মা, জন্মান্তরের শৃঙ্খলে আবদ্ধ। বদ্ধ আত্মা যখন তার যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে তখনই সে মুক্তি লাভ করে।

বিশুদ্ধ আত্মা

হিন্দুধর্মে বিশুদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তিক আত্মার উপর সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই বিশুদ্ধ আত্মা মানুষের দেহ, মন, ও ইন্দ্রিয় থেকে স্বতন্ত্র। দেহ ও ইন্দ্রিয়ের পরিবর্তন ঘটে কিন্তু একজন ব্যক্তির সত্যিকার আত্মা স্থায়ী ও আত্মসচেতন সত্তারূপে বিদ্যমান থাকে। চেতনার তূরীয় অবস্থায় এই আত্মা যথার্থ স্বরূপে প্রকাশিত হয়। এ অবস্থা হলো সমাধির অবস্থা, যা কেবল যোগের মাধ্যমেই লাভ করা যায়। এ অবস্থায় দেহ ইন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধি কোনটাই কাজ করে না। তবে এ অবস্থাকে অচেতন অবস্থা বলা যাবেনা। কারণ তা হলে ইহা মৃত্যুর সাথে অভিন্ন হবে। আত্মার এ অবস্থা হল সৎ চিৎ ও আনন্দের অবস্থা। এ অবস্থার সাথে আত্মার দৈহিক মানসিক ও নৈতিক রূপের তুলনা করে বলা যায় এই তিন অবস্থা হলো বাহ্যিক। এগুলো আত্মার মূল স্বরূপের সাথে সম্পৃক্ত নয়। এগুলো হলো এক রকম বিবৃদ্ধ (accretion) যা জাগতিক জীবনে আত্মাকে আচ্ছাদিত করে রাখে।[৯৬] প্রকৃত পক্ষে আত্মা হলো শুদ্ধ, বুদ্ধ মুক্ত ও নিত্য।

হিন্দুধর্ম অনুসারে আত্মা জন্মেও না মরেও না। ইহা কোন কিছু হতে উৎপন্ন হয়নি এবং কোন কিছুই ইহা হতে হয়নি। ইহা জন্ম রহিত, নিত্য, শাশ্বত এবং

Dhaka University Institutional Repository

পুরান, দেহ ধ্বংস হলেও আত্মা ধ্বংস হয় না। শরীর হত হলেও ইনি হত হন না।"[৯৭] মানুষ যেরূপ জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেরূপ আত্মা জীর্ন শরীর পরিত্যাগ করে অন্য নতুন শরীর পরিগ্রহ করে। গীতায় কতিপয় আত্মাকে অচ্ছেদ্য, আদহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য। ইহা নিত্য, সর্বব্যাপী, স্থির, অচল, সনাতন, অব্যক্ত, অচিন্ত্য, অবিকার্য বলে অভিহিত করা হয়েছে।[৯৮] আত্মা অপরিবর্তনীয় এবং দেশ কালের ঊর্ধ্বে বিধায় কার্য-কারণ নীতির সাথে সম্পৃক্ত নয়। আর এ জন্য আত্মা স্বভাবত মুক্ত। হিন্দু শাস্ত্রে-বেদ উপনিষদ এবং গীতায় আত্মা শব্দটি জীবাত্মা এবং পরমাত্মা উভয় অর্থেই ব্যবহৃহ হয়েছে। এসকল গ্রন্থে আত্মা বলতে কোথাও মানবাত্মাকে নির্দেশ করা হয়েছে আবার কোথাও আত্মাকে পরমাত্মা বা ব্রহ্মের সাথে অভিন্ন বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

ব্রহ্ম অর্থে আত্মা

উপনিষদের প্রধান বিষয় বস্তু হচ্ছে ব্রহ্ম বা আত্মা। উপনিষদের ঋষিদের প্রধান শিক্ষাই হল আত্মা এবং ব্রহ্ম এক। তাই উপনিষদে আত্মা এবং পরমাত্মা (ব্রহ্ম)কে পারস্পারিকভাবে একই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।[৯৯] ঐতরেয় উপনিষদের প্রথমেই বলা হয়েছে সৃষ্টির পূর্বে এই দৃশ্যমান জগতে একমাত্র অদ্বিতীয় আত্মাই বর্তমান ছিল সেই আত্মা চিন্তা করলেন আমি লোক সমূহ সৃষ্টি করবো। অতঃপর তিনি লোকসমূহ সৃজন করলেন।[১০০] আবার বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে যে, জগৎ সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র আত্মাই বর্তমান ছিল। আত্মা চারিদিকে দৃষ্টিপাত করে নিজেকে ছাড়া আর কিছুই দেখলেন না। তাই তিনি প্রথমেই বললেন- আমি আছি।[১০১]

উপনিষদ এবং গীতায় জীবাত্মাকে ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের সাথে অভিন্ন বলেও বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন- ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে, "এই দ্যুলোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, বিশ্বের উপর, সমস্ত কিছুর উপর, সর্বোত্তম লোকে যে জ্যোতি দীপ্ত পাচ্ছে সেই জ্যোতি এবং এই পুরুষের অভ্যন্তরে যে জ্যোতি এই উভয় জ্যোতি একই জ্যোতি।"[১০২] একইভাবে গীতায় বলা হয়েছে, "স্থাবর জংগম এমন কোন কিছুই নেই যা আত্মা বা ব্রহ্ম ব্যতীত সত্তাবান হতে পারে।"[১০৩] জীবের মোহ নিদ্রা যখন ভেঙ্গে যায় তখন সে সর্বব্যাপী পরমেশ্বরকে দেখতে পায়। তখন সে বুঝতে পারে যে, তার হৃদয়ে যে পুরুষ বাস করছে সে পুরুষই ব্রহ্ম।

Dhaka University Institutional Repository

জীবাত্মা অর্থে আত্মা

হিন্দুধর্মে আত্মা শব্দটি জীবাত্মা অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন ঐতরেয় উপনিষদে বর্ণিত হয়েছে যে, জীবের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গঠিত হলো। কিন্তু সমস্ত দেহই অচেতন হয়ে পড়ে থাকল। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহ নিজেদের প্রয়োজনে কিছুই করতে সক্ষম হচ্ছিল না। আত্মানুভূতি ও ভোগের সামর্থ হলো না। আত্মা ভাবল তাহার সাহায্য ব্যতীত কিছুই করতে পারবে না। তাই আত্মা দেহে প্রবেশের সিদ্ধান্ত নিল এবং আত্মা মূর্ধাদেশ দিয়ে মানব দেহে প্রবেশ করল।[১০৪] আত্মা পূর্নাঙ্গ দেহে প্রবেশ করার পর ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি ইত্যাদির সন্নিকটে এলো। ফলে চেতনার উদ্ভব হলো, পরিণামে জীবাত্মা নামে পরিচিত হলো। কাজেই জীবাত্মা দেহ ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি থেকে স্বতন্ত্র। মনীষীগণ জীবের ইন্দ্রিয়সমূহকে দেহ রথের অশ্ব, শব্দাদি ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয় সমূহকে ইন্দ্রিয়ের বিচরণভূমি এবং শরীর ইন্দ্রিয় ও মন যুক্ত আত্মাকে ভক্তা বলে থাকেন।[১০৫] জীবাত্মার ইন্দ্রিয়গুলো মনের দ্বারা চালিত এবং বুদ্ধি আত্মা দ্বারা চালিত। তাই বলা হয়ে থাকে কর্ণাদি ইন্দ্রিয় অপেক্ষা তাদের বিষয়সমূহ শ্রেষ্ঠ, এ সমস্ত বিষয় অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ, মন হতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, জীবের বুদ্ধি হতে সমস্ত জীবের সমষ্টি বুদ্ধিরূপ মহান আত্মা শ্রেষ্ঠ।[১০৬]

হিন্দু মতে, জীবাত্মা পাঁচটি কোষের সমন্বয়ে গঠিত।[১০৭] এগুলো হলো- অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় কোষ। আনন্দময় কোষের বর্ণনায় ঋষিরা বলেছেন- 'প্রিয় ইহার মস্তক, মোদ ইহার দক্ষিণ পক্ষ, প্রমোদ ইহার বাম পক্ষ আনন্দ ইহার মধ্যভাগ, ব্রহ্ম ইহার স্থিতিবিধায়ক পুচ্ছ স্বরূপ।" আনন্দ সমস্ত সুখের আত্মা স্বরূপ। তাই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মই সৃষ্টিতে নানা সুখানুভূতির মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করেছেন। বস্তুত আনন্দ আত্মার স্বরূপ। আনন্দই ব্রহ্ম। আনন্দ থেকেই ভূতবর্গ জাত হয়, জাত হয়ে আনন্দ দ্বারা বর্ধিত হয় এবং অবশেষে আনন্দাভিমুখে প্রতিগমন করে এ আনন্দে বিলীন হয়।

আত্মার পরিণাম

হিন্দু মতে জীবাত্মা, কর্তা এবং ভোক্তা। ইহা তার কর্মফল অনুসারে সুখ-দুঃখ ভোগ করে। যে ব্যক্তি বুদ্ধি বিবেকহীন অর্থাৎ সদসৎ নির্ণয়ে অসমর্থ, যার মন অসংযত এবং ইন্দ্রিয়দমনে অক্ষম, সেই অপবিত্র ব্যক্তি কখনো ব্রহ্ম দশা লাভ করতে পারে না, বরং জন্ম মরণ প্রভাবিত সংসারই তিনি প্রাপ্ত হন। কিন্তু যিনি

Dhaka University Institutional Repository

সদসৎ নির্ণয়ে সমর্থ, যার মন সংযত, অন্তকরণ সর্বদা পবিত্র তিনি পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। তিনি আর সংসার চক্রে ফিরে আসেন না।[১০৮] জীব তার কর্মঅনুসারে পাপ-পুণ্য অর্জন করে এবং সুখ-দুঃখ ভোগ করে। জীব পুণ্যকর্ম দ্বারা পুণ্যবান হয় এবং পাপকর্ম দ্বারা পাপী হয়। তাই বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি যে রূপ কাজ করে এবং যে রূপ আচরণ করে সে ব্যক্তি সে রূপ হয়- শুভকারী সাধু হয়, পাপাচারী পাপী হয়। আবার সে যেমন কামনা করে সেই রকম সংকল্পযুক্ত হয়, যেমন সংকল্পযুক্ত হয় সেই রকম কর্ম করে এবং সে যেমন কর্ম করে তেমনি ফল পায়।[১০৯]

জীবাত্মা দেহ বিনাশের সঙ্গে সঙ্গেই বিনাশপ্রাপ্ত হয় না। বরং স্বীয় জ্ঞান এবং কর্মানুসারে দেহান্তরে গমন করে।[১১০] যারা ইহলোকে শুভ কর্মফল অর্জন করে তারা ব্রাহ্মণযোনিতে বা ক্ষত্রিয়যোনিতে বা বৈশ্যযোনিতে জন্মলাভ করে। আর যাদের ইহলোকে অর্জিত কর্মফল অশুভ তারা কুকুরযোনিতে বা শুকরযোনিতে বা চণ্ডালজনিতে জন্মগ্রহণ করে।[১১১] প্রশ্ন উপনিষদে বলা হয়েছে যে হৃদয়াকাশে বসবাসকারী আত্মার একটি নাড়ী (সুষম্মা) দ্বারা উর্ধ্বগামী হয়ে উদানবায়ু পুণ্য কর্মের ফলে জীবকে পুণ্যলোকে, পাপকর্মের ফলে পাপলোক এবং পাপ-পুণ্য উভয়ই সমান হলে মনুষ্য লোক প্রাপ্ত করায়। বস্তুত জীবাত্মা পরমাত্মার অনুপ্রকাশ। জীব যতক্ষণ আপনাকে সকল জীবের আধার এই বিরাট ব্রহ্ম চক্রে কেবল ঘুরতে থাকে। কিন্তু জীব যখন তার আপন স্বরূপ উপলব্ধি করে পরমেশ্বরের সাথে যুক্ত হয়ে তার দ্বারা অনুগৃহীত হয় তখন সে অনুগ্রহের ফলে এই সংসার চক্র হতে মুক্ত হয়ে অমৃত লাভ করে। তাই মুণ্ডক উপনিষদে বলা হয়েছে যে, জীব যখন জগৎকর্তা পরম পুরুষের স্বরূপ উপলব্দি করে তখন সে জ্ঞানী পুরুষ পাপ-পুণ্যের সমস্ত বন্ধন হতে মুক্তি পান এবং নির্লিপ্ত হয়ে পরম সাম্যপ্রাপ্ত হয়।

উপরোক্ত আলোচনায় ইহা সুস্পষ্ট যে, জীবাত্মার উৎস পরমাত্মা। ইহা পরমাত্মার অংশ তথা প্রকাশ। তবে জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ হলেও এদের মধ্যে পার্থক্য আছে। জীবাত্মা কর্মে লিপ্ত হয়। কিন্তু পরমাত্মা নির্লিপ্ত, অনাসক্ত। জীবাত্মা আশক্তি বশত দেশ কালের বস্তুর মধ্যে স্থায়ী সন্তুষ্টি পেতে চায় । কিন্তু জীবাত্মা তথা মানুষ দেশ কালের বস্তুর মধ্যে ইহা কখনই পেতে পারেনা। কারণ মানুষের অন্তরস্থিত সত্তা তার অতিবর্তী। মানুষের অন্তরাত্মা অমর এবং সর্বত্র বিদ্যমান । কিন্তু মানুষের বর্তমান রূপ হলো একটি সসীম প্রাণী, যা

Dhaka University Institutional Repository

ঈশ্বর থেকে পৃথক। এবং সে পরিবর্তনশীল জীবনের অধিকারী সুতরাং এমন জ্ঞান অনুসন্ধান করা যা তাকে সসীমতার দাসত্ব ও জন্মান্তরের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দিয়ে প্রেমময় ঈশ্বরের সাথে তার মিলন ঘটায়। উপনিষদের ঋষিদের মতে মরমী জ্ঞান তথা প্রেমের মাধ্যমে মানুষ এ লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে। মরমী জ্ঞানের মাধ্যমে জীবাত্মা যখন তার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে, যখন সে বুঝতে পারে আমিই 'তিনি' তখন সে অমৃত লাভ করে। তাই উপনিষদে বলা হয়েছে- শুদ্ধ জলে শুদ্ধ জল প্রক্ষিপ্ত হলে উহা শুদ্ধ জলই থাকে। জ্ঞানবান মননশীল ব্যক্তির আত্মাও ঐ প্রকার হয় অর্থাৎ ব্রহ্মের সাথে যুক্ত হয়ে ব্রহ্মভাবই প্রাপ্ত হয়।

৪. মরণোত্তর জীবন

মানুষ সাধারণ অভিজ্ঞতায় যেমন বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণেও তেমনি অত্যন্ত জটিল সংগঠন ও প্রক্রিয়া বলে প্রতীয়মান হয়। মানুষের জীবনে রয়েছে বৈচিত্র্য ও বৈপরীত্য। অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে বৈচিত্র্য থাকলেও এতটা নেই। হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, উত্থান-পতনের মধ্যে কেটে যায় মানুষের জীবন। সে নিজেকে রক্ষা করতে পারেনা। তার অজান্তে অনির্দিষ্ট ক্ষণে, নিতান্তই অপ্রস্তুত অবস্থায় তাকে এ প্রার্থিব জগৎ ত্যাগ করতে হয়। তার সকল আশা-আকাঙ্খা, স্বপ্ন-পরিকল্পনা, নিমিশেই নিশ্চিহ্ন করে দেয় মৃত্যু। কিন্তু এর কোন প্রতিকার বিজ্ঞান অদ্যাবধি আবিষ্কার করতে পারেনি। হয়তো কোনদিন পারবেও না। তবে আদিমকাল থেকে শুরু করে বর্তমান কালের সব কয়টি ধর্ম প্রয়াসী হয়েছে মরণোত্তর জীবনের রহস্য উদঘাটনের জন্য। মানুষ যাতে মৃত্যুর পরবর্তী জীবন আনন্দে অতিবাহিত করতে পারে, স্বর্গসুখ ভোগ করতে পারে এজন্য ধর্ম মানুষের প্রার্থিব জীবনকে নিয়ন্ত্রিত, শৃঙ্খলিত করার জন্য সদাসচেষ্ট। তবে স্বর্গসুখ লাভ মরমীদের জীবনের লক্ষ্য নয়, তাদের লক্ষ্য মৃত্যুর মাধ্যমে প্রেমাস্পদের সাথে মিলিত হওয়া।

৪.১ ইসলামে মরণোত্তর জীবন

ইসলাম অনুসারে মৃত্যুর পরবর্তী জীবন বা মরণোত্তর জীবন স্থায়ী ও অনন্ত। এই ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবন হলো মরণোত্তর জীবনের শস্য ক্ষেত্র স্বরূপ। ইহজীবনে যে যেরূপ কর্ম করবে মরণোত্তর জীবনে সে সেরূপ ফলভোগ করবে। পার্থিব জীবনে পাপকর্ম করলে রূহ মরণোত্তর জীবনে স্বতঃই অশান্তি ভোগ করবে। পক্ষান্তরে সৎ বা পুণ্যকর্ম করলে রূহ স্বতঃই শান্তি বা আনন্দ

Dhaka University Institutional Repository

অনুভব করবে। অর্থাৎ রূহকে যে যেভাবে গড়বে সে সেভাবে জান্নাত বা জাহান্নামে শান্তি বা শাস্তি ভোগ করবে। তাই ইসলাম মতে মানব জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে দোযখের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ এবং বেহেশতের চিরশান্তি লাভ করা। তবে সূফীদের মতে, মানব জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহর দিদার লাভ করা। মরণোত্তর জীবনে আল্লাহর সান্নিধ্য ও মিলন লাভের সাধনার মধ্যেই পার্থিব জীবনের সার্থকতা।

ইসলামী মতে মৃত্যু জীবনের একটি স্তর, যেমন- শৈশব, কৈশোর, বার্ধক্য জীবনের এক একটি স্তর। দেহের অভ্যন্তরে যে অবিরত হৃদ -কম্প চলছে তা মুহূর্তের জন্য বন্ধ হয়ে গেলে মানুষ বস্তু জগৎ ত্যাগ করে বরযখ (কবর) জগতে চলে আসতে বাধ্য হয়। রাসূলুল্লাহ্ (স.) এই বরযখের জগতের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা হচ্ছে এরূপ: কোন মুমিন (পূন্যবান) বান্দা যখন এই দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে আখেরাতের জগতে পা বাড়াতে যায়, তখন আসমান থেকে একদল ফেরেশ্তা অবতীর্ণ হয়। তাদের চেহারা সূর্যের মত আলোক উদ্ভাসিত। তাদের সাথে থাকে বেহেশ্তের একটি কাফন এবং সুগন্ধি। তারা এসে তার এত কাছে বসে যে, সে স্বচক্ষে তা দেখতে পায়। অতঃপর মৃত্যুদূত এসে তার শিয়রে বসে বলে:

হে পাক রূহ! চল আল্লাহ্র ক্ষমা এবং সন্তুষ্টির দিকে। অতঃপর রূহ বেরিয়ে আসে এবং তা কলসের পানির মত গড়িয়ে পড়ে। মৃত্যুদূত তা সাথে সাথে হাতে তুলে নেয়। এসময়ে অপর এক ফেরেশ্তা সামনে এগিয়ে আসে। সে মুহূর্তের মধ্যে মৃত্যুদূতের হাত থেকে নিজের হাতে নিয়ে নেয় এবং তা কাফনের মধ্যে রেখে তাতে সুগন্ধি মেখে দেয়। এই সুগন্ধি দুনিয়ার সমস্ত সুগন্ধি থেকে উত্তম। রাসূল (স.) আরো বলেন- অতঃপর এই ফেরেশ্তা রূহ নিয়ে সপ্ত আসমানে পৌছে দেয়। তখন আল্লাহ্তায়লা বলেন- আমার এই বান্দার ঠিকানা ইল্লীনে লিখে দাও এবং তাকে তার পৃথিবীর দেহে পৌঁছে দাও। অতঃপর দু'জন ফেরেশ্তা এসে কবরের মধ্যে তাকে বসিয়ে জিজ্ঞেস করে, তোমার রব কে? সে বলে আল্লাহ্ আমার রব। তারা উভয়ে বলে তোমার দ্বীন কি? সে বলে ইসলাম আমার দ্বীন। তারা উভয়ই আবার জিজ্ঞেস করে তোমাদের কাছে যে ব্যক্তি পাঠানো হয়েছে তিনি কে? সে বলে, তিনি আল্লাহ্র রাসূল। তারা বলে তুমি তা কিভাবে জানতে পারলে? সে বলে, আমি আল্লাহ্র কিতাব পড়েছি, তার উপর ঈমান এনেছি এবং তার মধ্যে যা কিছু ছিল তা সত্য বলে মেনে নিয়েছি। এসময়ে আসমান থেকে শব্দ আসে আমার বান্দা

Dhaka University Institutional Repository

সত্য বলেছে। তার জন্য বেহেশ্‌তের বিছানা পেতে দাও। এবং বেহেশ্‌তের একটি জানালা খুলে দাও। রাসূল (স.) বলেন- তার কাছে বেহেশ্‌তের বায়ু এবং সুগন্ধি আসতে থাকে। তার কবরকে দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেওয়া হয়। অতঃপর তার কাছে উত্তম পোষাকে সজ্জিত হয়ে এবং সুগন্ধি মেখে এক সুদর্শন ব্যক্তি উপস্থিত হয়। সে বলে, তোমাকে সাফল্যের সুসংবাদ। এই সেই দিন যার ওয়াদা তোমার কাছে করা হয়েছে। সে জিজ্ঞেস করে তুমি কে? তোমার গোটা দেহইতো দেখছি নূরের তৈরী? সে বলে, আমি তোমার নেক কাজসমূহ। তখন সে বলে, হে প্রভূ কিয়ামত কায়েম কর তাহলে আমি আমার পরিবার-পরিজন ও সম্পদের সাথে মিলিত হতে পারব।

অন্যদিকে কাফের ব্যক্তির মৃত্যুর সময় উহার সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটনা ঘটে। যেমন- তার মৃত্যুর সময় কুৎসিত ও ভয়ংকর চেহারার অধিকারী দুই ফেরেশ্‌তা হাতে চট নিয়ে হাজির হয়। তারা উভয়ে তার এতটা দূরত্বে বসে যে সে তাদের দেখতে পায়। অতঃপর মৃত্যুর ফেরেশতা এসে তার শিয়রে এসে বলে, হে কলুষিত আত্মা! চল তোমার গযব এবং শাস্তির দিকে। অতঃপর সে তার দেহের অভ্যন্তরে ঢুকে যায় এবং জোরপূর্বক তার রূহ বের করে নেয়, যেভাবে উল থেকে গরম লৌহ সলাকা টেনে বের করা হয়। সে তার রূহ নিজের হাতে নেয়। অতঃপর আরেক ফেরেশ্‌তা এই রূহ নিজের হাতে নিয়ে পেচিয়ে নেয়। এই রূহ থেকে দুনিয়ার নিকৃষ্টতম দুর্গন্ধের চেয়েও তীব্র দুর্গন্ধ নির্গত হতে থাকে। সে তা নিয়ে উর্ধ্ব জগতে আরোহণ করে। এ সময়ে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, এর ঠিকানা সিজ্জীনে (জমিনের সর্বনিম্ন স্তরে) লিখে দাও। অতঃপর তার রূহ নিকৃষ্টভাবে ছুঁড়ে মারা হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক করে সে যেন আসমান থেকে পড়ে গেল। অতঃপর হয় তাকে পাখি ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে অথবা বাতাস তাকে এমনভাবে নিক্ষেপ করবে যে তা বিন্দু বিন্দু হয়ে উড়ে যাবে।'[১১২] অতঃপর রূহ তার দেহে ফিরিয়ে দেয়া হবে। সে কবরে ফেরেশ্‌তাদের প্রশ্নের উত্তরদানে ব্যর্থ হবে। অতঃপর তার উপর একটি অন্ধ, বধির ও বোবা ফেরেশ্‌তা নিযুক্ত করে দেয়া হবে। তার হাতে দেয়া হবে লৌহের একটি ডাণ্ডা তা দিয়ে কোন পাহাড়ের উপর আঘাত করা হলে তা গুড়া গুড়া হয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতো। এটা দিয়ে যখন সে আঘাত করে তখন মৃত্যু ব্যক্তি খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যায়। আল্লাহ্‌তায়ালা তাকে আবার পূর্বের ন্যায় দেহ বিশিষ্ট্য করে দেন। অতঃপর তার জন্য দোযখের একটি দরজা খুলে দেয়া হয় এবং দোযখের বিছানা পেতে দেয়া হয়। এভাবে পাপিদের শাস্তি কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য পুনরুত্থান দিবস ও বেহেশ্‌ত বা দোযখে গমনের পূর্বে রূহ কোথায় অবস্থান করে এ নিয়ে ধর্মতাত্ত্বিক ও দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে অধিকাংশ আলেমগণ মনে করেন মুমিনদের রূহ পৃথিবীর সপ্তম আকাশের উপরে ইল্লিয়্যীনে এবং কাফিরদের রূহ পৃথিবীর সপ্তম স্তরের নিচে সিজ্জীনে অবস্থান করে। এর সুস্পষ্ট প্রমাণ পবিত্র কুরআনে। কুরআনে বলা হয়েছেঃ পাপাচারীদের আমলনামা অবশ্যই রয়েছে সিজ্জীনে। আপনি জানেন কি? সিজ্জীন কি? তা এক মোহরযুক্ত কিতাব (লিপিবদ্ধ খাতা) আর অবশ্যই নেককারদের আমলনামা থাকবে ইল্লিয়্যীনে। আপনি জানেন কি? ইল্লিয়্যীন কি? তা চিহ্নিত মোহরযুক্ত কিতাব। যা আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতারা দেখে থাকে।[১১৩] সিজ্জীন একটি সংকীর্ণ স্থানের নাম। এখানে কাফেরদের রূহ অবস্থান করে এবং এখানেই তাদের আমলনামা থাকে। অনুরূপভাবে ইল্লিয়্যীনও একটি স্থানের নাম। এখানে মুমিনদের রূহ ও আমল নামা থাকে। মূলত রূহের মর্যাদা অনুযায়ী আলমে বারযখে তাদের অবস্থান ভিন্ন ভিন্ন হবে। নবী রাসূলদের অবস্থান, সিদ্দিকদের অবস্থান, শহীদদের অবস্থান এবং মুমিনদের অবস্থান হবে ভিন্ন ভিন্ন। একইভাবে পাপের তারতম্য অনুসারে কাফিরদের রূহের স্থানও ভিন্ন ভিন্ন হবে। তবে পুনরুত্থানের পূর্ব পর্যন্ত রূহের অবস্থানের জন্য দেহ ধারণের কোন অপরিহার্যতা নেই। রূহ কখনো কখনো কবরে আসে অথবা ইল্লিয়্যীন ও সিজ্জীন থেকে কবরের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখে।

পুনরুত্থান

ইসলামের অন্যতম বিশ্বাস হলো মৃত্যুর পর পুনরুত্থান। ইসলাম মতে সম্পূর্ণ
জগৎ যখন পাপাচারে
সিঙ্গায় ফুৎকার দিয়ে ই
আদেশে আরেকটি ফুৎ
যাবে। এবং হাশরের
মানবকুলের বিচার কা
হচ্ছে পাপ পুণ্যের বিচা
নির্দেশিত মত ও পথ।
করছে মরণোত্তর জীবে
অফুরন্ত নেয়ামত তথা
বলেছেন: যে সব লো
নিয়ামতে পরিপূর্ণ জা

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ্‌র ওয়াদা, তিনি মহাশক্তিশালী ও সুবিজ্ঞ।[১১৬] অন্যদিকে যারা আল্লাহ্ ও তার রাসূলদের নির্দেশিত মত ও পথ অনুসরণ করতে ব্যর্থ হবে মরণোত্তর জীবনে তারা অনন্ত পীড়াদায়ক শাস্তিতে নিপতিত হবে; তাদের জন্য রয়েছে সার্বক্ষণিক নিষ্ঠুর, নির্মম, কষ্ট ভোগের আবাস স্থল- জাহান্নাম। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন: যে সব লোক পাপ কাজ করছে তারা কি মনে করে নিয়েছে যে, আমরা তাদের ও ঈমানদার লোকদের একই সমান করে দেব এবং তাদের জীবন ও মৃত্যু একই রকম হবে? তারা যে ফয়সালা করেছে তা অত্যন্ত খারাপ।[১১৭] কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, ইসলাম মতে পুনরুত্থানের পর পার্থিব কর্মানুসারে বিচারের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হবে কে জান্নাতবাসী হবে আর কে জাহান্নামবাসী হবে।

উল্লেখ্য যে, সূফীদের মতে মানব জীবনের মূল লক্ষ্য জান্নাত বা বেহেশ্‌ত কিংবা দোযখ নয়; বরং আল্লাহ্‌র সাথে মিলন লাভ করা। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য তারা কঠোর সাধনায় ব্রতী হন। কঠোর সাধনার দ্বারা আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সূফী সাধকগণ আল্লাহ্‌র মারিফাত অর্জন করে তার সাথে মিলনের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েন। কিন্তু মৃত্যু এই মিলনের জন্য প্রতিবন্ধকতা স্বরূপ। তাই আল্লাহ্‌র প্রেমিকগণ সাধনার চূড়ান্ত স্তরে যখন উন্নীত হন তখন তারা আল্লাহ্‌র সাথে মিলন লাভের জন্য মৃত্যুকে কামনা করেন। এরূপ সাধকগণ মরণোত্তর জীবনে জান্নাত লাভের চেয়ে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে থাকাকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভে বা আল্লাহ্‌র সাথে মিলনের ফলে ব্যক্তি সত্তার অস্তিত্ব লোপ পায় কিনা? ইসলামী মতে আত্মা অমর। কাজেই পরম সত্তার সাথে মিলনে ব্যক্তি সত্তার অস্তিত্ব ধ্বংস হয়না, বরং ব্যক্তি সকল ক্ষুদ্রতা ও সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে আল্লাহ্‌র গুণে গুণান্বিত হয়ে শাশ্বত আনন্দের অধিকারী হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইকবাল বলেন, " ইসলামী সূফীবাদের উচ্চ স্তরে এই একাত্মমূলক অনুভূতি সসীম খুদী নয়, এ খুদী কোনরূপ শোষণ প্রক্রিয়া মারিফাত অসীম খুদীর মাঝে আপানাকে হারিয়ে ফেলে না; বরং এ হলো সসীমের প্রেমালিঙ্গনে অসীমের ধরা দেওয়া।[১১৮] কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, সূফীদের মতে মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে প্রেমিক আত্মা তার প্রেমাস্পদের সাথে মিলিত হলেও তার ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য অক্ষুন্ন থাকে।

৪.২ হিন্দু ধর্মে মরণোত্তর জীবন

অন্যান্য সিমেটিক ধর্মের মত হিন্দুধর্মও বিশ্বাস করে যে, মৃত্যুই জীবনের পরিসমাপ্তি নয়। বরং জীবন প্রতিক্রিয়ার একটি স্তর। দেহ এবং আত্মা

Dhaka University Institutional Repository

নিয়েই মানব জীবন। মৃত্যুতে দেহের বিনাশ ঘটে কিন্তু আত্মা বিদ্যমান থাকে। কিন্তু মৃত্যুর পর মানুষের বিদেহী আত্মার পরিণতিই বা কি? এসব প্রশ্নের যে উত্তর হিন্দুধর্ম দেয় তা বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের সাথে সাদৃশ্য পূর্ণ হলেও সিমেটিক ধর্ম থেকে পৃথক। হিন্দু ধর্ম অনুসারে দেহাবসানের পর আত্মা তার অতীত জীবনের কর্মানুসারে নতুন দেহ ধারণ করে। অর্থাৎ মৃত্যুতে মানুষের স্থূল দেহের বিনাট ঘটে কিন্তু সূক্ষ্ম শরীর বিদ্যমান থাকে। এই সূক্ষ্ম ছাঁচে নতুন শরীর গঠন করে তাতে আশ্রিত হয়। এবং সে দেহে সূক্ষ্ম শরীর পূর্ব জন্মের কৃত কর্মের ফলভোগ করে। তাই উপনিষদে বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি যে কামনাকে মনে স্থান দিয়ে পূরণ করতে চায় সে নিজের কামনা অনুসারে পুনরায় জন্ম গ্রহণকরে।[১১৭]

হিন্দুধর্মের এ পুনর্জন্মের ধারণা কর্মের ধারণার সাথে অপরিহার্যভাবে সম্পর্কিত কর্মবাদ অনুসারে মানুষ যে কর্মই করুকনা কেন তাকে তার ফলভোগ করতে হবে। বর্তমান জীবনে কর্মের ফলভোগ না হলে তবে তাকে অবশ্যই মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে সে ফলভোগ করতে হবে। কাজেই পুনর্জন্ম হলো কোন ব্যক্তি তার পূর্ববর্তী জবনে যে কর্ম করেছে তার অপরিহার্য ফল, যা সে আগে ভোগ করতে যথার্থ হয়নি। যে পর্যন্ত কোন ব্যক্তি তার কর্মের ফলভোগ শেষ না করবে, সে পর্যন্ত তাকে বার বার ধরাধামে জন্মগ্রহণ করতে হবে। কিন্তু মানুষ যখন নিষ্কাম কর্ম সম্পাদান করে অন্যকথায় তার হৃদয়ের কামনাসমূহ দূরীভূত হয় তখন সে অমৃত্ব লাভ করে। এবং ইহ জীবনেই ব্রহ্মকে লাভ করতে সমর্থ হয়।

আর ব্রহ্মকে লাভ করাই মানব জীবনের চরম লক্ষ্য। আত্মার পুনর্জন্মের এ মতবাদ হিন্দু নীতিতত্ত্বের কেন্দ্রীয় বিষয়। তবে বেদে পুনর্জন্মের কোন ধারণা পাওয়া যায় না। বেদমতে মৃত্যুর পর আত্মা পার্থিব জীবনের কর্মানুসারে স্বর্গে অথবা নরকে গমন করে। অন্যদিকে উপনিষদ ও গীতায় মৃত্যুর পর আত্মা জ্ঞান ও কর্মানুসারে দেবযান কিংবা পিতৃযোগ, স্বর্গ কিংবা নরকে গমন করে বলে উল্লেখ আছে। কাজেই মৃত্যুর পর আত্মার পরিণতি সম্পর্কে হিন্দুধর্মে তিনটি মতের সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন:

১. মৃত্যুর পর আত্মা দেবযানে অথবা পিতৃযানে গমন করে। অর্থাৎ ব্রহ্মবিদরা (জ্ঞানীরা) দেবযান পথে ব্রহ্মলোকে যান, আর কর্মী পুরুষ পিতৃযান হতে পিতৃলোকে অতঃপর মোক্ষ লাভে সমর্থ আত্মা ব্যতীত সকল আত্মা মর্তে এসে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে।

Dhaka University Institutional Repository

২. মৃত্যুর পর আত্মা যমপুরীতে গমন করে। সেখানে যমের সিদ্ধান্ত ক্রমে পুণ্যাত্মা ক্ষণস্থায়ী স্বর্গ ও পাপাত্মা ক্ষণস্থায়ী নরক ভোগ শেষে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে।

৩. মোক্ষপ্রাপ্ত ব্যক্তির মৃত্যুর পর আত্মা ব্রহ্মার সত্তায় বিলীন হয়ে যায়। আর মোক্ষ লাভে ব্যর্থ ব্যক্তিদের মৃত্যুর পর তাদের আত্মা পুর্জন্ম গ্রহণ করে বিভিন্ন প্রাণীরূপে জীবন যাপন করে।

প্রথমোক্ত মতানুসারে "যারা পঞ্চাগ্নিবিদ্যা জানেন এবং যারা অরণ্যে শ্রদ্ধা তপস্যার উপাসনা করেন তারা (মৃত্যুর পর) অর্চিতে গমন করেন। অর্চি হতে দিনে, দিন হতে শুক্লপক্ষে, শুক্লপক্ষ হতে উত্তরায়নের ছয় মাসে গমন করেন। মাস সমূহ হতে সংবৎসরে, সংবৎসর হবে আদিত্যে, আদিত্য হতে চন্দ্রে, চন্দ্র হতে বিদ্যুতে গমন করেন। সেই স্থানে এক অমানব পুরুষ তাদেরকে ব্রহ্মালাভ করায়। এটাই দেবযানের পথ।"[১১৮] এই শ্রেষ্ঠ অবস্থা লাভ করে তাঁরা সেই ব্রহ্মালোকে চিরকাল বাস করেন: তাদের আর সংসারে ফিরতে হয় না।[১১৯] কিন্তু গীতার ৮/১৬ শ্লকে বলা হয়েছে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সমস্ত লোক হতেই লোক সকল ফিরে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু আত্মাকে পেলে আর পুনর্জন্ম হয় না। কাজেই এখানে উপনিষদ এবং গীতার বিরোধ সুস্পষ্ট। কোন কোন হিন্দু শাস্ত্রজ্ঞ এ বিরোধকে মীমাংসার চেষ্টা করেছেন এ ভাবে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত সাধকগণ ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল পর্যন্ত ব্রহ্মলোকে বাস করেন। ব্রহ্মলোক যখন বিনষ্ট হয় তখন তাঁদের পুনর্জন্ম অবশ্যম্ভাবী: কিন্তু ব্রহ্মলোকে অবস্থানকালে যদি তাঁদের সম্যক জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তবে তারা পরব্রহ্মই লীন হন। অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করেন। একে ক্রমমুক্তি বা বিদেহযুক্তি বলে। "আর যারা গ্রামে ইষ্টাপূর্ত দান ইত্যাদি অনুষ্ঠান করে, তারা মৃত্যুর পর ধূমে গমন করে। ধূম হতে রাত্রিতে, রত্রি হতে কৃষ্ণপক্ষে, কৃষ্ণপক্ষ হতে দক্ষিণায়নের ছয়মাসে গমন করে। এ মাস সমূহ হতে পিতৃলোকে, পিতৃলোক হতে আকাশে, আকাশ হতে চন্দ্রলোকে গমন করে।... যে পর্যন্ত কর্মক্ষয় না হয়। সে পর্যন্ত চন্দ্র মন্ডলে বাস করে যে পথে গিয়েছিল, সে পথেই ফিরে আসে। .....এবং প্রাণীরূপে আবার জন্ম গ্রহণ করে।"[১২০] অন্যদিকে যারা এই উভয় পথ (দেবযানও পিতৃযান) এর কোনটিতে যায়না তারা কীট পতঙ্গ ও দংশ-মশকাদিরূপে জন্মায়।[১২১] ইহাকে তৃতীয় যান বলে।

দ্বিতীয় মত অনুসারে, আত্মা বা প্রেত মৃত্যুরপর অল্প কিছুদিন এ ধরায় অবস্থান অবস্থান করে। এ আত্মাকে স্বর্গীয় পোশাক সরবরাহ করা হয়। এ পোশাক পরে প্রেত যমপুরীতে গমন করে। সেখানে মৃত আত্মাদের চিন্তা, অভীপ্সা, ইচ্ছা

Dhaka University Institutional Repository

এ ভাল-মন্দ কর্মের ভিত্তিতে এ বিচার কার্য সম্পন্ন হয়ে থাকে। এরপর ভাল ক্রিয়ার কর্তাকে স্বর্গে এবং মন্দ ক্রিয়ার কর্তাকে নরকে প্রেরণ করা হয়।[১২৩] স্বর্গে পুণ্যক্ষয় এবং নরকে শাস্তি ভোগের পর পুনরায় এ আত্মারা মানব বা বিভিন্ন প্রাণীরূপে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে।[১২৪] ঋণবেদে স্বর্গকে একটি আনন্দ উপভোগ ও ইন্দ্রিয়ের পূর্ণ তৃপ্তির স্থান বলে অভিহিত করা হয়েছে। ইহা হলো একটি জ্যোতির্ময় স্থান, সেখানে প্রকাণ্ড স্রোতস্বিনী প্রবাহমান। পুন্যাত্মাগণ সেখানে ইচ্ছানুসারে বিচরণ করতে পারেন, সেখানে সকল কামনা নিঃশেষে পূর্ণ হয়, সেখানে রয়েছে তৃপ্তি বিধায়ক যথেষ্ট আহার আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থ; সেখানে অভিলাশী ব্যক্তির সকল কামনা অভিলাস মাত্র পূর্ণ হয়।[১২৫] সেখানে থাকবে সকল কিছুর প্রাচুর্যতা, সেখানে না থাকবে অসুস্থতা, না থাকবে বৃদ্ধাবস্থা ও বিকলাঙ্গতা। প্রত্যেকে সেখানে চিরযৌবন অবস্থায় সম্পূর্ণ সুখ ও শান্তিতে থাকবে। সেখানে সৎকর্মশীল পূর্বপুরুগণ দেবতুল্য পদ লাভ করেন।[১২৫] তবে বেদে নরকের দুঃখের বর্ণনা খুই কম। ঋগবেদে বলা হয়েছে যারা সৎকর্ম অনুষ্ঠানে অপারগ হয়, তারা অধোগামী হয়।[১২৬] মৃত্যুর পর তাদের আত্মার স্থান হয় নরক বা অন্ধাকার পাতালে। সেখানে থেকে তারা আর ফিরে আসতে পারে না।

তৃতীয় মত অনুসারে জীব এ অবস্থায় যারা ব্রহ্ম লাভ করতে সক্ষম হয় তারা মৃত্যুর পর ব্রহ্মের সাথে লীন হয়। ব্রহ্মার ভক্তগণ ব্রহ্মে লীন হয়। শুদ্ধ অদ্বৈত বাদীগণ বলেন যারা নির্গুণ ব্রহ্মোপাসক এবং যাদের আত্মজ্ঞান লাভ হয়েছে (তারা ব্রহ্মালোকে না নিয়েই জীবিত অবস্থায় ব্রহ্মকে লাভ করেন।) অর্থাৎ যে পুরুষ অকাম, নিষ্কাম, আপ্তকাম, আত্মকাম তাঁর পান উৎক্রমন করে না; তিনি ব্রহ্ম হয়ে ব্রহ্মকেই পান।[১২৭] এ জন্য তাঁকে মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় না, এই সংসারই তিনি ব্রহ্মকে লাভ করেন। আর একে বলা হয় জীবমুক্তি। জীব মুক্তির পর এ আত্মা পার্থিব দেহে বিদ্যমান থাকতে পারে। তবে জগতের প্রতি তাঁর কোন আসক্তি থাকে না। তিনি তখন জগতের সুখ দুঃখের অতীত হন। এ অবস্থায় মৃত্যু হলে ব্যক্তির স্থুল দেহের সাথে সূক্ষ্মশরীর ও বিনষ্ট হয়। একে আত্মার বিদেহ মুক্তি বলে। এখানে উল্লেখ্য যে, জীবমুক্তি ঘটেনি এ অবস্থায় মৃত্যু হওয়ার পর যে সব আত্মা ব্রহ্মলোকে অদ্বৈত জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয় তাদের এ বিদেহ মুক্তি ঘটে এবং তাদের পুনর্জন্মগ্রহণ করতে হয় না। তবে কোন কোন পণ্ডিত এ ধরণের বিদেহ মুক্তিকে কাল্পনিক বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাদের মতে জীবমুক্তির পর মৃত্যু হলে কেবল বিদেহ মুক্তি ঘটে। যাই হোক এটা অনস্বীকার্য যে বিদেহ মুক্তির পর আত্মার আর পুনর্জন্ম গ্রহণ

Dhaka University Institutional Repository

করতে হয় না। এ অবস্থায় আত্মা ব্রহ্মের সাথে মিলিত হয়। অর্থাৎ তার উৎসের নিকট প্রত্যাবর্তন করে। যেমন প্রবাহমান নদী সকল নিজ নিজ বিশিষ্ট নাম ও রূপ পরিত্যাগ করে সমুদ্রে অদৃশ্য হয়ে পরস্পর (সর্বশ্রেষ্ঠ) স্বপ্রকাশ ব্রহ্মাকে প্রাপ্ত হন। [১২৮] ব্রহ্মার সাথে মিলিত হয়ে আত্মা শাশ্বত সুখ ও পরম আনন্দ ভোগ করে। এ সুখ স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয়। এসুখ ও আনন্দ থেকে আত্মার কখনো বিচ্যুতি ঘটেনা।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি হিন্দু মতে স্বর্গ বা নরক ভোগ জীবনের পরম গতি নয়। যা হতে জীবের উদ্ভব, সেই পরব্রহ্মা লীন হওয়া বা ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়াই জীবনের পরম লক্ষ্য ও চরমগতি। যে পর্যন্ত জীব তার উপযোগী না হয়, সে পর্যন্ত তাকে কৃতকর্মানুসারে পুনঃপুন দেহ ধারণ করে কর্মফল ভোগ করতে হয়। অবশ্য হিন্দু শাস্ত্রে জীবের কৃতকর্মানুসারে স্বর্গাদি ভোগের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু তাহা অনন্ত কালেন জন্য নয়। যে কর্ম বিশেষের ফলে স্বর্গ-নরক লাভ হয়, সেই কর্মের ফলভোগ শেষ হলেই তাকে আবার জন্ম গ্রহণ করতে হয়। ব্রহ্ম প্রাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত জন্ম কর্মের নিবৃত্তি নাই। তবে ব্রহ্মের উপযোগী হওয়ার জন্য জীবের প্রয়োজন তাঁর প্রতি একনিষ্ঠ প্রেমভক্তি, কেননা তাঁর প্রেমিক ভক্ত তাঁর প্রেমলাভ করেএমতাঁকে প্রাপ্ত হয়ে তাঁতেই লীন হয়।

তথ্যনির্দেশ

১. ড. গোবিন্দচন্দ্র দেব, *গোবিন্দচন্দ্র দেব রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, (সম্পাদনা), হাসান আজিজুল হক, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৯, পৃ. ৩০৫

২. সাইয়েদ আবদুল হাই, *দর্শন এ মনোবিদ্যা পরিভাষা কোষ*, দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৬, পৃ. ৮৪৫-৪৬

৩.William James, *A Pluralistic Universe*, pp. 34,79,321

৪.Bradley F.H , *Appearance and Reality*, Clarendon Press, 1920, p.395

৫. *স্পিনোজার নীতিবিদ্যা*, অনুঃ, মহিউদ্দীন, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯০, পৃ.৯

৬. ঐ, পৃ. ১৪

৭. Vide, D.M. Datta, *Chief Currentrs of Contemporary Philosophy*, (7th ed) Calcutta, 1968, p

Dhaka University Institutional Repository

৮. Maulana Mohammad Ali, *The Religion of Islam, New Delhi,* S. Chand and co., 1950. pp. 44, 145

৯. আল কুরআন, সূরা-১১২

১০. ঐ, ৩:৫

১১. ঐ, ২:১১৫

১২. ঐ, ৫০: ১৬

১৩. ঐ, ৯:৪০

১৪. মোঃ সোলায়মান আলী সরকার, *ইবনুল আরাবী ও জালাল উদ্দীন রুমী,* ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪, পৃ. ৩৫৫ থেকে উদ্ধৃত।

১৫. *ঋগবেদ সংহিদা,* ১/৬৩/১; ১/১৭৪/১; ৬/৬৮/৯

১৬ Chatterjee S.C., *The Fandamental of Hinduism,* Calcutta. University of calcutta, 1920, p.15

১৭. Vide, Hammer Raymond , *Conceept of Hinduism,* The Worlds Religions, R.Pierce, Beaver & other(eds), England, 1989, p. 185

১৮ Radhakrisnan S., *Indian Philosophy,* (10^{th} ed) vol. I, London: George Allen and unuin, 1977, p. 91

১৯. *ছান্দোগ্য উপনিষদ,* ৩/১৪/১; ৬/৮/৪৭

২০. *ঋগবেদ,* ১/২২/১৭, অনুঃ, রমেশচন্দ্র দত্ত, কলিকাতা, ইউনাইটেড পাবলিশার্স, ১৯৭৬

২১. *গীতা,* ১৩/১৩

২২. *তৈত্তিরীয় উপনিষদ,* ২/৬/৩; *ছান্দোগ্য উপনিষদ,* ৬/২/৩

২৩. *বৃহদারণ্যক উপনিষদ,* ২/১/২০

২৪. *মুণ্ডক উপনিষদ,* ২/১/১

২৫. ঐ, ১/৩

২৬. *ছান্দোগ্য উপনিষদ,* ৩/১৪/১, ৭/২৫/২

২৭. Spencer, Sidrey , *Mysticism in World Religion,* USA, A.S. Barnes & co., 1966. p.21

২৮. *বৃহদারণ্যক উপনিষদ,* ৪/৪/৯

২৯. ঐ, ৪/৪/২৫,

৩০. *কঠ উপনিষদ,* ২/২/১১

Dhaka University Institutional Repository

৩১. *তৈত্তিরীয় উপনিষদ*, ২/৬/৯

৩২. *ছান্দোগ্য উপনিষদ*, ৬/১/৪

৩৩. *কঠ উপনিষদ*, ২/২/২

৩৪. *বৃহদারণ্যক উপনিষদ*, ৩/৮/৯

৩৫. ঐ, ২/৭/১৫

৩৬. ঐ, ১/৪/৩

৩৭. *গীতা*, ১০/৪২

৩৮. *তৈত্তিরীয় উপনিষদ*, ২/৬/৩

৩৯. *ঈশ উপনিষদ*, ৫, *কঠ উপনিষদ*, ২/২/৯

৪০. *ঋগবেদ সংহিতা*, ১০/৯০

৪১. *ছান্দোগ্য উপনিষদ*, ৩/১২/৬; *গীতা*, ১০/৪২

৪২. *প্রশ্ন*, ৫/২

৪৩. *বৃহদারণ্যক উপরিষদ*, ২/৩/১

৪৪. *তৈত্তিরীয় উপনিষদ*, ২/১/১

৪৫. *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ*, ৬/১৮

৪৬. ঐ, ৩/৪

৪৭. *গীতা*, ১৫/৭

৪৮. *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ*, ৪/১১

৪৯. তন্ময় কুমার সরকার, *হিন্দুধর্ম ও দর্শনে ঈশ্বরের স্বরূপ*, (এম. ফিল. থিসিস) দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ.৭৮

৫০. গুরুনাথ সেন গুপ্ত, *তত্ত্বজ্ঞান উপাসনা*, ৩য় মদ্রণ, সত্যধর্ম মহামণ্ডল বাংলাদেশ, ১৩৯৫বাংলাম পৃ. ১৬৪

৫১. *আল কুরআন*, ৫৭:৩ অনুঃ, মুহাম্মদ শফী, বঙ্গানুবাদ, মহিউদ্দীন খান, সৌদীআরব বাদশাহ ফাহাদ মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হিযরী।

৫২. *আল কুরআন*, ২:১১৭; দ্রষ্টব্য, ৬:৭৩, ১৬:৪০, ৩৬:৮২

৫৩. ঐ ২৫:৫৯

৫৪. ঐ. ৪১:১২

৫৫. দ্রষ্টব্য, আবদুর রহমান, 'কুরআন ও জীবন দর্শন' ১ম খণ্ড, চট্টগ্রাম, ২০০৩, পৃ. ৩৪৪

৫৬. *আল কুরআন*, ২৩/১২

Dhaka University Institutional Repository

৫৭. ঐ, ২৪:৪৫

৫৮. ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী, *দাকায়েকুল হাকায়েক*, অনুঃ, মোহাম্মদ আব্দুস সোবহান, ঢাকা, আল এছহাক প্রকাশনী ১৯৯৭, পৃ. ১৩-১৪ থেকে উদ্ধৃত।

৫৯. দ্রষ্টব্যঃ মাওলানা আবদুর রহীম হাযারী, *সূফীতত্ত্বের আত্মকথা*, নবরাগ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ৩১৩-৩১৯ থেকে উদ্ধৃত।

৬০. *বাঙলার সূফী সাহিত্য*, সম্পাঃ আহমদ শরীফ, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃ. ৪৩৫

৬১. ড. আমিনুল ইসলাম, *মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি*, ৩য় সংস্করণ, ঢাকা নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৯৬, পৃ. ২১৭ থেকে উদ্ধৃত।

৬২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭ থেকে উদ্ধৃত।

৬৩.Qd. Affifi, A.E. The moestical Philosopy of Mohyid Din Ibnul Arabi, England, Cambridge University press. p. 83

৬৪. Qd. Affifi, A.E. Ibid., p. 83

৬৫. *ঋগবেদ সংহিতা*, ১০/৮২/৩

৬৬. ঐ, ১০/১২৯/৩-৪

৬৭. Radhakrishnan, S. *Indian Philosophy*, (2nd ed) London, 1929, o,104

৬৮. Brandon, S.G.F. (ed), *A Dectionary of Comperatiue Religion*, London, 1971. p.211

৬৯. *ঐতরেয় উপনিষদ*, ১/১-২

৭০. *তৈত্তিরীয় উপনিষদ*, ২/৫/৩

৭১. ঐ, ৩/১, *ছান্দগ্য উপনিষদ*, ৩/১৪/১

৭২. *আল কুরআন*, ১৫:৮৫

৭৩. ঐ, ৫১:২১

৭৪. ঐ, ১২:৫৪

৭৫. ঐ, ৬:১২

৭৬. ঐ, ৬:৯৪

৭৭. ঐ ১২:৫৩

৭৮. মুহাম্মদ শফী, *তফসীর মাআরেফুল কুরআন*, সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, অনুঃ, মহিউদ্দীন খান, সউদী আরব: বাদশাহ ফাহাদ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হিযরী, পৃ. ৬৭১-৭২ থেকে উদ্ধৃত।

৭৯. *আল কুরআন*, ৭৫:২

৮০. ঐ, ৯০:২৭-২৮

Dhaka University Institutional Repository

৮১. ঐ, ১৫:২৯

৮২. ঐ, ১৫:৮৫

৮৩. ঐ, ৩৯:৫২

৮৪. ঐ, ৫১:২১

৮৫. সোলায়মান আলী সরকার, *ইবনুল আরাবী ও জালাল উদ্দীন রুমী*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪, পৃ.২২২

৮৬. Al- Sayad Sabiq, Al-aqayed-al-Islamia, *Darul Kitabul Arabi*, Bairut (year of publication not mentioned), p. 224

৮৭. Azizun Nahar Islam, *The Nature of Self, Suffering and Salvation*, India: Allahabad, Vohra Publishers & Distributors, 1987, pp.1-2

৮৮. Narahari, H.G. *Atman in pre-Upanisadic Literature*, Madras, Ganesh and co. 1944, p.43

৮৯. Vide: Baladev Raj Sharma, *The concept of Atman in the principal Upasisads*, New Delhi, Dinesh Publications, 1972, p.11

৯০. Vide: Narahari, H.G. op. cit. p. 3

৯১. *ঋগবেদ*, ২/৩/১৭, *মুণ্ডক উপনিষদ*, ৩/১/১, *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ*, ৪/৬

৯২. *কঠ উপনিষদ*, ১/২/২০

৯৩. Azizun Nahar Islam, op. cit., pp. 36-38

৯৪. *তৈত্তিরীয় উপনিষদ*, ২/১/৩

৯৫. *মাণ্ডক্য উপনিষদ*, ২-৭

৯৬. চ্যাটার্জী, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৪৩

৯৭. *গীতা*, ২/২০

৯৮. ঐ, ২/২২-২৪

৯৯. Spencer, Sidney, *Mysticism in world Religion*, U.S.A, Barnes & co., 1966, p. 21

১০০. *ঐতরেয় উপনিষদ*, ১/১/১

১০১. *বৃহদারণ্যক উপনিষদ*, ১/৪/১

১০২. *ছান্দগ্য উপনিষদ*, ৩/১৩/৭

১০৩. *গীতা*, ১০/৩৯

১০৪. *ঐতরেয় উপনিষদ*, ১/৩/১১-১২

১০৫. ঐ, ১/৩/৪

১০৬. ঐ, ১/৩/১০

১০৭. *তৈত্তিরীয় উপনিষদ*, ২/১-৫

১০৮. *কঠ উপনিষদ*, ১/৩/৭-৮

Dhaka University Institutional Repository

১০৯. *বৃহদারণ্যক উপনিষদ*, ৪/৪/৫

১১০. *কঠ উপনিষদ*, ২/২/৭

১১১. *ছান্দোগ্য উপনিষদ*, ৫/১০/৭

১১২. *আল কুরআন*, ২২:৩১

১১৩. *আল কুরআন*, ৮৩:৭-৯, ১৮-২১

১১৪. ঐ, ৩১:৮-৯

১১৫. ঐ, ৪৫:২১

১১৬. Iqbal, M., *The Reconstruction of Religious Thought in Islam* (5th ed) India: New Delhi, Ditab Bhavan, 1994, p. 103

১১৭. *বৃহদারণ্যক উপনিষদ*, ৩/২/২

১১৮. *ছান্দোগ্য উপনিষদ*, ৫/১০/১-২

১১৯. *বৃহদারণ্যক উপনিষদ*, ৬/২/১৫

১২০. *ছান্দোগ্য উপনিষদ*, ৫/১০/৩-৬

১২১. *বৃহদারণ্যক উপনিষদ*, ৬/২/১৬

১২২. Walker, benjamin, *Hindu world, an Encyclopedic Survey of Hinduism*, vo,. ii, London, 1968, p. 6116

১২৩. *গীতা*, ৯/২০-২১

১২৪. *ঋগবেদ সংহিতা*, ৯/১১৩/৮-১১

১২৫. ঐ, ১০/১৫/১০

১২৬. ঐ, ৯/৭৩/৯

১২৭. *বৃহদারণ্যক উপনিষদ*, ৪/৪/৬, *কঠ উপনিষদ*, ২/৩/১৪

১২৮. *মুণ্ডক উপনিষদ*, ৩/২/৮, *প্রশ্ন উপনিষদ*, ৬/৫

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামে ঐশী প্রেম

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামে ঐশী প্রেম

ইসলামের মূল বিষয় হলো আল্লাহ্‌র কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ এবং এর মাধ্যমে শান্তি অর্জন। পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ শুধু তার দ্বারাই সম্ভব যে আল্লাহ্‌কে অকৃত্রিম ভালবাসে এবং তাঁর নৈকট্য ও আনুগত্য অন্য সবকিছু থেকে অধিক প্রিয় বলে অনুভব করতে সক্ষম হয়। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষ সৃষ্টির পূর্বে ফেরেশ্‌তাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌ যখন ঘোষণা করেন: অইয কালা রাব্বুকা লিল মালাইকাতি ইন্নী জা'ইলুন ফিল আরদি খালীফাহ; অর্থাৎ আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে যাচ্ছি। ফেরেশ্‌তারা বললেন: ক্বালূ আতাজ্ব'আলু ফীহা মাইয়্যুফছিদু ফীহা অইয়াছফিকুদ্দিমাআ, অনাহ্‌নুনুছাব্বিহু বিহামদিকা অনুকাদ্দিছু লাকা; অর্থাৎ আপনি কি সেথায় এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যারা সেখানে অশান্তি ঘটাবে এবং রক্তপাত করবে? আর আমরা তো সদা আপনার গুণকীর্তন করছি এবং আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। অতঃপর আল্লাহ্‌ বললেন: ক্বালা ইন্নী আ'লামু মালা তা'লামূন। অর্থাৎ অবশ্যই আমি যা জানি, তোমরা তা জান না।[১]

অতএব, মানব সৃষ্টির রহস্য এমনকি ফেরেশ্‌তাদের কাছেও পুরাপুরি সুস্পষ্ট নয়। কুরআনের পরিভাষায় মানুষ আল্লাহ্‌র খলিফা হিসেবে পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছে। সমস্ত সৃষ্টি জগৎকে আল্লাহ্‌ মানুষের সেবায় নিয়োজিত করে রেখেছেন। মানুষ (আদম)কে আল্লাহ্‌ তাঁর এমন কিছু গূঢ় রহস্য অবহিত করেছেন যা ফেরেশতাদেরও জ্ঞানের বাইরে।[২] সে কারণেই মানুষ (আদম) ফেরেশ্‌তাদের সেজদা পেয়ে মহিমান্বিত ও গৌরবান্বিত হয়েছে।[৩] এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইকবালের একটি উক্তি প্রনিধানযোগ্য।

দারদে দিলকে লিয়ে পায়দাকিয়া ইনসানকো

উয়ারনা মালায়কা কাফী থা এবাদতকে লিয়ে।

অর্থাৎ প্রেমময় একটি অন্তরের জন্যই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তা না হলে উপাসনা (এবাদতে)র জন্য ফেরেশ্‌তারাই যথেষ্ট ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

১। ঐশী প্রেম

যা ভাল বলে বুঝা যায় তৎপ্রতি মনের আকর্ষণকে মহব্বত বলে। এই আকর্ষণ যদি বিশেষ প্রবল হয়ে উঠে (শক্তিশালী ও দৃঢ় হয়) তবে তাকে এশ্‌ক বা প্রেম বলে।[৪] আল জুনায়েদের মতে, "প্রেম হলো হৃদয়ের ঝোঁক। কোন রকম চেষ্টা-তদ্‌বির ছাড়াই আল্লাহ্‌র প্রতি হৃদয়ের যে ঝোঁক তাই হলো প্রেম।"[৫] মুহাম্মদ আলী ইবনে কাতানীর মতে, "প্রেম হলো প্রেমাস্পদকে প্রাধান্য দেওয়া।"[৬] আবু আবদুল্লাহ্‌ আল নিবাজী বলেন, "যে কোন সৃষ্টির প্রতি প্রেম হলো এক প্রকার আনন্দ, অন্যদিকে স্রষ্টার প্রতি প্রেম হলো ধ্বংস বা বিলয়।" তার মতে স্রষ্টার প্রতি প্রেমে প্রেমিকের কোন ব্যক্তি স্বার্থ কিংবা কোন কারণ থাকে না; যার জন্য তিনি প্রেমাস্পদকে অন্বেষণ করেন। কাজেই পরমাত্মা আল্লাহ্‌ তায়ালার প্রতি মানব হৃদয়ের যে প্রবল আকর্ষণ তাকে ঐশী প্রেম বলে।

উল্লেখ্য যে, সম্যক পরিচয় লাভের পূর্বে কোন জিনিস ভাল কি মন্দ ইহা বুঝা যায় না। ইন্দ্রিয় ও বিবেকের সাহায্যে বস্তুর পরিচয় পাওয়া যায়। পঞ্চইন্দ্রিয়ের প্রতিটিরই উপভোগ্য বস্তু আছে। এজন্যই ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু মানুষ ভালবাসে অর্থাৎ মানব প্রকৃতি তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয়। যেমন সুন্দর আকৃতি, শ্যামল শস্যক্ষেত ইত্যাদি দর্শনে দর্শনেন্দ্রিয়, মিষ্টি স্বর শ্রবণে শ্রবণেন্দ্রিয়, সুগন্ধি আঘ্রাণে নাসিকা, সুমিষ্ট দ্রব্য ভক্ষণে রসনা এবং কোমল দ্রব্য স্পর্শে ত্বকের তৃপ্তি হয়। এজন্যই এ গুলোর দিকে মানব প্রকৃতি আকৃষ্ট হয় এবং মানুষ তাদের ভালবাসে। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সুখে মানব ও পশু এক সমান। মানব হৃদয়ে আর একটি ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে। এই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ই মানুষকে পশু থেকে পৃথক করে। এই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়কে বুদ্ধি, আলো (নূর), হৃদয় বা আত্মা শব্দের দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়।

এই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়েরও জ্ঞাতব্য বস্তুসমূহ আছে এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মত ইহাও স্বীয় জ্ঞাতব্য বস্তুসমূহে তৃপ্তি লাভ করে এবং তৎপ্রতি আসক্ত ও আকৃষ্ট হয়ে থাকে। এজন্যই মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন: "আল্লাহতায়ালা দুনিয়াতে তিনটি বস্তু আমার প্রিয় করে দিয়েছেন-স্ত্রী, সুগন্ধি এবং নামাজ: নামাজে আমার চোখের পুত্তলি শীতল হয়।[৭] তিনি নামাজ হতে পরম তৃপ্তি লাভ করতেন বলে এর আসন অতি উচ্চে স্থাপন করেছেন। যে ব্যক্তি স্বভাবে পশু অর্থাৎ নিজের দৈহিক দাবী দাওয়া ব্যতীত আর কিছুই জানে না সেই ব্যক্তি নামাজকে উত্তম বলে বিশ্বাস করে না এবং ভালবাসতেও পারে না। কিন্তু যার

Dhaka University Institutional Repository

অন্তরে বুদ্ধি প্রবল হয়ে উঠেছে এবং যিনি পশু স্বভাবের সীমা অতিক্রম করত ঊর্ধ্বে উঠেছে, তিনি আল্লাহ্‌র সৌন্দর্য ও বিস্ময়কর শিল্পকর্ম পর্যবেক্ষণ করে এবং তাঁর সত্তা ও গুণাবলীর প্রভাব অনুভব করত যেরূপ পরিতৃপ্ত হন অন্য কোন কিছুতে তিনি তত পরিতৃপ্ত কখনও হতে পারেন না। যেহেতু তৃপ্তিদায়ক বস্তুর প্রতি মনের আকর্ষণ ব্যতীত ভালবাসার কোন অর্থ হয় না; তাই আল্লাহ্‌ অনন্ত সৌন্দর্যের প্রতি মানব হৃদয়ের এরূপ আকর্ষণই হল ঐশী প্রেম। অর্থাৎ ঐশী প্রেম পরম সৌন্দর্যের প্রতি প্রেম, সে সৌন্দর্যের উপলব্ধি এবং সে সৌন্দর্যে নিজেকে বিলীন ও একাকার করে দেওয়ার তীব্রতম আকাঙ্ক্ষা ও ব্যাকুলতা। এ আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য প্রেমিক স্বীয় কামনা, বাসনা, আরাম, আয়েশ সবকিছু ত্যাগ করে থাকে এবং প্রেমাস্পদের গুণে নিজেকে গুণান্বিত করার প্রয়াস চালায়। তাই জুনায়েদ বাগদাদী (রহঃ) বলেন, 'প্রেম হলো আশেকের নিজস্ব গুণাবলীর স্থলে মাশুকের গুণাবলী অর্জন করা।'[৮] একই ভাবে বায়েজীদ বোস্তামী (রহঃ) বলেন যে, তাঁর (আল্লাহ্‌র) প্রেম হৃদয়ে প্রবেশ করে তিনি ভিন্ন অপর সকল কিছু হৃদয় থেকে দূর করে। ফলে আল্লাহ্‌র গুণাবলী তার চরিত্রে বর্তমান থাকে।[৯] এ কারণেই একজন সূফী সাধক আল্লাহ্‌র প্রেম অর্জনের জন্য আত্মস্বার্থ ত্যাগ করে, আত্ম নির্যাতন করে, এবং আল্লাহ্‌ প্রেমের সুধা পানে ব্যাকুল থাকে অহরহ। কাজেই ইহা সুস্পষ্ট যে, ঐশী প্রেম হলো পরমসত্তা আল্লাহ্‌র প্রতি প্রেম; তাঁর অনন্ত সৌন্দর্য উপলব্ধি এবং তাঁর গুণাবলী অর্জনের মাধ্যমে তাঁর সত্তায় লীন হওয়ার তীব্র ব্যাকুলতা।

২। ঐশী প্রেমের ধারণার উৎস

আল্লাহ্‌তায়ালার সাথে বান্দার প্রেম হতে পারে কিনা তা নিয়ে মুসলিম ব্যাখ্যাতাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কারো কারো কাছে আল্লাহ্‌র প্রেমের ধারণা বোধগম্য নয়। এমনকি কোন কোন আলিম আল্লাহ্‌র সাথে প্রেমকে অসম্ভব বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাদের মতে আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসার অর্থ আল্লাহ্‌র ইবাদতে নিমগ্ন থাকা ব্যতীত আর কিছুই নয়। সমশ্রেণীর বস্তু ভিন্ন অন্য বস্তুকে মানুষ ভালবাসতে পারে না। সুতরাং আল্লাহ্‌র প্রতি প্রকৃত প্রেম অসম্ভব। কিন্তু পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে তাদের এ মত পর্যালোচনা করলে একে গ্রহণযোগ্য বলে অভিহিত করা যায় না। আল্লাহ্‌র প্রতি বান্দার ভালবাসা সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য অত্যন্ত সুগঠিত। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌ বলেন:

Dhaka University Institutional Repository

"ইউহিব্বুহুম ওয়া ইউহিব্বুনাহুম"

অর্থাৎ তিনি তাদেরকে ভালবাসেন এবং তারাও তাঁকে ভালবাসে।[১০]

অন্যত্র আল্লাহ বলেন: আল্লাযীনা আমানূ আশাদ্দুহুব্বাল লিল্লাহ।

অর্থাৎ যারা ঈমানদার তারা আল্লাহ্‌কে সবার চেয়ে বেশী ভালবাসে।[১১]

ইউহিব্বুত তাওয়্যাবীনা অইউহিব্বুল মুতাতাহ্‌হিরীন

অর্থাৎ আল্লাহ্ তওবাকারীদের ভালবাসেন এবং যারা পবিত্র থাকে তাদেরও ভালবাসেন।[১২]

কুল ইনকুনতুম তুহিব্বূন্যাল্লাহা ফাত্তাবি'উনী ইউহ্‌বিব্‌কুমুল্লাহু অইয়াগফির লাকুম যুনুবাকুম; আল্লাহু গাফূরুররাহীম

অর্থাৎ আপনি বলে দিন: যদি তোমরা প্রকৃতই আল্লাহ্‌কে ভালবাস তবে আমার অনুসরণ কর, তাহলে আল্লাহ্ তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেবেন। আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[১৩]

পবিত্র কুরআনে আরো বলা হয়েছে-

"অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ কর এবং আমিও তোমাদের স্মরণ করব।"[১৪]

"নিশ্চয়ই আমি তাদের নিকটবর্তী আছি। কেউ আমাকে আহ্বান করলে আমি সে আহ্বানে সাড়া দিয়ে থাকি।"[১৫]

রাসূলে মাক্‌বুল (স.)ও বিভিন্ন হাদীসে আল্লাহ্ প্রতি ভালবাসাকে ঈমানের শর্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। একদা হযরত আবু রাজীন ওকায়েলী (রঃ) হুজুরে পাক (দঃ) কে জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! ঈমান কী? তিনি বললেন, "ঈমানের অর্থ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে সর্বপ্রকার বস্তুর চেয়ে অধিক ভালবাসা।" তিনি অন্যত্র বলেন: 'মানুষ যে পর্যন্ত স্বীয় পরিবার, পরিজন, ধনদৌলত ও সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ অপেক্ষা আল্লাহ্ ও রাসূলকে অধিক ভাল না বাসবে সেই পর্যন্ত সে ঈমানদার হবে না।" এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌তায়ালাও উক্তি প্রদর্শন পূর্বক বলেন: 'হে রাসূল, আপনি বলুন- "তোমাদের পিতৃগণ, তোমাদের পুত্রগণ, তোমাদের ভ্রাতাগণ তোমাদের স্ত্রী সকল, তোমাদের আত্মীয়গণ ও তোমাদের ধনসম্পত্তি যা তোমরা অর্জন করেছ এবং বাণিজ্য যা

Dhaka University Institutional Repository

বন্ধ হওয়াকে তোমরা ... যেসব বস্তু তোমরা পছন্দ করে থাক, তা সমুদয় যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল এবং আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয় তবে আল্লাহ্ তাঁর (শাস্তির) আদেশ উপস্থিত না করা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। আর আল্লাহ্তায়ালা তাঁর বিধান অমান্য কারীদেরকে তাদের গন্তব্যস্থান পর্যন্ত পৌছান না।"[১৬] অন্য এক হাদীসে মহানবী (স.) বলেছেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাতের প্রত্যাশী, আল্লাহ্ও তাদের সাক্ষাতের প্রত্যাশী। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সাথে সাক্ষাৎ করাকে ভালবাসে না, আল্লাহ্পাকও তার সাথে সাক্ষাৎ করা পছন্দ করেন না।" হুযুরে পাক (দ:) আল্লাহ্কে ভালবাসার আদেশ দিয়ে বলেন, "আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে সম্পদের রিজিক দিয়েছেন তজ্জন্য তাঁকে ভালবাস। আর আল্লাহ্ আমাকে ভালবাসেন বলে আমাকেও ভালবাস।" তিনি তার প্রার্থণায় বলতেন, "হে আল্লাহ্! আমি চাই তোমার ভালবাসা, তোমাকে যে ভালবাসে তার ভালবাসা। যে বস্তু তোমার ভালবাসার নিকটবর্তী করে তার ভালবাসা। তোমার ভালবাসাকে স্নিগ্ধ শীতল পানির চেয়েও আমার নিকট অধিক প্রিয় কর।

বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ হযরত দাউদ (আ:)কে বললেন: 'হে দাউদ জগৎবাসীকে আমার পক্ষ হতে জানিয়ে দাও, যে ব্যক্তি আমাকে ভালবাসে আমি তাকে ভালবাসি। যে ব্যক্তি নির্জনে আমার সাথে উপবেশন করে আমি তার সঙ্গী। যে ব্যক্তি আমার স্মরণে প্রীতিলাভ করে আমি তার প্রিয়। যে ব্যক্তি আমার সাথি, আমি তার সঙ্গী। যে ব্যক্তি অপরের মধ্য হতে আমাকে বেছে লয় আমি তাকে বেছে নিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দান করি। যে ব্যক্তি আমার আদেশ পালন করে আমি তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করি। যে ব্যক্তি আমাকে হৃদয়ের সাথে ভালবাসে আমি তাকে অবশ্যই অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করি। যে ব্যক্তি আমাকে অন্বেষণ করে, সে ব্যক্তি আমাকে পায় এবং যে ব্যক্তি অপরকে অন্বেষণ করে সে আমাকে পায় না।'[১৭]

কুরআন ও হাদীসের উপর্যুক্ত ব্যাখ্যার আলোকে এটা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ্ মানুষকে ভালবাসেন; তাই কৃতজ্ঞতা স্বরূপ মানুষেরও আল্লাহ্কে ভালবাসা আবশ্যক হয়ে পড়ে। আবার প্রকৃত মুমিন হতে হলেও আল্লাহ্কে গভীরভাবে ভালবাসতে হবে। অতএব স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে যে, ইসলামের মর্মবাণী যথাযথভাবে উপলব্ধির পূর্বশর্ত হলো আল্লাহর প্রেম।

যৌক্তিক দিক থেকেও আল্লাহর সাথে মানবের প্রেম সম্ভাব। এটা অত্যন্ত সাধারণ বিষয় যে মানুষ উপকারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়, উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞ

Dhaka University Institutional Repository
থাকে এবং উপকারীর সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও বজায় রাখার প্রয়াস পায়। এ সম্পর্ক স্থাপন ও বজায় রাখা মানব প্রকৃতিতেই রয়েছে। মানব প্রকৃতির এই দিকগুলো ইমাম গাযালী (রঃ) অত্যন্ত সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। ইমাম গাযালী (রঃ) বলেন: পাঁচটি কারণে মানব হৃদয়ে ভালবাসা জন্মে। এগুলো হল- (১) মানুষ স্বভাবতই নিজেকে এবং নিজের জীবনকে ভালবাসে। (২) যার কাছ থেকে উপকার পাওয়া যায় স্বভাবতই মানুষ তাকে ভালবাসে। (৩) সত্যতা মনে ভালবাসা জন্মায়; কারণ সততার প্রতি সবারই একটি আকর্ষণ থাকে। (৪) সৌন্দর্যের প্রতি মানব হৃদয়ে আকর্ষণ রয়েছে বিধায় মানুষ সুন্দর ব্যক্তিকে ভালবাসে। (৫) স্বভাবের সাদৃশ্যের কারণে একের প্রতি অন্যের ভালবাসা জন্মে। ভালবাসার উক্ত কারণ সমূহ বিচার করলে দেখা যায় যে, উক্ত পাঁচটি কারণই আল্লাহ্‌র মধ্যে পূর্ণাঙ্গরূপে বিদ্যমান।[১৯] যেমন- মানুষ নিজেকে ভালবাসে কিন্তু গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে মানুষের অস্তিত্ব ও গুণাবলী সমস্তই আল্লাহ্‌র দান; তাঁর দয়াই মানুষ অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বের জগতে আসতে সক্ষম হয়েছে। আবার মানুষ উপকারীকে ভালবাসে; কিন্তু বিচার করলে দেখা যায় যে, আল্লাহ্‌ই প্রত্যেক বান্দার প্রকৃত উপকার কর্তা। একইভাবে সৌন্দর্যকে ভালবাসতে হলেও আল্লাহ্‌কে ভালবাসতে হবে; কারণ সৌন্দর্যের সকল বৈশিষ্ট্য আল্লাহ্‌র মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, আল্লাহ্‌ই মানুষের ভালবাসার যথার্থ পাত্র। একারণেই সূফীসাধকরা বলেন যে, যে নিজেকে চিনেছে সে আল্লাহ্‌কে চিনেছে এবং যে আল্লাহ্‌কে চিনেছে সে তাঁকে ভালবেসেছে।

ইসলামের অনুসারীদের মধ্যে খোদা প্রেমের বিষয়টি বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে সূফী সম্প্রদায়ের মধ্যে। ইসলামী পরিভাষায় সূফী বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যিনি আল্লাহ্‌ ও তাঁর প্রেরিত মহাপুরুষ হযরত মুহাম্মদ (স.) এর প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে জাগতিক ঐশ্বর্য্য তথা ধন-সম্পদ ও মান-সম্মান লাভের মোহ থেকে নিজেকে অবমুক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন; এবং নিখিল সৃষ্টি জগতের স্রষ্টা মহান আল্লাহ্‌র আরাধনা-উপাসনা এবং তাঁরই পক্ষ থেকে প্রেরিত মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর জীবন আদর্শকেই আপন জীবনের একমাত্র অভীষ্ট লক্ষ্য হিসাবে বরণ করে নিয়েছেন। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করা ছাড়া একজন সূফীর জীবনে আর কোন রকম জাগতিক কামনা বাসনা থাকেনা। তিনি সৃষ্টি জগতের সবকিছুই আল্লাহ্‌তে বিলীন করে দেন এবং নিজেও আল্লাহ্‌ময় হয়ে জান। এ প্রসঙ্গে বিশ্ববিখ্যাত তাপস মহাত্মা হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (র:) বলেছেন, "যিনি তাঁর জীবন-মরণ কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিকল্পেই উৎসর্গ করে দিয়েছেন তিনিই

Dhaka University Institutional Repository

প্রকৃত সূফী।"[২০] তিনি সূফী পরিচিতির বিশদ ব্যাখ্যায় আরো বলেন যে, বস্তু জগতের মোহ থেকে আপন প্রবৃত্তিকে প্রভাবমুক্ত রাখা, বিশ্বপ্রকৃতির ছলনা থেকে বিরত থাকা, ইতর চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন, প্রবৃত্তির প্রবঞ্চনা ও প্রতারণা থেকে আত্মাকে পূত-পবিত্র রাখা, মানবিক চরিত্রে বিভূষিত হওয়া এবং সমুদয় সৃষ্টিজগতের মহান স্রষ্টা আল্লাহর অস্তিত্বের পরিচিতি লাভ এবং তাঁরই মহান অস্তিত্বে নিজের ক্ষুদ্রতম অস্তিত্বকে বিলীন করে দেওয়ার নামই তাসাওউফ (সূফীবাদ)। এ প্রসঙ্গে হযরত ইমাম গাযালী (রহ:) বলেন, "আল্লাহ্ ব্যতীত অপর সবকিছু থেকে হৃদয়কে পবিত্র করে সতত আল্লাহ্র আরাধনায় নিমজ্জিত থাকা এবং সম্পূর্ণরূপে আল্লাহতে নিমগ্ন হওয়ার অপর নাম তাসাওউফ।"[২১] শায়খুল ইসলাম হযরত যাকারিয়া আল-আনসারী (র:) এর মতে "সূফী দর্শন আত্মার সংশোধনের শিক্ষা দান করে, তার নৈতিক চরিত্রকে উন্নত করে এবং স্থায়ী নিয়ামতের অধিকার (বিলায়েত) অর্জনের উদ্দেশ্যে মানুষের জীবনের যাহিরী ও বাতিনী দিককে গড়ে তোলে। আত্মার পবিত্রতা বিধানই এর বিষয়বস্তু এবং এর লক্ষ্য চিরন্তন শান্তি।"[২২] অতএব আমরা বলতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর তরীকা অনুযায়ী আত্মশুদ্ধি করে ইসলামের যাহিরী ও বাতিনী দিকের প্রেমপূর্ণ বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে পরম যাতের পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন ও আল্লাহ্তায়ালার সর্বোচ্চ নৈকট্য লাভের রহস্য উপলব্ধিই সূফীবাদ।

সূফীবাদ ইসলামের বাতিনী বা আধ্যাত্মিক দিকের পরিচায়ক আর শরীয়ত ইসলামের যাহিরী বা বাহ্যিক দিকের পরিচায়ক। আর এ দুটির সমন্বয়ই ইসলামের পরিপূর্ণ রূপ। কুরআনে এ পূর্ণ আদর্শের পক্ষে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন-

"লিকুল্লিন জ্বা'আলানা মিনকুম শির'আতাও অমিনহাজ্বা"

অর্থাৎ আমি তোমাদিগের জন্য একটি বিধি বা ব্যবস্থা (শিরআতান) এবং একটি বিশেষ পথ (মিনহাজান) দান করেছি।[২৩] এখানে মিনহাজান শব্দ দ্বারা ইসলামের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব তথা সূফীবাদকে নির্দেশ করা হয়েছে। এই অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক তত্ত্বই ইসলামে তাসাওউফ নামে খ্যাত। প্রসিদ্ধ সূফী ইমাম হাসান-আল বসরী এবং ইমাম আবু হানীফা (র:) এ বিষয়ে মহানবী (স.) এর দুটি হাদীসের উল্লেখ করেছেন,[২৪] যার দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের বাহ্যিক ও অন্তর্নিহিত দুটি দিক রয়েছে এবং অন্তর্নিহিত দিকটিই সূফীবাদ বা তাসাওউফ।

Dhaka University Institutional Repository

সূফীবাদ মূলত ঐশী প্রেমের মতবাদ, হৃদয়াবেগ মূলক মতবাদ। সূফীদের মতে প্রেমের দ্বারাই আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ লাভ বা উপলব্ধি সম্ভব হয়। তাদের মতে আল্লাহ্‌ কেবল অনাদি, অনন্ত, সর্বজ্ঞানময় ও সর্বশক্তিময়ই নয়; একই সাথে তিনি দয়াশীল করুণাময়ও। মানুষের সত্যিকার প্রশান্তি ও আনন্দ তাঁকে প্রাপ্তির মধ্যেই নিহিত রয়েছে। সুতরাং আনন্দ স্বরূপ আল্লাহ্‌ প্রকৃত পক্ষে প্রেমস্বরূপ। এই প্রেম স্বরূপতাই তাঁর মূল স্বরূপ। এই স্বরূপই সূফীদের নিকট প্রকটিত। সূফীতত্ত্ব অনুসারে আত্মার পবিত্রতা মাধ্যমে অর্থাৎ আত্মশুদ্ধি, আত্মসংযম ও আত্মসাধনার মাধ্যমেই পরম প্রেমময় আল্লাহ্‌তায়ালার প্রেম উপলব্ধি করা যায়। তাদের মতে মানুষ এবং আল্লাহ্‌র মধ্যে প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের সম্পর্ক বিদ্যমান। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রেম ও দয়া মূলত একই অনুভূতির দুটি দিক। তাই আল্লাহ্‌র প্রেম ও দয়া প্রাপ্তি সূফী জীবনের প্রধান কাম্য বিষয়। আল্লাহ্‌-প্রেমে আপনাকে বিলীন (ফানা) করে দিয়ে শুধু তাঁকেই আকাঙক্ষা করা সূফীসাধনার মূল লক্ষ্য। এই ঐশী প্রেমের দর্শনই সূফীবাদে উপস্থাপিত হয়েছে।

সূফীবাদের সাথে এই ঐশী প্রেমের ধারণা সর্বপ্রথম যুক্ত করেন তাপসী রাবেয়া (৭১৩-৮০১ খ্রিঃ)। তার পূর্ববর্তী সূফীরা যেখানে জোর দিয়েছেন ব্যাকুলতা (শাউক) ও বন্ধুত্ব (খুল্লাহ্‌) এর উপর সেখানে রাবেয়া অগ্রসর হলেন আরও কিছুদূর। এবং গভীর হৃদয়াবেগের সঙ্গে ব্যাখ্যা করেন তিনি বিশ্বাসী ব্যক্তির ঐশী প্রেমের ধারণা। তার পূর্ববর্তী সূফীদের মতে ধর্মানুভূতির মূল উপকরণ হলো ঐশী ভীতি। কিন্তু তিনি এই ঐতিহ্যকে বদলে দেন প্রেমের ধারণা প্রবর্তনের মাধ্যমে। তার নিজের উক্তি অনুসারে, আল্লাহ্‌কে তিনি ভালবাসতেন বেহেশ্‌তের আশায় নয় দোজখের ভয়েও নয়, খোদ আল্লাহ্‌রই কারণে। তার সমসাময়িক অন্য এক সূফী হলেন ইব্‌রাহিম বিন আদম (মৃত ৭৭৫)। তিনিও আল্লাহ্‌র সাথে প্রেমের ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি তার এক শিষ্যকে লক্ষ্য করে বলেন, "তুমি যদি আল্লাহ্‌র বন্ধু হতে কিংবা ভালবাসা পেতে চাও তাহলে ইহলোক এবং পরলোক উভয় জগতের আকর্ষণ পরিত্যাগ কর এবং তোমার মুখ আল্লাহ্‌র দিকে ফিরাও। তুমি যখনই তা করবে তখন আল্লাহ্‌ নিজেও তার মুখ তোমার দিকে ফিরাবেন এবং তাঁর অপার দয়া ও করুণা দিয়ে তোমাকে অভিভূত করবেন।"[২৫] একই ভাবে জুন্নুন আল-মিস্রি বলেন, "আল্লাহ্‌র সাথে মিলনের একটি প্রধান শর্ত হলো প্রেম।"[২৬] খাঁটি ঐশী প্রেম কেবল তখনই অর্জন করা সম্ভব যখন সবরকম আবেগ-উচ্ছ্বাস দমন করে কেবল মাত্র আল্লাহ্‌কে হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায়। এভাবে খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকে রাবেয়া

Dhaka University Institutional Repository
বসরীর মাধ্যমে সূফীবাদের মধ্যে যে প্রেমের ধারণা যুক্ত হয় পরবর্তীকালে প্রায় সকল সূফীই তাই (ঐশী প্রেমকে) গ্রহণ করেন আল্লাহ্‌র নৈকট্য তথা মিলন লাভের উপায় হিসাবে।[২৭]

৩। ঐশী প্রেমের স্বরূপ

ঐশী প্রেম মনকে মলিনতা ও পাপাসক্তি থেকে মুক্ত করে; নির্মল, পবিত্র ও উন্নত করে। ইহা হলো অহঙ্কার, গর্ব এবং সকল প্রকার মানবীয় দুর্বলতার প্রতিষেধক। ঐশী প্রেমের দ্বারা যার হৃদয় পুত-পবিত্র, তার মন সর্বপ্রকার কলুষতা থেকে মুক্ত। তাই বলা হয়ে থাকে ঐশী প্রেম সকল আধ্যাত্মিক ব্যাধির মহৌষধ। এই প্রেমের বলেই মহানবী (স.) আল্লাহ্‌র দিদার লাভ করেছিলেন; তূর পাহাড়ে হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ্‌র নূরের তাজাল্লি দেখেছিলেন। এ প্রসঙ্গে মাওলানা রুমী বলেন যে, আমার সত্তা উপর নীচ সকল দিক দিয়ে তাঁরই সত্তার মধ্যে লুকিয়ে আছে।[২৮] সে গোপন রহস্য প্রকাশ করলে সমগ্র বিশ্ব ওলট-পালট হয়ে যাবে। কারণ ঐশী প্রেম অব্যক্ত, বর্ণনাতীত ও জীবনের গোপন রহস্য। ইহাই সৃষ্টি জগতের মূলতত্ত্ব; মানবাত্মা ও পরমাত্মার মিলনের মূলমন্ত্র।

মাওলানা রুমীর মতে বাঁশী যেমন বাঁশবন হতে বিযুক্ত হয়ে কাঁদে, মানবাত্মাও তেমনি আত্মার জগৎ হতে বিচ্যুত হয়ে জড় পরিবেশের মধ্য থেকে আত্মার জগতে প্রত্যাবর্তনের জন্য কাঁদে। কারণ উৎপত্তিগত দিকথেকে আত্মা বা রূহ হল একটি পবিত্র নূরানী মাখলুক। ইহার আসল নিবাস আলমে মালাকূত অর্থাৎ রুহের জগৎ সেখানে সে সর্বদা আল্লাহ্‌তালার মহব্বতে ও যেকের-ফেকেরে নিমগ্ন থাকার সৌভাগ্য লাভ করত। দেহের জগতে এসে দেহের সাথে যুক্তহয়ে যে সমস্ত দোষ-ত্রুটি ও কুসংস্কার (কাম, ক্রোধ, হিংসা, বিদ্বেষ, লোভ রিয়া, গর্ব, কৃপণতা, আমানতের খেয়ানত প্রমুখ) সে লাভ করেছে, রূহের জগতে সে ইহা হতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র ছিল। ফলে সে রূহের জগতে থাকাকালীন সৌভাগ্যের অর্থাৎ মহব্বত ও মারিফাতের মধ্যে যথেষ্ট হ্রাস উপলব্ধি করছে। কিন্তু সর্ব সাধারণের রূহ ইহা উপলব্ধি করতে পারেনা। যাদের অন্তর দৃষ্টি প্রখর কিংবা যারা চরিত্র সংশোধন ও পবিত্রকরণ বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করে উপদেশ হাসিল করেছে কিংবা কামেল পীরের শিক্ষাও উপদেশ যাদের অন্তর হতে গাফিলতির পর্দা অপসারিত করেছে তাদের রূহ উপলব্ধি করতে পারে যে, তারা কেমন উচ্চ স্থান হতে নেমে কিরূপ নিকৃষ্ট ও নীচ স্থানে এসেছে; কেমন

Dhaka University Institutional Repository

সৌভাগ্য হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে কিরূপ দুর্ভাগ্যে পতিত হয়েছে। কাজেই প্রেমের জন্য বাঁশীর বুকে যেমন সঙ্গীতের সুর ওঠে তেমনি জীবন উৎসের মূলে প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রেম বিচ্ছিদের হাহাকারে কাঁদে। প্রেমের আকর্ষণে জীবন পরম সুন্দরের দিকে অগ্রসর হয়।

ইবনুল আরবীর মতে প্রেম তিন প্রকার।[২৯] যথা-স্বাভাবিক প্রেম বা মানবীয় প্রেম, আধ্যাত্মিক প্রেম, এবং ঐশী প্রেম। ঐশী প্রেম পরম সত্তার প্রেম বা আল্লাহ্‌র প্রেম। এই প্রেমই সৃষ্টির মূল। এই প্রেমই সব কিছুর উৎস। এই প্রেম থেকেই অন্যান্য প্রেমের উৎপত্তি ঘটেছে। কোন বিশেষরূপ গ্রহণের পূর্বে পরমসত্তা নিঃসঙ্গ বা একাকী অবস্থায় নিজেকে নিজে ভালবাসেন, নিজেকে প্রকাশ করার বাসনা তাঁর জাগে। তাই তিনি নিজেকে বিশ্বসৃষ্টির মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেন। নিজেকে ভালবেসে পরম সত্তা নিজ সত্তার সুপ্ত অবস্থা বা অব্যক্ত অবস্থায় বিদ্যমান সকল কিছুর আদর্শ সত্তা ও রূপ বা 'আয়ান'কে ভালবাসেন। সেই কারণে সে সকল আদর্শ সত্তা ও বস্তু ঐশী প্রেম লাভ করে এবং বিভিন্নভাবে সে প্রেমনীতি প্রকাশ করে। অর্থাৎ বিশ্বজগৎ যখন আল্লাহ্‌র সৃষ্টিধর্মী শব্দ 'হও' (কুন) শুনেছে, তখনই তারমধ্যে প্রেম প্রকাশ পেয়েছে।[৩০]

ইবনুল আরাবীর মতে মানবীয় প্রেমের অন্তর্ভুক্ত হলো-পার্থিব প্রেম, দৈহিক প্রেম। এই প্রেমের উদ্দেশ্য আত্মসন্তুষ্টি লাভ করা, ব্যক্তি স্বার্থ রক্ষা করা, পার্থিব বস্তুর জন্য লালায়িত হওয়া এবং ইহজগতের সকল প্রকার উন্নতি কামনা করা। এই প্রেমের মাঝে মানুষের পরম কাম্যবস্তু-পরম সত্তা, আধ্যাত্মিক উন্নতি কিংবা আল্লাহর জ্ঞান লাভ সম্পর্কে কোন চিন্তা থাকেনা। অন্যদিকে আধ্যাত্মিক প্রেম হল মরমী প্রেম বা অতীন্দ্রিয় প্রেম। এর মূল উদ্দেশ্য প্রেমিক ও পরম প্রেমাস্পদের আধ্যাত্মিক মিলন সাধন।[৩১] আধ্যাত্মিক প্রেমের মাধ্যমে মানুষ সকল প্রকার পার্থিব ও বৈষয়িক চিন্তা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি ত্যাগ করে পরম প্রেমাস্পদ আল্লাহ্‌কে জানতে চেষ্টা করে। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য বস্তু বা সত্তার প্রতি যে প্রেম, তা ঐশী প্রেমেরই নিম্নতম প্রকাশ মাত্র। এ প্রসঙ্গে মাওলানা রুমী বলেন যে, জাগতিক প্রেম ঐশী প্রেমের সোপান মাত্র।[৩২]

ইবনুল আরাবীর মতে কেবলমাত্র ঐশী প্রেমই প্রেমিক মানবাত্মা ও প্রেমাস্পদরূপী পরমাত্মার মিলন ঘটায় ও সমগ্র সত্তার ঐক্য অনুভব করায়। প্রেমিক তখন বুঝতে পারে যে সবকিছু মিলে এক, সবকিছুর মূলে এক, সকল সত্তার মূল সত্তা এক, সকল প্রেমের মূল প্রেম এক, আর সেই এক-ই হলো

Dhaka University Institutional Repository

'পরম আত্মা' বা 'পরম সত্তা' বা 'আল্লাহ্'।[৩৩] তাঁর মতে ঐশী প্রেম ও ঐশী সত্তা ভিন্ন বস্তু নয়, প্রেমের উদ্দেশ্য প্রেমের বস্তুকে জানা এবং প্রেমের বস্তুই স্বয়ং আল্লাহ্র সত্তা। তাই প্রেমিক যখন কোন বিশেষ আকার বা রূপকে ভালবাসেন তখন তিনি সে আকার বা রূপের মধ্যে আল্লাহ্কে দেখতে পান। এবং এর মাধ্যমে তিনি তাঁকেই ভালবাসেন।

ইবনুল আরাবীয় এই প্রেম তত্ত্বের সাথে স্পিনোজা, বার্গসঁ ও ইবনে সিনার প্রেমতত্ত্বের মূল বক্তব্যের যথেষ্ট মিল রয়েছে। ইবনুল আরাবী যেমন বলেন যে, আমরা যখন আল্লাহ্ বা অন্য কিছুকে ভালবাসি তখন আমরা মনে করি যে, আমাদের মধ্যে অবস্থিত অথবা অন্য যেকোন আকারের মধ্যে অবস্থিত আল্লাহ্ নিজেকে নিজে ভালবাসেন। স্পিনোজাও একই কথা বলেছেন। তিনি বলেন, "আমরা অনন্ত প্রেমের সাহায্যে ঈশ্বরকে ভালবাসি কারণ আমাদের ঈশ্বরকে ভালবাসার অর্থ আমাদের মধ্যে ঈশ্বর নিজেকে নিজে ভালবাসেন; যেমন আমরা অনন্ত আকারের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে জানি; কারণ আমাদের ঈশ্বরকে বুঝতে পারার অর্থ ঈশ্বর আমাদের মধ্যে নিজের সম্পর্কে নিজে চিন্তা করেন।[৩৪] আবার, আরাবীর মতে সৌন্দর্য সকল প্রকার প্রেমের উৎস। একইভাবে ইবনে সীনাও তাঁর বহু পূর্বে বলেছেন যে, প্রেম সবকিছুর মূল পরিচালক, এই প্রেম সকল বস্তু ও সত্তাকে পরম সৌন্দর্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। ইবনুল আরাবী ইবনে সীনার মতো বলেন যে, আমরা আল্লাহ্কে ভালবাসি কারণ আল্লাহ্ পরম সুন্দর, আল্লাহ্ আমাদের সকলকে এবং সৃষ্টির সব কিছুকে ভালবাসেন। কারণ তিনি সুন্দর জিনিস ভালবাসেন।[৩৫]

৪। ঐশী প্রেমের বৈশিষ্ট্য

ঐশী প্রেম সম্পর্কে সূফীদের বক্তব্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এর মধ্যে কতকগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নিম্নে ঐশী প্রেমের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করা হলো-

১। প্রেমে লাভ-ক্ষতির হিসাব নেই: বুদ্ধি কোন কার্য সম্পাদনের পূর্বে সে কার্যের ভালমন্দ, লাভ-ক্ষতি ইত্যাদি বিচার করে দেখে। কিন্তু প্রেমের ক্ষেত্রে লাভ-ক্ষতির কোন হিসাব নেই।[৩৬] প্রেমিক লাভ-ক্ষতির বিচার না করে প্রেমাস্পদের নিকট আত্মসমর্পন করে। পার্থিব প্রেমের মত এক্ষেত্রে চাওয়া-পাওয়ারও কোন অবকাশ থাকে না। তিনি কেবল আল্লাহ্কেই চান, ইহা ছাড়া অন্য কিছুই প্রেমের বিনিময়ে তার কাম্য নয়।

Dhaka University Institutional Repository

২। **প্রেম পরম সৌন্দর্য:** রুমীর মতে প্রেমই পরম সৌন্দর্য এবং পরম সৌন্দর্যই প্রেম। ইমাম গায্যালী, ফরীদ উদ্দীন আত্তার এবং ইবনুল আরাবীর মতো তিনিও মনে করেন আল্লাহ্ পরম সৌন্দর্য ও সর্বশ্রেষ্ঠ পূর্ণ সত্তা, পার্থিব জগতের সকল সৌন্দর্য পরম সৌন্দর্যের আংশিক প্রকাশ মাত্র। তাঁর মতে বাহ্যিক জগতের বস্তুর সৌন্দর্য সীমিত ও ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু আল্লাহ্র সৌন্দর্য চিরন্তন ও অসীম। সূর্যের সাথে যেমন সূর্যালোকের সম্বন্ধ, আল্লাহ্র সৌন্দর্যের সাথে তেমনি জাগতিক বস্তুর সম্পর্ক। পরম সৌন্দর্য হতে জাগতিক বস্তু সৌন্দর্য লাভ করে থাকে। সূর্যালোকের অভাবে যেমন বিভিন্ন বস্তু অন্ধকারে আবৃত হয়, তেমনি ঐশী সৌন্দর্যের অভাবে বিশ্বের সকল বস্তু সৌন্দর্যহীন হয়। প্রেম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বস্তুকে আধ্যাত্মিক জগতের পরম সৌন্দর্যের নিকট পৌছায়ে দেয়। রুমীর ভাষায়-রূপ-অরূপের দিকে যাত্রার পাথেয়, রূপ সাধনার শেষ নেই। রূপের ভিতর দিয়ে অরূপের দিকে যাত্রাই জীবন। অর্থাৎ জীবনের আসল কাজ ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যাওয়া, অপূর্ণতা হতে পূর্ণতায় উন্নীত হওয়া।

৩। **প্রেম জীবনকে উন্নত করে:** প্রেম জীবনকে ক্ষুদ্রতা, তুচ্ছতা ও সকল সীমার উর্ধ্বে উঠায়। প্রেমের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে বাংলার এক সূফী বলেন, "প্রেম পরম রতন লভিবারে হেন ধন করহে যতন। প্রেমে রত যতজন, নাহি কোন কুবচন, দ্বেষ হিংসা কদাচন, নাহি লয় মনে কখন। প্রেমে সহিষ্ণুতা করে, পরহিতে সদাই ফেরে, শত্রু-মিত্রের মঙ্গল করে, সবারই সমানে হন। প্রেমে লোভ- ক্রোধ হরে, অহঙ্কার নাশ করে, দয়া-মায়া গুণ ধরে সুখ প্রস্রবন।"[৩৭] প্রেমের আবেগে প্রকৃতির সৌন্দর্যের উর্ধ্বে উঠলে পরম সৌন্দর্যের সন্ধান পাওয়া যায়। তার ফলে পরম সৌন্দর্যের সাথে এক মহামিলন ঘটে এবং এক বিরাট মহত্ত্বের আদর্শ স্থাপিত হয়। রুমীর মতে "সকল আত্মস্থকরণ, সাদৃশ্যকরণ, আত্মপ্রসারণ, পরিবর্ধন, পুনরুৎপাদন, বংশবৃদ্ধি সাধন ইত্যাদি প্রেমের বিভিন্ন প্রকাশ বা পরিস্ফুটন মাত্র।"[৩৮] প্রেমের বিভিন্ন প্রকাশ অনুসারে জীবন অস্তিত্বের বিভিন্নস্তরে সেইসকল স্তরের বৈশিষ্ট্য অনুসারে বিভিন্ন আকার ধারণ করে ক্রমোন্নতির পথে ধাবিত হয়।

৪। **প্রেম গতিশক্তি:** প্রেমের সোপান যেমন সংখ্যাতীত, জীবনের উন্নতি ও আধ্যাত্মিক বিকাশের পর্যায়ও তেমনি সংখ্যাতীত। প্রেম ব্যতীত আধ্যাত্মিক বিকাশের এই সকল সোপান অতিক্রম করা সম্ভব নয়। প্রেম ব্যতিরেকে বিশ্বগতিহীন হয়ে পড়ে। এই প্রেম মূলত পরম সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ। পরম সুন্দরের প্রেমই পরম উৎসের প্রেম এবং এই প্রেমের মাধ্যমে পরম উৎসের

Dhaka University Institutional Repository
দিকে প্রত্যেকটি জীবনই ধাবিত হয় মিলনাকাঙ্ক্ষায়। এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইক্‌বাল বলেন, "প্রেম অচিন্ত্য রাজ্যভেদ করতে পারে এবং অচিন্ত্য জয়লাভ করতে পারে। প্রেমিকের শক্তি চিরধাবমান, তার বিরাম নেই। এমন কোন অন্তরায় নেই, যা সে অতিক্রম করতে পারে না।"[৩৯]

৫। **সৃষ্টির মূল তত্ত্ব:** ইবনুলআরাবী, ফরীদউদ্দীন আত্তার, রুমী প্রমুখ সূফী বিশ্বাস করেন যে, প্রেমই সৃষ্টির মূল তত্ত্ব। রুমীর মতে, সৃষ্টির কারণ পরম সুন্দরের প্রকাশ, বাসনা বা প্রেম। পরম সত্তার নির্যাস বা সারসত্তারূপে এই প্রেমের উদয় না হলে সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি হতো না। অনস্তিত্ব অবস্থা হতে অস্তিত্বশীল অবস্থা কোন কিছুই আবির্ভাব হতো না। প্রেম দেশকাল হীন, কালে কালে প্রেম বিভিন্নভাবে প্রকাশ পায়, প্রেম বিশ্বতাত্ত্বিক নীতি ও প্রকৃতির মধ্যে কার্যকরী এক শক্তি। এই প্রেমের প্রকৃত অর্থ যে ব্যক্তি বুঝেছে সে ব্যক্তি সৃষ্টির নিগূঢ় তত্ত্ব ও তথ্য বা রহস্যভেদ বুঝতে সক্ষম হয়েছে।

৬। **জগৎ ও জীবনের প্রেরণাশক্তি:** বিশ্বের সকল 'জড়বস্তু' প্রাণ, জীবন বা আধ্যাত্মিক শক্তি হতে উৎপত্তি হয়। প্রত্যেক বস্তু এক বা একাধিক প্রাণের সমাবেশ এবং প্রত্যেক বস্তু বা অনু পরমাণুর মধ্যে প্রেমের আকর্ষণ শক্তি আছে। চুম্বক যেমন লৌহ আকর্ষণ করে, তেমনি পরমাত্মা হতে আগত প্রাণ, জীবন বা আত্মা তার উৎসের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে চায়। জড় জগৎ, উদ্ভিদজগৎ, প্রাণীজগৎ ও মানবজগতের প্রকৃতিতে এমন একটি প্রেরণা নিহিত আছে যা প্রত্যেক বস্তু ও জীবনকে ঊর্ধ্বদিকে পরিচালিত করে পরম উৎসের নিকটে পৌছয়ে দিতে চেষ্টা করে। উৎস বা আদর্শের দিকে এই যে প্রেরণা, আগতকে ছাড়িয়ে অনাগতের সাথে এবং বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্যকরণ ও আত্মপ্রসারণের এই যে তীব্র আকাঙক্ষা, রুমীর মতে তা কোন বস্তু, উদ্ভিদ, প্রাণী বা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা জাতির বিশেষত্ব নয়। বরং সমগ্র সৃষ্টির মধ্যদিয়ে অনন্ত গতিতে প্রবাহিত একই মহা প্রেরণা সুদূর লক্ষ্যে অবস্থিত পরম উৎসের পানে ছুটে চলছে। রুমীর অধ্যাত্মবাদী দর্শনে এই প্রেরণারই অন্য নাম প্রেম। অর্থাৎ যে শক্তি দ্বারা জীবন প্রবাহের অগ্রগতি সাধিত হয়, জীবন এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থায় উন্নীত হয় সে শক্তি বা প্রেরণাই প্রেম।

৭। **প্রেম মানুষকে মুক্তিদেয়:** প্রজ্ঞা, বুদ্ধি, মুখের ভাষা প্রেমের স্বরূপ বুঝতে পারে না বরং প্রেমের স্পর্শে আত্মা, বুদ্ধি, চক্ষু, সহস্রগুণ উন্নত হয়। বিচার-বুদ্ধি, স্থান-কাল ইত্যাদির ঊর্ধ্বে উঠে প্রেমের মাধ্যমে মানুষ যে মুক্তি লাভ করে

Dhaka University Institutional Repository

ইহাই উচ্চতর জীবনের কাম্য। প্রেম দ্বারা মানবাত্মা পরিবর্তিত হয়ে পরমাত্মার গুণে গুণান্বিত হয়; জড় জগৎ হতে আধ্যাত্মিক জগতে প্রত্যাবর্তন করতে পারে এবং মানব উন্নতির চরমসীমা অর্থাৎ পূর্ণমানবত্বে পৌঁছতে পারে। অন্যদিকে প্রেমহীন ইবাদত মানুষকে এই স্তরে উন্নীত করতে অক্ষম। প্রেমহীন ইবাদত বন্ধ্যা নারী সদৃশ, যা ফল উৎপাদন করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ; যারগতি নিরুদ্ধ, যার স্থায়িত্ব ও সম্ভাবনা শূন্যতার হাহাকারে পর্যবসিত হয়।[৪০] তাই সূফীকুল শিরোমনি খাজা মাঈনুদ্দীন চিশতী (র.) বলেছেন:

"জা একে জাহেদ বা হাজারো আরবাইন রা ছাদ
মস্তমায় ইশকে বা এক আঁহ মিদা ছাদ।"

অর্থাৎ প্রেমহীন ইবাদতকারী যেস্থানে হাজার রাকাত নামাজ দ্বারা পৌঁছবে প্রেম-মাদকতায় মত্ত ব্যক্তি সে স্থানে এক হুংকারেই পৌঁছে যায়। এ প্রসংগে মাওলানা রুমী বলেন:

"ছায়েরে জাহেদ হরমাহে এক রোজরাহ
ছায়েরে আশেক হরদমে তা এখ্‌তে শাহ।"

অর্থাৎ নিরস ইবাদতকারী (জাহেদ) আল্লাহ্ প্রাপ্তির সামান্যতম পথ একমাসে অতিক্রম করে, পক্ষান্তরে আল্লাহ্ প্রেমিক ব্যক্তি প্রতিমুহূর্তে আল্লাহ্‌র সিংহাসনে পৌঁছে যায়। তিনি আরো বলেন, "ইন্দ্রিয় জ্ঞানের আবরণ দূর করে, বৌদ্ধিক জ্ঞানের বাঁধা অতিক্রম করে, প্রেমের মাঝে মানুষ রূপের মধ্যে অপরূপকে, সীমার মধ্যে অসীমকে যখন জানতে পারে তখন ইন্দ্রিয়জাত অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান ও বুদ্ধিজাত জ্ঞানের সামগ্রী মানুষের কাছে তার তুচ্ছতা পাল্টিয়ে অর্থময় হয়ে ওঠে এবং গোটা মানবসত্তার বিকাশের সহায়ক হয়।"[৪১]

৯। **প্রেম দুই সত্তার মিলন ঘটায়:** মানবাত্মা আজন্ম উৎসর নিকট প্রত্যাবর্তনের জন্য বিরহ বেদনায় হাহাকার করছে। অশান্ত মানবাত্মার এই বিরহবোধ যার মধ্যে জাগে সে প্রেমিক প্রেমতত্ত্ব বুঝে; প্রভু-ভৃত্যের ভেদরেখা তার কাছে মুছে যায়। অনন্ত জীবনের মহারহস্য তার কাছে প্রকাশ প্রায়। ভৃত্য প্রেমিক রূপ পায় এবং প্রেমাস্পদের সাথে মিলন ঘটে। বস্তুত মানব ক্ষুদ্র দেহদারী জীব, আর পরম সত্তা আধ্যাত্মিক দেহধারী অসীমসত্তা;[৪২] প্রেম এই দু'দেহের মিলন ঘটায়। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সূফী জুনায়েদ বাগদাদী (র:) বলেন "মহব্বত দু'টি সত্তার মধ্যেই স্থাপিত হয়। কিন্তু শর্ত এই যে, সত্তা দু'টির মধ্যে দ্বৈততার পর্দা উঠে এক প্রাণ হতে হবে।"[৪৩] আবার রাবেয়া বসরী বলেন, প্রকৃত প্রেম সৃষ্টির

আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত স্থায়ী থাকে। সৃষ্টি জগতে যে এর এক ফোঁটা পান করেছে, সে প্রেমাস্পদ খোদার সাথে মিলিত হয়ে এই নির্দেশ লাভ করেছে, যে আল্লাহ্কে ভালবাসে, আল্লাহ্ তাকে ভালবাসে।"[৮৮]

১০। **প্রেম তাত্ত্বিক জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম:** প্রকৃতির বৈচিত্র্যের মধ্যে দর্শন ঐক্যসূত্র স্থাপন করতে চায়। বুদ্ধি আংশিক ঐক্যসূত্র স্থাপন করতে পারে, কিন্তু জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই দুয়ের দ্বৈততা সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করে ঐক্য স্থাপন করতে পারে না। প্রেম এ ক্ষেত্রে একমাত্র কার্যকরি শক্তি। কারণ বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা প্রভেদ দেখায় ও বিভেদ সৃষ্টি করে কিন্তু প্রেম বিপরীতধর্মী বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে একত্রে মিলন ঘটায় ও সমসাত্ত্বিক বস্তুরূপে রূপান্তরিত করে মহামিলনের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। রুমীর মতে, মিলন ঐক্য সাধনের নীতি হিসেবে প্রেমের স্থান বুদ্ধির বহু উর্ধ্বে। তিনি আরও বলেন, "হে বন্ধু! আল্লাহ্ প্রেমিক যখন আল্লাহ্র তরফ হতে প্রেম মদিরার অহার লাভ করে, তখন তার স্থূল জ্ঞান একেবারে লোপ পেয়ে যায়।"[৮৫]

১১। **আধ্যাত্মিক গূঢ় রহস্য:** প্রেম হলো বিস্ময়কর অধ্যাত্মিক গূঢ় রহস্য। ইহা প্রত্যেক ধর্মকে তাৎপর্য মণ্ডিত করে, যৌক্তিক বিশ্বাসের দ্বারা নয় বরং অব্যবহিত স্বজ্ঞার মাধ্যমে।"[৮৬] ইহা হলো সপ্রমাণিত এক প্রকার অভ্যন্তরীণ আলো; যিনি প্রকৃত জ্ঞানী তিনি ইহা প্রত্যক্ষ করেন। কোনকিছুই এরূপ জ্ঞানের নিশ্চয়তার হ্রাস-বৃদ্ধি করতে পারে না। তাই সূফীরা এরূপ বিশ্বাসের কার্যকারিতা প্রমাণে প্রয়াসী নয়।

১২। **প্রেম সহজাত প্রবণতা:** প্রেম হলো আত্মার সহজাত প্রবণতা, যা আত্মার প্রকৃতি ও পরিণতিকে উপলব্ধি করতে অনুপ্রাণিত করে। আল্লাহ্ আত্মাকে প্রথমে সৃষ্টি করেন; জগৎ সৃষ্টির পূর্বে ইহার সত্তা আল্লাহ্র সত্তায় নিহিত ছিল। জগতে তার আগমন নির্বাসন স্বরূপ। ইহা সর্বদা তার স্থায়ী আবাসে প্রত্যাবর্তনের জন্য উদগ্রীব। সূফী কাব্যের সমস্ত প্রেম কাহিনী এবং উপমা- লাইলী-মজনু, ইউসুফ-জুলেখা, সালমান-আবসাল, পতঙ্গ- প্রদীপ, বুলবুলী-ফুল ইত্যাদি হলো আত্মার সাথে মিলন এবং বিরহের কাহিনী। সূফীদের মতে আত্মা হলো প্রিয়হারা আর্তনাদকারী ঘুঘু সদৃশ, যা প্রিয়তমের সাথে মিলন লাভেচ্ছু সর্বদা বিরহ বেদনায় কাঁদছে।

১৩। **প্রেম ভয়হীন:** প্রেমিকের প্রাণের ভয় নেই।"[৮৭] তার লক্ষ্য হলো প্রেমাস্পদের সাথে মিলন। প্রেমাস্পদ ব্যতীত তার জীবন ধারণ বৃথা। প্রাণ

Dhaka University Institutional Repository
তার প্রেমাস্পদের সাথে মিলনের অন্তরায় স্বরূপ। তাই যে প্রেমিকের অন্তরে প্রেম প্রকাশ পায়, সে নাচিতে নাচিতে প্রাণ উৎসর্গ করে। প্রেম সাধনায় অনেক বিপদও রয়েছে। যে ব্যক্তি প্রেমের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে সে ব্যক্তি কুফ্‌র ও ঈমানের গণ্ডি হতে মুক্তি লাভ করেছে।[৪৮] এ প্রসঙ্গে ইকবাল বলেন, 'প্রেম সকল বিঘ্ন দূর করে। ইহা শক্তির উৎস আর ভীতি দুর্বলতার পোষক। যেখানে প্রেম আছে, সেখানে শক্তি আছে, যেখানে শক্তি আছে সেখানে ভয় নেই। প্রেমই মানুষকে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে দেয়।[৪৯]

১৪। প্রেম খোদায়ী দান: প্রেম খোদায়ী দান। যাদেরকে আল্লাহ্‌তায়ালা ভালবাসেন তারাই আল্লাহ্‌কে ভালবাসতে সক্ষম। যদি সমগ্র বিশ্বও ইহা লাভ করতে প্রয়াসী হয় তবুও তারা ইহা লাভ করতে সক্ষম হবে না। কারও অন্তরকে বিনা পরিশ্রমেই তিনি হেদায়েতের নূর দ্বারা আলোকিত করে দেন ও স্বীয় মারিফাতের দ্বার তার জন্য খুলে দেন। আবার কাউকে একেবারেই বঞ্চিত করেন। তাঁকে পাওয়ার কারণ অনুসন্ধান নয় বরং ইচ্ছাকৃতভাবে দেখা দেওয়া। অনেক অভিজ্ঞ অনুসন্ধানকারী আজও পায়নি; আবার অনুসন্ধান না করেও কেহ পায়।[৫০] এ প্রসঙ্গে হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (রহ:) বলেন: আমার মনে এ আকাঙক্ষা হলো যে, আল্লাহ্‌র সাথে প্রেম গড়ে তুলি। কিন্তু ভাবনা চিন্তা করে অনুভূত হলো যে, আমার প্রতি তার প্রেম দান বহুদিন থেকেই রয়েছে।[৫১] রুমি মনে করেন আত্মার আল্লাহ্‌কে ভালবাসা হলো আল্লাহ্‌র আত্মাকে ভালবাসা। আর আত্মাকে ভালবেসে আল্লাহ্‌ নিজেকেই ভালবাসেন। কারণ আত্মার স্বরূপ হলো খোদায়ী।

১৫। প্রেম বর্ণনাতীত: যদিও ঐশী প্রেম বর্ণনাতীত তবুও ইহা বিভিন্নভাবে প্রকাশ পায়। যেমন হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহ:) বলেন যে, হযরত সাররী সাকতী (রহ:) একদা আমাকে মহব্বত এর অর্থ জিজ্ঞাসা করলেন। আমি বললাম কেউ কেউ তা সামঞ্জস্যমূলক বস্তুর দ্বারা এবং কেউ কেউ আবার ইশারা দ্বারা মহব্বতের অর্থ প্রকাশ করেছেন। আমার কথা শুনে তিনি তাঁর নিজ বাহুর চামড়া ধরে সজোরে টানতে লাগলেন, কিন্তু তা যথাস্থান থেকে উঠানো গেল না। তখন তিনি বললেন আমি আল্লাহ্‌র গৌরবের শপথ করে বলছি - শুধু আল্লাহ্‌র মহব্বতের কারণেই আমার চর্ম এভাবে শুকিয়ে গেছে। অতঃপর তিনি বেহুশ হয়ে পড়লেন কিন্তু এ সময়ে তার পবিত্র চেহারা উজ্জ্বল চন্দ্রের ন্যায় ঝলমল করে উঠলো।[৫২] সুতরাং ঐশী প্রেমকে মানবীয় ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়; ইহা প্রেমিকের অবস্থানুসারে বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১৬। প্রেম অন্ধ ও বধির করে: প্রখ্যাত সূফী ইবনে আবদআল সামাদ (Ibn Abdal-Samad) বলেন, যা মানুষকে অন্ধ ও বধির করে তাই হলো প্রেম। ইহা প্রেমাস্পদ ব্যতীত অপর সকল কিছু থেকে অন্ধ করে, ফলে প্রেমিক তাঁকে ব্যতীত আর কিছুই দেখেন না।[৫৩] এ প্রসঙ্গে মহানবী (স.) বলেন: ঐশী প্রেম এমনই বিষয় যা মানুষকে অন্ধ ও বধির করে। তিনি আরো বলেন- প্রেম তাঁর বাণী ব্যতীত অন্যসব বাণী থেকে আমাকে বধির করেছে।... প্রেম আমাকে অন্ধ করেছে। ফলে তাঁর দিকেই আমি কেবল তাকিয়ে থাকি। আবার প্রেম বস্তুজগতের বিষয়াবলীকে থেকে প্রেমিকের দৃষ্টিকে সরিয়ে তাকে কেবল প্রেমাস্পদের জন্য উম্মতকরে তুলে। তখন লোকে তা পাগল বলে অভিহিত করে। বস্তুত আল্লাহ্‌র প্রতি বান্দার মহব্বত হল হৃদয়ের একটি তাৎপর্য পূর্ণ অবস্থা, যে অবস্থায় সে সদাসর্বদা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের আশায় থাকে এবং তাঁর দর্শনের জন্য ব্যাকুল থাকে। আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোন কিছুতেই তার হৃদয়ে প্রশান্তি আসে না; তিনি ব্যতীত অন্য কারো কথা শুনতে সে আগ্রহ প্রকাশ করে না; সকলের বন্ধুত্ব হতে দূরে থাকা পছন্দ করে এবং প্রভুর বন্ধুত্বকে স্বাগতম জানায়। অন্যদিকে বান্দার সাথে আল্লাহ্‌র মহব্বতের অর্থ হলো বান্দার প্রতি আল্লাহ্‌ হেদায়েত ও দান। অর্থাৎ ইহাকাল ও পরকালের সকল বিপদ-আপদ থেকে বান্দাকে রক্ষা করা; এবং তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করা যার ফলে বান্দা আল্লাহ্‌ ব্যতীত যাবতীয় খেয়াল অন্তর হতে দূর করে দিয়ে একমাত্র তাঁর ধ্যানধারণাকেই আপন করে লয়।

১৭। প্রেমিকের নিকট প্রেমাস্পদই কাম্যবস্তু: প্রেমিক শুধু প্রেমাস্পদকে চায়। তাঁর জন্য তিনি জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। প্রেমাস্পদ প্রেমিককে ত্যাগ করলেও প্রেমিক তাঁকে পরিত্যাগ করতে পারে না। তিনি-ই শুধু তার চাওয়া-পাওয়া। ইহকাল ও পরকালে শুধু প্রেমাস্পদই তার প্রার্থিত বস্তু। বেহেশত-দোযখও তার কাছে মূল্যহীন। এ প্রসঙ্গে ফরীদ উদ্দীন আত্তার বলেন যে, বেহেশত এবং দোযখ যত দিন পর্যন্ত তোমার চলার পথে থাকবে ততদিন পর্যন্ত তুমি আল্লাহ্‌র দিদারের স্বাদ গ্রহণ করতে পারবে না।[৫৬] যখন তুমি ইহার আশা পরিত্যাগ করবে তখন তোমার সৌভাগ্য উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। আবার রাবেয়া বসরি বলেন, "হে মাবুদ! যদি আমি শুধু দোযখের ভয়ে তোমার ইবাদত করি, তাহলে আমাকে তুমি দোযখেই নিক্ষেপ কর। আর যদি বেহেশতের আশায় উপাসনা করি তাহলে সে বেহেশত থেকে তুমি আমাকে বঞ্চিত কর। আর যদি আমি শুধু তোমার উদ্দেশ্যেই ইবাদত করি তাহলে অনুগ্রহ করে তুমি আমাকে তোমার চিরসন্তুষ্টি প্রদান কর। আর তোমার দিদার

Dhaka University Institutional Repository

থেকে যেন আমি বঞ্চিত না হই।"[৫৫] তিনি আরো বলেন, যে প্রেমিকের প্রেমাস্পদের ইচ্ছার বিরোধিতা করা ঠিক নয় বরং তিনি যা প্রত্যাশা করেন তাই প্রত্যাশা করা উচিত। তাই জুনায়েদ বাগদাদী (রহঃ) বলেন, "আমাকে বেহেশ্‌ত দোযখের একটি পছন্দ করতে বলা হলে আমি একটিও গ্রহণ করব না। কেননা গোলামের আবার স্বাধীন ইচ্ছা কি? বরং আমি তখন বলব, হে খোদা আপনি আমাকে যেখানে পাঠাবেন আমি সেখানেই যাব।... আপনি যাতে সন্তুষ্ট হন আমি তাতেই সন্তুষ্ট।"[৫৬] কাজেই ইহা সুস্পষ্ট যে যথার্থ ঐশী প্রেম সম্পর্ণূভাবে স্বার্থলেশ শূন্য এবং একমাত্র আল্লাহ্‌ভিন্ন এরূপ প্রেমের অন্যকোন অভীষ্ট লক্ষ্য থাকতে পারে না।

প্রেম সম্পর্কিত সূফী আলোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, প্রেম ধর্মের নির্যাস। সমগ্র সৃষ্টি রহস্য তাঁরা প্রেম দ্বারাই ব্যাখ্যা করেছেন। নৈতিকতার পূর্ণতম আদর্শ এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানের একমাত্র ভিত্তি হলো প্রেম। আবার প্রেম একজন প্রেমিককে উদ্বুদ্ধ করে আত্মত্যাগে। ধন-সম্পদ, মান-সম্মান, ইচ্ছা-অনুভূতি, জীবন ইত্যাদি যা কিছু মানুষের নিকট মূল্যবান, সে সবের দিক থেকে তাকে ফিরিয়ে পরম প্রেমাস্পদের দিকে ধাবিত করে। প্রেম মানুষের সমগ্র সত্তায় পরম সৌন্দর্যের পূর্ণতম প্রকাশ ঘটায়। এর মাধ্যমে মানুষ জীবনের প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে পারে এবং জগতের সকল বৈচিত্র্যের মূল ঐক্য পরমসত্তাকে উপলব্ধি করতে পারে।

৫। ঐশী প্রেম লাভের উপায়

মানুষ পৃথিবীতে সৎস্বভাব (ফিতরাত) নিয়ে অর্থাৎ নিস্পাপরূপে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু পারিপার্শ্বিকতার কারণে ধীরে ধীরে মানব শিশুর মধ্যে নানা রকম প্রবৃত্তির জন্ম নেয়। লোভ-লালসা, কামনা-বাসনা, হিংসা-বিদ্বেষ, যশ-খ্যাতি, ধন- সম্পদ এবং ইন্দ্রিয়ানুভূতির প্রতি মোহ তাকে যেন আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে। তখন হৃদয় অল্লাহ্‌র মহব্বত লাভের জন্য আর উপযুক্ত থাকে না। এ প্রসঙ্গে ঈমাম গাযালী (রহ:) বলেন যে, মানবাত্মা স্বচ্ছ আর্শির ন্যায় উজ্জ্বল। আর মন্দ স্বভাব বা পাপ কর্মগুলো ধূম্র ও অন্ধকারের ন্যায় মলিন। ইহা ক্রমশ আত্মার ভিতর প্রবেশ করে ইহাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তোলে। অতঃপর মানুষের মন্দ স্বভাব ও পাপ কার্য স্বচ্ছ আত্মার সম্মুখে কাল বর্ণের একটাপর্দা ঝুলিয়ে দেয়। ফলে আত্মা তার উজ্জ্বলতা, স্বচ্ছতা ও পবিত্রতা হারিয়ে ফেলে এবং ইহা আল্লাহ্‌তায়ালার পরমোন্নত দরবার দর্শন হতে বঞ্চিত হয়। পক্ষান্তরে

Dhaka University Institutional Repository

সদ্‌গুণ ও মহৎ স্বভাবগুলো আলোকতুল্য। ইহা আত্মার অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্বক সমস্ত মলিনতা ও পাপ বিদূরীত করে আত্মার সৌন্দর্য ও স্বচ্ছতা বাড়িয়ে দেয়।[৫৭] মানুষ যদি আত্মার আদি স্বচ্ছতা সযত্নে রক্ষা করতে পারে, তাহলে ইহা এত পবিত্র, স্বচ্ছ এবং উজ্জ্বল হয়ে থাকে যে, পৃথিবীর সমস্ত পদার্থের প্রতিচ্ছায়া তাতে প্রতিফলিত হতে পারে। তখন মানুষ মহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌তায়ালার অনুপম সৌন্দর্য অবলোকন করতে পারে। আর মানুষ যখন আল্লাহ্‌তায়ালার সৌন্দর্য প্রেমে মুগ্ধ হয় তখন উক্ত সৌন্দর্যের ধ্যান ব্যতীত একমুহূর্তও অতিবাহিত করা দুষ্কর হয়। একমাত্র আল্লাহ্‌তায়ালার সৌন্দর্যের জ্ঞানই তার জন্য পরমোৎকৃষ্ট বেহেশত হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ আল্লাহ্‌তায়ালার সৌন্দর্যের নিকট বেহেশত অত্যন্ত তুচ্ছ এবং নগণ্য হিসেবে পরিগণিত হয়।[৫৮]

মহান আল্লাহ্‌তায়ালার মহব্বত লাভ তথা সৌন্দর্য দর্শনের জন্য ইসলামে শরীয়তের ইবাদত বন্দেগীর সাথে সাথে যাবতীয় কুপ্রবৃত্তি ও দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা থেকে হৃদয়কে শূন্য ও পবিত্র করার তাগিদ রয়েছে। এরদ্বারা মানব হৃদয় কর্ষিত ভূমির ন্যায় বীজ বপনের উপযোগী হবে। অতঃপর তওবা, সবর, শোকর, যিকির, তাওয়াক্কুল ইত্যাদি সৎপ্রবৃত্তি এবং সৎ স্বভাবের মাধ্যমে আত্মাকে সজ্জিত করতে হবে। ইহা হবে বীজ বপনের সমতুল্য। পরবর্তীতে মহান আল্লাহ্‌র অসীম রহমতে মানব হৃদয়ে আল্লাহ্‌র মহব্বত হাসিল হবে। অর্থাৎ চূড়ান্ত অর্থে আল্লাহ্‌র মহব্বত চেষ্টার দ্বারা অর্জন করা সম্ভল নয়। আল্লাহ্‌ই স্বয়ং তাঁর প্রিয় বান্দার অন্তরে তাঁর মহব্বত সৃষ্টি করে দেন। তাই প্রফেসর নিকলসন বলেন যে, মারিফাতের মতো মহব্বতও ঐশ্বরিক দান। অন্য কোনভাবে ইহা অর্জিত হয় না। যদি সমগ্র পৃথিবী এ প্রেমকে অক্রমণ ও নস্যাৎ করতে চায় তবে তারা তা করতে সক্ষম হবে না।[৫৯] কিন্তু আল্লাহ্‌র মহব্বত প্রাপ্তির জন্য হৃদয়কে উপযুক্ত করে তোলা বান্দার কর্তব্য। আল্লাহ্‌তায়ালা এরশাদ করেন: "যারা আমার জন্য চেষ্টা-সাধনা করছে, তাদেরকে আমি অবশ্যই আমার পথ প্রদর্শন করব।"[৬০] কাজেই ঐশী প্রেম লাভের জন্য সালেকের প্রথমই প্রয়োজন শরীয়তের অনুশীলন অতঃপর তরীকত ও মারিফাত।

Dhaka University Institutional Repository

৫.১ শরীয়ত

শরীয়ত সূফী পথ পরিক্রমার প্রারম্ভিক স্তর। সূফীর আধ্যাত্মিক পথ পরিভ্রমনের প্রথম ও অপরিহার্য অঙ্গ। ইহা ইসলামের বাহ্যিক দিক (জীবন ব্যবস্থা)। শরীয়ত ব্যতীত তরীকত, মারিফাত, হাকিকত (প্রকৃত সত্য) লাভ করা যায় না। ইসলামী পরিভাষায় শরীয়ত হলো কুরআন, সুন্নাহ্ (হাদীস), ইজমা (মতৈক্য) এবং কিয়াস (অনুকরণযোগ্য প্রমাণাদি) দ্বারা গৃহীত ইসলামী জীবন বিধান। এক কথায় আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থার নাম শরীয়ত।

ইসলাম ধর্ম অনুসারে শরীয়তের অনুশাসন মেনে চলা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য অবশ্য কর্তব্য। শরীয়তের মৌলিক বিষয় হচ্ছে ঈমান এবং আমল বা কর্ম। ইসলাম ধর্ম অনুসারে ঈমান অর্থাৎ বিশ্বাসের স্থান আমল বা কর্মের উপরে, বিশ্বাস আগে ও কর্ম পরে। ঈমান অর্থ সাধারণভাবে সাতটি বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা।[৬১] ইসলাম ধর্ম অনুসারে বিশ্বাসগত শর্ত পূরণ হলেই তার জন্য কর্মের দিক অনুসরণ করা আবশ্যক হয়ে পরে। ইসলামে কর্মগত দিককে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা হয়। যথা- (ক) আদেশমূলক দিক ও (খ) নিষেধমূলক দিক।

৫.১.১ আদেশমূলক কাজ

ইসলামী শরীয়তে আদেশমূলক যে কাজগুলোর জন্য বলা হয়েছে সেগুলোকে আবার গুরুত্বের দিক থেকে কয়েক শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রধান হচ্ছে ফরয বা অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। ফরয আল্লাহ্র আদেশ ও ঘোষণা, যা প্রত্যেক মুসলমানকে অবশ্যই পালন করতে হবে। না করলে তার জন্য কঠিন শাস্তিভোগ করতে হবে। ফরযের পরে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ওয়াজিব। এটিও ফরযের ন্যায় অবশ্য পালনীয়, তবে গুরুত্বের দিক থেকে ফরযের পরে। এর পর গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সুন্নাত অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (স.) নিজের জীবনে যা পালন করেছেন, যা করতে বলেছেন ও যা অনুমোদন করেছেন তাই সুন্নাত। প্রত্যেক মুসলমানের ইহা পালন করা কর্তব্য। তাছাড়া রয়েছে মুস্তাহাব, নফল এবং মুবাহ। উল্লেখ্য যে নফল (যেসকল কর্ম করলে পুরস্কার পাওয়া যাবে কিন্তু না করলে দোষ নেই) আমল হলো আল্লাহ্র মহব্বত লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়।

Dhaka University Institutional Repository

৫.১.২ নিষেধমূলক কাজ

নিষেধমূলক কাজগুলোকে মাত্রানুসারে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা (ক) নিষিদ্ধ কাজ এবং (খ) অপছন্দনীয় কাজ (মকরুহ)। শরীয়তে সুস্পষ্টভাবে যে কার্যাবলীকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে তা হারাম। হারাম কার্য করা কিংবা হারাম খাদ্য খাওয়া কঠিনতম শাস্তিযোগ্য পাপ। যেমন নরহত্যা, ব্যাভিচার, সুদ গ্রহণ ইত্যাদি। অন্যদিকে শরীয়ত যা অনুমোদন করেনি সেগুলো অপছন্দনীয় বা মকরুহ কার্য বলে পরিচিত। ইহা করলে পাপ।

ইসলাম ধর্মানুসারে আদেশমূলক কাজগুলো পালনের মাধ্যমে মানবহৃদয় আল্লাহ্‌র দিকে ধাবিত হয়। এবং নিষিদ্ধ বা অপছন্দনীয় কাজ পরিবর্জনের মাধ্যমে পাপ, পঙ্কিলতা, অনৈতিকতা ইত্যাদি থেকে মানব হৃদয় মুক্ত থাকে।

৫.২ তরীকত বা আত্মশুদ্ধির সাধনা

আল্লাহ্‌র প্রেম লাভের দ্বিতীয় স্তর হলো তরীকত বা আত্মশুদ্ধির সাধনা। শরীয়ত থেকে মারিফাতে (আল্লাহ্‌র পরিচয় জ্ঞানে) উত্তীর্ণ হতে হলে যে পথ অনুসরণ করতে হয় সেই অনুসৃত পথের নামই তরীকত। অন্য কথায় বাহ্যিকভাবে শরীয়তের ইবাদতের বিধানসমূহ অনুশীলন করার পর তা বিশেষ কর্ম পদ্ধতি অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ ও আধ্যাত্মিক আলোক দ্বারা যার মাধ্যমে সুসম্পন্ন করার চেষ্ট করা হয় তাই তরীকত।[৬১] আধ্যাত্মিক আলোক দ্বারা আলোকিত হবার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত শক্তি সম্পন্ন আত্মার। যেমন-হুযুর পাক (স.) ইরশাদ করেছেন: 'তাখাল্লাকু বি আখলাকিল্লাহ্' অর্থাৎ আল্লাহ্‌র গুণে গুণান্বিত হও। আল্লাহ্‌র গুণাবলীর শ্রেষ্ঠ প্রকাশ হযরত মুহাম্মদ (স.) এর আদর্শ চরিত্র। তাই সূফী শেখের অধীনে হযরত মুহাম্মদ (স.) এর আখলাক লাভ করার এক কঠোর মুজাহিদা বা সাধনা চলে সূফী জীবনের এ স্তরে। এ কঠোর সাধনা একজন পীর বা আধ্যাত্মিক গুরুর অধীনে হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই গুরুই সূফী পরিভাষায় পীর, শায়েখ বা মুরশিদ নামে পরিচিত। পীর বা মুরশিদ আধ্যাত্মিকতার আলোকে আলোকিত ইনসান-ই-কামিল বা পূর্ণমানব। একজন পীরই একজন সাধককে কাম্য লক্ষ্যে পৌছাতে পারেন। এই পীরের অধীনে আত্মশুদ্ধির জন্য তথা ঐশী প্রেম লাভের জন্য একজন সাধক তার কুপ্রবৃত্তিসমূহ দূর করতে সক্ষম হবে। সাথে সাথে সদ্‌গুণাবলী অর্জন করতেও সক্ষম হবে। অর্থাৎ একজন সাধককে যেমন ঐশী প্রেম লাভের পথে প্রতিবন্ধক স্বরূপ

Dhaka University Institutional Repository

কতগুলো মন্দ স্বভাব পরিহার করতে হবে তেমনি ঐশী প্রেম লাভে সহায়ক কতিপয় সদ্‌গুণাবলিও অর্জন করতে হবে।

৫.২.১ পরিবর্জনীয় মন্দ স্বভাব; যা ঐশী প্রেমের প্রতিবন্ধক

ঐশী প্রেম তথা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের জন্য সালেককে মানব চরিত্রের কু-প্রবৃত্তিমূলক দোষসমূহ, যে গুলো আল্লাহ্‌র প্রেম লাভের অন্তরায় স্বরূপ সেগুলো পরিহার করতে সর্বোতভাবে প্রয়াসী হতে হবে। ইমাম গাযালীর মতে, কুপ্রবৃত্তিমূলক দোষসমূহের সংখ্যা অগণিত। কিন্ত ধ্বংসাত্মক দোষগুলোর দশটি প্রধান মূল রয়েছে।[৬৩] যথা-(১) কৃপণতা; (২) অহংকার; (৩) আত্মাভিমান বা আত্মশ্লাঘা; (৪) রিয়া; (৫) ঈর্ষা; (৬) ক্রোধ; (৭) অতি ভোজনের লালসা; (৮) অতিরিক্ত কথনের লোভ; (৯) ধনাসক্তি; (১০) সম্মান লিপসা। মানুষ অন্তত এই দশটি মৌলিক দোষ হতে আত্মরক্ষা করতে পারলে বিনাশ হতে রক্ষা পেতে পারে।

(১) কৃপণতা দূরিকরণ: সঞ্চিত ধন-সম্পদ কমে যাবার ভয়ে দান খয়রাত না করাকেই কৃপণতা বলে। কৃপণতার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। আল্লাহ্‌ বলেন, "যারা আল্লাহ্‌ প্রদত্ত ধন বিতরণে কৃপণতা করছে; অচিরেই কিয়ামত উহার শিকল প্রস্তুতপূর্বক তাদের গলায় বেঁধে দিবে।"[৬৪] আল্লাহ্‌তায়ালা স্বীয় মাহাত্ম্য ও প্রতাপের শপথ করে বলেছেন: কৃপণ ব্যক্তিকে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করতে দিবেন না। আবার মহানবী (দ:) বলেন, "কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি থেকে বহু দুরে। লোক সমাজেও সে ঘৃণিত এবং দোযখের অতি নিকটবর্তী।" কাজেই কৃপণতা যেহেতু মানুষকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি তথা করুণা থেকে বঞ্চিত করে এবং আল্লাহ্‌র করুণা ব্যতীত যেহেতু তাঁর মহব্বত লাভ সম্ভব নয়; তাই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য কৃপণতা দূর করতে হবে।

কৃপণতা তথা মানব হৃদয়ের প্রত্যেকটি ধ্বংসমূলক ত্রুটি দূর করণের দ্বিবিধ উপায় রয়েছে। যথা-জ্ঞানমূলক ও কর্মানুষ্ঠানমূলক দিক। কৃপণতা দূরীকরণের জ্ঞানমূলক দিকের অর্থ হলো যে সব কারণে মানব স্বভাবে কৃপণতার উৎপত্তি হয় তা জেনে নিরসনের সচেষ্ট হওয়া; আর কৃপণতার চিকিৎসা হলো দানের আগ্রহ মনে উৎপত্তি হওয়া মাত্র তৎক্ষণাৎ দান করা।

Dhaka University Institutional Repository

(২) অহংকার দূরীকরণ: অহংকার একটি জঘন্য স্বভাব। নিজেকে কামালতের গুণে অন্যের চেয়ে বড় মনে করাই অহংকার। অন্যকথায় মানুষ নিজেকে অপর লোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উত্তম বলে মনে করলে মনের মধ্যে যে আনন্দের ভাব উৎপন্ন হয়ে মনকে কাঁপিয়ে তোলে তাকে অহংকার বলে। মানুষের মনে যখন অহংকার প্রবেশ করে তখন মানুষ নিজেকে শ্রেষ্ঠ এবং অপরকে তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র বলে বিবেচনা করতে থাকে।

অহংকারের পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। অহংকারী ব্যক্তি প্রকৃত প্রস্তাবে মহাপ্রভু আল্লাহ্তায়ালার সাথে প্রভুত্ব নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়। কারণ প্রকৃত পক্ষে প্রভুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র অধিকারী আল্লাহ্ ভিন্ন আর কেউই নয়। তাই আল্লাহ্তায়ালা বলেন: "অহংকারীর বাসস্থান অতি নিকৃষ্ট। বড়ত্ব আমার চাঁদর, যে ব্যক্তি ইহাতে অংশীদার হতে চাবে আমি তাকে ধ্বংস করব।" এ প্রসঙ্গে মহানবী (স.) বলেছেন: 'যার অন্তরে সরিষা পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে ব্যক্তি বেহেশ্তে প্রবেশ করতে পারবে না।' (মুসলিম) তিনি আরও বলেন, 'অহংকার হতে দূরে থাক, এই অহংকারই সর্বপ্রথম শয়তানকে পথভ্রষ্ট করেছে; অহংকার এমন জঘন্য পাপ যে, কোন ইবাদতই উহাকে খণ্ডন করতে পারে না। কাজেই আল্লাহ্র মহব্বত লাভের জন্য অহংকারকে পীরের অধীনে সাধনার মাধ্যমে মনোবৃত্তি থেকে দূর করতে হবে। কেননা সসীম মানুষের যাবতীয় ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির উৎস হলো আল্লাহ্ তায়ালা। অহংকারের ফলে মানুষ তার সসীমতা ও ক্ষুদ্রত্ব উপলব্ধি করতে পারে না। ফলে সে সম্পূর্ণ ভাবে আল্লাহ্র অনুগত হতে পারে না। আর আনুগত্য ব্যতীত আল্লাহ্র মহব্বত লাভ সম্ভব হয় না।

অহংকার হৃদয় হতে দূর করার জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন আল্লাহ্র মহিমা ও মাহাত্ম্য সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা। আল্লাহ্কে চিনতে পারলে মানুষ ইহা বিশেষভাবে উপলব্ধি করতে পারবে যে, প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব একমাত্র আল্লাহ্র। অতঃপর নিজেকে চিনে লইতে হবে যে, আমার মত হীন, নীচ, অপদার্থ ও হেয় আর কেউই নয়। অহংকারের অনুষ্ঠানমূলক চিকিৎসা হলো সদা সর্বদা নিজের প্রত্যেকটি কথায়, কাজে-কর্মে ও আচারে-ব্যবহারে বিনয়ী হতে হবে ও নম্র লোকের অনুকরণ করতে হবে। সর্বোপরি যে কাজ অহংকার প্রকাশ পায় সর্বদা তার বিপরীত কাজের অনুশীলন করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

(৩) আত্মশ্লাঘা দূরীকরণ: খোদপছন্দী বা আত্মশ্লাঘা একটি অতি জঘন্য প্রবৃত্তি। খোদপছন্দী অর্থ নিজের কার্যাবলী ও গুণাবলীকে ভাল মনে করা। যখন মানুষ নিজেকে পুণ্যবান, সৎকর্মী এবং তার সকল কৃতিত্বকে নিজের বলে বিবেচনা করতে আরম্ভ করে তখন তাকে খোদপছন্দী বা আত্মশ্লাঘা বলে। খোদপছন্দীর পরিণাম সম্পর্কে মহানবী (স.) বলেছেন: যে ব্যক্তি নিজেকে বড় মনে করে ও গর্বভরে চলে, সে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্তায়ালার সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, আল্লাহ্ তার প্রতি ভীষণ ক্রোধান্বিত থাকবেন।

হৃদয় হতে খোদপছন্দী দূর করার জন্য নিজের মধ্যকার গুণ বা কামালাতকে আল্লাহ্পাকের দান মনে করবে এবং আল্লাহ্তায়ালা কারও মুখাপেক্ষী নহেন, তিনি সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ, ইহা স্মরণ করে ভীত-শংকিত থাকবে যে, হয়ত তিনি তার দান ছিনিয়ে নিয়ে যাবেন।

(৪) রিয়া দূরীকরণ: রিয়া আল্লাহ্তায়ালার সহিত শরিক বা অংশীদার স্থাপন রূপ মাহপাপ। পুণ্যকার্য বা ইবাদতের মধ্যে অপরের ভক্তি ও প্রশংসা আকর্ষণ করবার উদ্দেশ্য থাকলে তাকে রিয়া বলে। রিয়া পাঁচ প্রকারে প্রকাশ পায়।[৯] যথা-দেহের বাহ্যিক আকৃতি, পোশাক-পরিচ্ছেদ, কথাবার্তা, ইবাদত এবং স্বীয় শ্রেষ্ঠত্বের গর্বের দ্বারা। রিয়া ইবাদতের উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা ইবাদতের উদ্দেশ্য একমাত্র আল্লাহ্রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি, কিন্তু যেহেতু রিয়াতে মূল উদ্দেশ্যের সহিত সৃষ্টির সন্তুষ্টি এবং মর্যাদারও সংমিশ্রণ ঘটে। তাই ইহা আল্লাহ্র মহব্বত লাভের অন্তরায় স্বরূপ এবং শিরক তুল্য।

রিয়ার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন: "যে ব্যক্তি স্বীয় প্রভুর দর্শন লাভের আশা রাখে, সে যেন নেক কাজ করে এবং তার ইবাদতে যেন কাউকে শরীক না করে।" আল্লাহ্তায়ালা আরও বলেন: "ঐ সমস্ত নামাজী লোকের জন্য ধ্বংস বা ওয়ায়েল দোযখ, যারা অন্য মনস্কভাবে নামায পড়ে, যারা অন্যকে দেখায়।"[১০] কাজেই আল্লাহ্র সন্তুষ্টি তথা মহব্বত লাভের জন্য তরিকতপন্থী সালেকের মুরশিদের সহায়তায় ধর্মেকর্মে রিয়া ত্যাগ করতে সচেষ্ট হতে হবে।

দু'প্রণালীতে রিয়া দূর করা যায়। (ক) জ্ঞান ও কর্মানুষ্ঠান; (খ) শান্তিকরণ; অর্থাৎ রোগের তীব্রতা কমিয়ে শান্ত করে দেওয়া। রিয়া দূর করণের জ্ঞানমূলক দিক হলো রিয়ার উৎস এবং পরিণতি সম্পর্কে অবগত হয়ে ইহা হতে মুক্ত থাকার জন্য সচেষ্ট হওয়া এবং কর্মানুষ্ঠানমূলক দিক হলো ইবাদত হতে রিয়ার

Dhaka University Institutional Repository

প্রভাব দূর করার জন্য ইবাদত ও নেক আমলগুলোকে গোপনে করতে প্রয়াসী হওয়া। অন্য দিকে রিয়ার শান্তিকরণ ব্যবস্থা হলো হৃদয়ে রিয়ার খেয়াল কিঞ্চিৎমাত্র দেখা দিলে তৎক্ষণাৎ ইহাকে বিতাড়নের জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট হতে হবে।

(৫) ক্রোধ দূরীকরণ: আল্লাহ্তায়ালা ক্রোধকে এই উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন যে, কোন অনিষ্টকর বস্তুর সম্মুখীন হলে ক্রোধরূপ অস্ত্র দ্বারা মানুষ যেন উহা প্রতিরোধ করতে পারে। মানব জীবনের এই প্রবৃত্তি অপরিহার্য। কারণ ইহা ভিন্ন মানুষ পৃথিবীতে জীবন ধারণ করতে পারে না। কিন্তু অতিরিক্ত মাত্রায় ইহা বৃদ্ধি পেলে নিন্দনীয় স্বভাবে পরিণত হয় এবং মানুষের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। ক্রোধ অতিরিক্ত বৃদ্ধি পেলে অগ্নির ন্যায় কার্য করে; ইহার ধুম মস্তিষ্কে উঠে মানুষকে অগ্নিশর্মা করে দেয়, তার জ্ঞান শক্তি রহিত হয়, চিন্তা বা বিচার ক্ষমতা লোপ পায়। অন্যদিকে ক্রোধ নিতান্ত নিস্তেজ হলে ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। সকলেই তখন নির্যাতন করতে অগ্রসর হয়। কাজেই ধর্ম পথে চলার জন্য ক্রোধকে এতদূর পর্যন্ত বশীভূত করা প্রয়োজন যতদূর আত্মরক্ষার জন্য দরকার। কিন্তু ক্রোধকে বশীভূত করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। মহানবী (স.) বলেছেন, যারা ক্রোধকে পরাস্ত করতে পারেন তারাই প্রকৃত মহাপুরুষ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেন; "ক্রোধ হজমকারী, অপরের প্রতি ক্ষমাকারী ও জগতের মঙ্গলকারী লোককে আল্লাহ্তায়ালা ভালবাসেন।"[১৭] কাজেই অতিরিক্ত ক্রোধ যেহেতু মানুষের বিচার ক্ষমতা হ্রাস করে নিম্ন শ্রেণীর প্রাণীতে পরিণত করে তাই আল্লাহ্র মহব্বত লাভের জন্য অতিরিক্ত ক্রোধ দূর করতে হবে।

ক্রোধ দমনের জ্ঞানমূলক ঔষধ হচ্ছে ক্রোধের অপকারিতা এবং ক্রোধ দমনের সওয়াব সম্বন্ধে কুরআন ও হাদীসের বাণীসমূহ অনুধাবন করা। আর ক্রোধের অনুষ্ঠানমূলক চিকিৎসা হলো ক্রোধের উৎপত্তি হওয়া মাত্র মুখে উচ্চারণ করতে হবে-বিতাড়িত শয়তানের অনিষ্টকারিতা হতে আমি আল্লাহ্তায়ালার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এ প্রসঙ্গে মহানবী (স.) বলেছেন, "ক্রোধের সময় দাঁড়ানো থাকলে বসে পড়বে, তাতে যদি সম্য না হয়, তবে শয়ন করবে, তাতেও যদি সম্য না হয়, তবে ঠাণ্ডা জলে অযু করবে, তাতেও ক্রোধ হ্রাস না হলে দু'রাকাত নামায পড়বে এবং খোদার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করবে।"

(৬) ঈর্ষা দূরীকরণ: মানব হৃদয়ের অনিষ্টকর দোষসমূহের মধ্যে ঈর্ষা একটি অতি মারাত্মক দোষ। ইহা ক্রোধ হতে উৎপন্ন হয় যদি কেউ ধন সম্পদ

Dhaka University Institutional Repository

বা সুখ শান্তির অধিকারী হয় এবং তাতে অন্য কারো মনে যদি এরূপ অসন্তোষ জন্মে যে, তিনি প্রত্যাশা করেন তার ধন-সম্পদ বিনষ্ট হউক; সুখ-শান্তি তিরোহিত হউক; তবে তা হবে ঈর্ষা। এরূপ ঈর্ষা হারাম। কেননা কারও প্রতি ঈর্ষা পোষণ করার অর্থ আল্লাহ্তায়ালার বিধানের প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়া, তাঁর বন্টন নীতিকে ঘৃণার চোখে দেখা এবং আন্তরিকতার সাথে সেই নীতির প্রতি আস্থা স্থাপনে ব্যর্থ হওয়া। মহানবী (স.) বলেছেন, 'আগুন যেমন শুষ্ক কাঁঠকে পুড়ে ভস্মিভূত করে ফেলে ঈর্ষা মানুষের নেক কার্যগুলোকেও সেইরূপ বিনষ্ট করে।' তিনি আরো বলেন- 'ছয় প্রকারের লোক বিনা বিচারে দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে।'[৬৮] এর মধ্যে অন্যতম হলো বিদ্বান বা আলেম ঈর্ষা পরায়ণ লোক। ধর্ম পথে চলার জন্য প্রত্যেক সালেককে ঈর্ষা ত্যাগ করা উচিত। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্ প্রেমিকের লক্ষণ হলো তিনি আল্লাহ্র সৃষ্টি জীবের মঙ্গল কামনা করেন এবং আল্লাহ্র বিধানের প্রতি সর্বাবস্থায় সন্তুষ্ট থাকেন। কিন্তু ঈর্ষাকারী আল্লাহ্র সৃষ্টিজীবরে অকল্যাণ কামনা করেন, যা তাঁর বিধানের বিরোধিতা করার নামান্তর। সুতরাং আল্লাহ্র মহব্বত লাভের জন্য ঈর্ষা ত্যাগ করা একান্ত প্রয়োজন।

ঈর্ষার জ্ঞানমূলক চিকিৎসা হলো এ কথা স্মরণ করা যে, ঈর্ষা ইহকালে এবং পরকালে একমাত্র ঈর্ষা পরায়ণ ব্যক্তিরই ক্ষতি করে। অন্যদিকে ঈর্ষার কর্মানুষ্ঠানমূলক দিক হলো, ঈর্ষার কারণসমূহ দূর করা। ঈর্ষার মূল কারণ অহংকার, আত্মাভিমান, শত্রুতাভাব, মান-মর্যাদা লাভের মোহ, ধন-সম্পদের লালসা প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তি। ঈর্ষা দূর করার জন্য এই কারণগুলো সর্বপ্রথম দূর করতে হবে। অতঃপর ঈর্ষা যাতে পুনরায় অন্তরে প্রবেশ করতে না পারে তজ্জন্য প্রথমত: যে ব্যাপারে অন্তরে ঈর্ষার উদয় হয় তার বিপরীত কাজ করতে হবে; দ্বিতীয়ত কারও প্রতি অন্তরে ঈর্ষার উদয় হলে ঈর্ষিত ব্যক্তির অগোচরে তার প্রশংসা করতে হবে।

(৭) অতিভোজন স্পৃহা দূরীকরণ: মানব হৃদয়ে যত প্রকার স্পৃহা রয়েছে, তার মধ্যে ভোজন স্পৃহা সবচেয়ে প্রবল। প্রকৃতপক্ষে ইহা সর্ববিধ লিপ্সার মূল। কেননা উদর পরিতৃপ্ত হলেই কামরিপু মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। ভোজন স্পৃহা ও কাম রিপুকে তৃপ্ত করতে হলে অর্থের প্রয়োজন দেখা দেয়। আবার লোক সমাজে নিজের প্রভাব- প্রতিপত্তি না থাকলে অর্থের সমাগম হয় না; তাই ধন সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে প্রভাব-প্রতিপত্তির লিপ্সা জন্মে থাকে। পুনরায় নিজের ধন-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি রক্ষা করার জন্য মানুষের সাথে বিবাদ

Dhaka University Institutional Repository

বিসংবাদে ও সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয়। তাই সংঘর্ষ বা বিবাদ বিসংবাদ হতে আবার হিংসা, দ্বেষ, শত্রুতা, অহংকার ইত্যাদি জঘন্য দোষসমূহের উদ্ভব হয়। তাছাড়া অতিভোজনে হৃদয়ের সদ্‌গুণাবলী বিনষ্ট হয়; চিন্তাশক্তি, কল্পনাশক্তি বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়; ইবাদত ভারবহ হয়; সর্বোপরি হৃদয়ের মারিফাত জ্ঞান ধারণ করার শক্তি হ্রাস পায়। পক্ষান্তরে ভোজন স্পৃহাকে কমিয়ে ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করতে অভ্যস্ত হলে সেই উদর আবার যাবতীয় পূণ্য ও কল্যাণের উৎস হিসেবে পরিগণিত হয়। কেননা ক্ষুধা প্রবৃত্তি দমনের প্রধান হাতিয়ার এবং এর প্রভাবে আত্মা নির্মল ও উজ্জ্বল হয়ে উঠে। ফলে আল্লাহ্‌তায়ালার যিকর ও মুনাযাতের প্রকৃত স্বাদ গ্রহণ করতে সালেক সক্ষম হয়। তাই মহানবী (স.) বলেন, 'ক্ষুধ' তৃষ্ণা সহ্য করা অপেক্ষা অন্য কোন কার্য আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট অধিক প্রিয় নয়।' কাজেই আত্মশুদ্ধি তথা আল্লাহ্‌র মহব্বত লাভ করার জন্য অত্যধিক ভোজন স্পৃহা ত্যাগ করে কেবল শরীর ঠিক রাখার জন্য ভোজন করা প্রয়োজন। অর্থাৎ উদরের এক তৃতীয়াংশ আহার দ্বারা, এক তৃতীয়াংশ পানি দ্বারা পূর্ণ করা এবং এক তৃতীয়াংশ খালি রাখা শ্রেয়।

(৮) অতিরিক্ত কথনের লোভ এবং রসনার আপদ দমন: মানব জীবনের উপর রসনার ক্ষমতা আত্মার ন্যায় অসীম। মানুষ যেই প্রকার শব্দ ও বাক্য রসনার সাহায্যে উচ্চারণ করে, তদানুরূপ একটি ভাব বা অবস্থা অন্তকরণে উৎপন্ন হয়। মিথ্যা, কটু, অশ্লীল বাক্য, পরনিন্দা ইত্যাদি উচ্চারণ করলে অন্তঃকরণ যেমন মলিন ও অন্ধকার হয়ে যায় তেমনি সত্য কথা বললে হৃদয় উজ্জ্বল হয়ে উঠে। রসনার বিপদসমূহ হচ্ছে-বাহুল্য কথা, অসত্য বিষয়ে অনার্থক বাক্য ব্যয়, মিথ্যাভাষণ, পরনিন্দা, ঝগড়া ও বিবাদ-বিসম্বাদ, অশ্লীল বাক্য, অপরকে অভিশাপ দেওয়া, হাস্য কৌতুক, উপহাস ও ব্যঙ্গ বিদ্রুপ, গুপ্ত কথা প্রকাশ, মিথ্যা অঙ্গীকার, চোগলখোরী ও কানকথা, মুনাফিকি, প্রশংসা করা ইত্যাদি। মানুষের অধিকাংশ পাপই রসনা তথা জিহ্বা হতে উৎপন্ন হয়।তাই যে বাক্‌শক্তিকে শাসন করতে সক্ষম হবেন তিনি মুক্তি লাভ করবেন। (আল হাদীস) রসনার আপাদসমূহের মধ্যে অন্যতম হল মিথ্যা ভাষণ এবং গিবৎ। মিথ্যা কথা কবিরা গুণাহ্‌। মিথ্যা ও বক্রোক্তি করলে মানুষের অন্তর অমসৃণ দর্পণের ন্যায় বন্ধুর ও অসমতল হয়ে যায়, আর বেদআত বিষয়ে আলোচনা করলে হৃদয় কঠিন হয়ে পড়ে এবং বাহুল্য কথায় সময় অপচয়ের জন্য পাপী হতে হয়। তাছাড়া মিথ্যাবাদীদের হৃদয় ফলক অমসৃণ ও অসমতল বলে তাতে পদার্থসমূহের সঠিক আকৃতি প্রতিফলিত হয় না বিধায়, এরা পরকালে সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ আল্লাহ্‌র দর্শন হতে বঞ্চিত হবে এবং তাদের নিকট পরলোকে

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ্তায়ালার দর্শন এবং পারলৌকিক যাবতীয় বিষয় বিকট ও ভয়ঙ্কররূপে প্রতিফলিত হবে। বস্তুত অতিরিক্ত কথন আল্লাহ্র ধ্যান, যিকির ইত্যাদি থেকে সালেককে দূরে রাখে। ফলে সে আল্লাহ্র একনিষ্ঠ অনুরাগী হতে পারে না। কাজেই আল্লাহর মহব্বত লাভের জন্য অতিরিক্ত কথা বলার ইচ্ছা ত্যাগ করতে হবে।

আত্মশুদ্ধির জন্য রসনার অপরিসীম আপদের কথা স্মরণ করত সর্বপ্রকার বাহুল্য কথা ত্যাগ করতে হবে। ইহা হল বাহুল্য কথা দূরীকরণের জ্ঞানমূলক চিকিৎসা। অন্যদিকে কর্মানুষ্ঠানমূলক চিকিৎসা হল যেসব কারণে পরনিন্দার চর্চা অনুপ্রাণিত হয় তা নির্ণয় করে প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৯) ধনাসক্তি দূরীকরণ: পার্থিব বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে ধনাসক্তি সর্বপ্রধান বিপদ। আল্লাহ্তায়ালা ধনাসক্তিকে দুরতিক্রম্য ঘাটি বা পার্বত্য দুর্গম পথ বলে অভিহিত করেছেন। ইহা একটি কঠিন পরীক্ষা স্বরূপও বটে। কারণ ধন-সম্পদ জীবন ধারণের উপায় এবং পরকালের সম্বলও বটে। এর উপকার এবং অপকার উভয় দিকই রয়েছে। বস্তুত ধন-সম্পদ কালো সর্পের ন্যায়, তাতে বিষও আছে আবার বিষ অপহারক মহোপকারী অমৃতও রয়েছে। কিন্তু যে ব্যক্তি বিষ হতে অমৃতকে পৃথক করতে অক্ষম তার ধ্বংস অবধারিত। তাই ধনের অপকারিতা সম্পর্কে মহান আল্লাহ্তায়ালা বলেন, "তোমাদের ধন-দৌলত এবং সন্তান সন্ততি যেন তোমাদিগকে আল্লাহ্তায়ালার যিকর হতে বিরত না রাখে। যারা বিরত থাকবে, নিশ্চয়ই তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।"[৬৯] কাজেই ঈমান বিনষ্টকারী অপরিমিত ধনলিপ্সা ত্যাগ করে অভাব মোচনের জন্য পরিমিত ধনোপার্জনের চেষ্টা করা উচিত। ধনাসক্তি ও প্রেমাসক্তি পরস্পর বিরোধী বিধায় একই সময়ে একই হৃদয়ে থাকতে পারে না। অর্থাৎ যে হৃদয়ে ধনাসক্তি থাকে সে হৃদয়ে আল্লাহ্র যিকির থাকেনা তাই ধনলিপ্সাকে ছিন্ন করতে না পারলে উক্ত হৃদয়ে প্রেমাসক্তি জন্মে না। ধনলিপ্সার বিপরীত হলো দরিদ্রতা অবলম্বন। প্রেমাসক্তি সৃষ্টির জন্য দরিদ্রতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। কারণ ধনলিপ্সা সর্বদা মানুষকে পাপের দিকে আকর্ষণ করে অন্যদিকে দরিদ্রতা কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়ে এবং পাপ পথ হতে ফিরাতে চেষ্টা করে।

ধনাসক্তির পরিপূরক মানব হৃদয়ের অন্য আরেকটি কুপ্রবৃত্তি হলো সংসারাসক্তি বা দুনিয়ার প্রতি মহব্বত। সাধরণত মৃত্যুর পূর্ববর্তী অবস্থার নাম দুনিয়া। শরীয়তের পরিভাষায় দুনিয়া সেই অবস্থার নাম, যা আখেরাতের অন্তরায়।

Dhaka University Institutional Repository

অতএব যে অবস্থা আখেরাত অর্জনের অন্তরায়; তা কথাবার্তাই হোক কিংবা কার্যকলাপ অথবা আকীদা, জ্ঞান কিংবা ধন-সম্পত্তি হোক তা সবই হারাম এবং ঘৃণিত দুনিয়ার অন্তর্গত। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্তায়ালা সমগ্র দুনিয়াকে পাঁচটি দ্রব্যের মধ্যে একত্রিত করেছেন। আল্লাহ্তায়ালা বলেন; "নিশ্চয়ই মানুষের নিকট শোভনীয় করা হয়েছে কামনার বস্তুসমূহের, স্ত্রীগণের, সন্তানগণের, রাশিরাশি স্বর্ণরৌপ্যের, উৎকৃষ্ট অশ্বরাজির (উট, গরু, ছাগল প্রভৃতি) গবাদি পশুর এবং শস্য ক্ষেত্রের মায়া মহব্বত; এ সমুদয় মানুষের দুনিয়ার উপকরণ।"[১০] আর দুনিয়ার যাবতীয় ঝামেলা ঝঞ্ঝাট, সৃষ্টিরাজী, বস্তুসামগ্রী ও বিষয় সম্পত্তির সহিত সম্পর্ক রাখার নাম দুনিয়ার মহব্বত। এই দুনিয়া সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন; "আমি দুনিয়ার সমস্ত বস্তুনিচয়কে ভূপৃষ্ঠের সৌন্দর্যের উপকরণ ও সামান হিসেবে সৃষ্টি করেছি, যদ্দ্বারা আমি মানবকুলকে পরীক্ষা করতে পারি যে, কারা ইহার আসক্ত হয়ে আখেরাত বিনষ্ট করে। আর কারা প্রয়োজন পরিমাণ সফরের পাথেয় সংগ্রহ করে আখেরাতকে সুসজ্জিত করে।" বস্তুত দুনিয়ার মহব্বত সমস্ত পাপাচার ও সর্বনাশের মূল। ইহা আল্লাহ্র শত্রু, তাঁর বন্ধুগণের শত্রু, এমনকি তাঁর শত্রুগণেরও শত্রু। আল্লাহ্র নিকট দুনিয়া মৃত প্রাণীর (বকরীর) চেয়েও ঘৃণিত। কাজেই যাদের আল্লাহ্তায়ালার প্রতি বিশ্বাস নেই কেবল তারাই দুনিয়ার ধন সম্পদ অন্বেষণ করতে পারেন। হযরত ঈসা (আ:) বলেন যে, অগ্নি এবং পানি যেমন একপাত্রে থাকতে পারে না, তদ্রুপ দুনিয়ার প্রতি আসক্তি এবং পরলোকের ভালবাসা একই অন্তরে থাকতে পারে না। অর্থাৎ যে সংসারে অনাকৃষ্ট, সেই আল্লাহ্র ভালবাসার পাত্র। সুতরাং ঐশী প্রেম লাভের জন্য দুয়ির প্রতি আসক্তি ত্যাগ করে, শুধু অভাব মোচনের জন্য দুনিয়ার প্রতি যতটুকু সংশ্লিষ্টতা রাখা প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই বজায় রাখা উচিত।

(১০) যশ-খ্যাতি বা মান-মর্যাদার আকাঙ্ক্ষা দূরীকরণ: কারো দ্বারা অপর লোকের অন্তর বশীভূত হলে এবং মানুষের হৃদয়ের উপর তার আধিপত্য চললে তাকে প্রতিপত্তিশালী বলা হয়। ভক্তি শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়ে কারও অন্তর বশীভূত হয়ে পড়লে শ্রদ্ধাকারীর দেহ এবং ধন-সম্পদ সেই শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়ে। কারও প্রতি শ্রদ্ধাভাব জন্মাবার কারণ হচ্ছে তার অসাধারণ গুণ, জ্ঞান, ধর্মপরায়ণতা কিংবা সৎ স্বভাব কিংবা তার এমন সব কার্য যাকে বুযুর্গী বা মহৎ গুণ বলে মনে হয়। যশ-খ্যাতি ও মান মর্যাদার মোহ এমন একটি বাতেনী রোগ যা অবগত হওয়া খুবই কঠিন। এই যশ-খ্যাতি ও মান মর্যাদার মোহই মানুষের ঝগড়া-বিবাদ এবং নানাবিধ পাপ কার্যের মূল।

Dhaka University Institutional Repository

ইহা দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ের জন্য ক্ষতিকর। রাসূল (স.) বলেছেন, 'মান মর্যাদা ও ধন-সম্পদের মোহ মানব হৃদয়ে কপটতাকে এমনভাবে উৎপন্ন করে থাকে, যেমন জমিনের মধ্যে তৃণলতা উৎপন্ন হয়।' কাজেই তরিকতের পথযাত্রী সালেকের আল্লাহ্‌র মহব্বত লাভের জন্য অত্যধিক যশ-খ্যাতির ইচ্ছা ত্যাগ করে ঐ পরিমাণ প্রভুত্ব ও প্রতিপত্তি লাভে প্রয়াসী হওয়া উচিত, যা তার প্রয়োজনীয় কাজে অন্যের সাহায্যে ও সহযোগিতা পাবার জন্য প্রয়োজন। তাকে সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে, বড়ত্ব, প্রভুত্ব এবং মর্যাদার একমাত্র অধিকারী আল্লাহ্। পার্থিব জীবনে এর জন্য লালায়িত হওয়া তাঁর সাথে শিরক করার নামান্তর এবং হইতা হবে তাঁর মহব্বত লাভের অন্তরায় স্বরূপ। তবে আল্লাহ্‌তায়ালার পক্ষ হতে বিনা অন্বেষণে মান-সম্মান হাসেল হলে তা হবে আল্লাহ্‌পাকের নেয়ামত।

মান-মর্যাদা লিপ্সার জ্ঞানমূলক চিকিৎসা হলো এর অপকারিতার দিকগুলো স্মরণ করে অত্যধিক যশখ্যাতি ও মান-মর্যাদার লিপ্সা ত্যাগ করা। অন্যদিকে কর্মানুষ্ঠানমূলক চিকিৎসা হলো পরিচিত স্থান থেকে অপরিচিত স্থানে বসবাস করা এবং নিজেকে অবজ্ঞা ও তিরস্কারের পাত্র হিসেবে পরিগণিত করা।

হৃদয়ের মধ্যে আল্লাহ্‌র মহব্বতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার মানুষে সালেককে পীরের অধীনে মহব্বত লাভের পথের প্রতিবন্ধক স্বরূপ উপর্যুক্ত ধ্বংসকর মন্দস্বভাবসহ যাবতীয় কুপ্রভৃত্তি দূর করতে হবে। আর ইহা হলো মহব্বত রূপ বীজ বপনের জন্য হৃদয় ক্ষেত্রের আগাছা পরিষ্কারকরণ সদৃশ। অতঃপর সালেককে মহব্বতের বীজ বপনে প্রয়াসী হতে হবে।

৫.২.২ অর্জনযোগ্য সদ্‌গুণ; যা ঐশী প্রেমের জন্য অপরিহার্য

আল্লাহ্‌র মহব্বত লাভের জন্য মানবহৃদয়ের ধ্বংসাত্মক মন্দস্বভাব গুলো দূর করে সূফী জীবনের মহান আদর্শ-- আল্লাহ্‌তায়ালার নৈকট্য ও গভীর ভালবাসা অর্জনের জন্য সূফী শেখের অধীনে সাধনার মাধ্যমে পরিত্রাণকর সদ্‌গুণগুলো ক্রমান্বয়ে অর্জন করতে হবে। এই পরিত্রাণ কর সদ্‌গুণ হলো অসংখ্য। এর মধ্যে মূল সদ্‌গুণ গুলো হলো দশটি।[১১] যথা-১ তওবা; ২ সবর; ৩ আল্লাহ্‌র বিধানে সন্তোষ (শোকর); ৪ কৃতজ্ঞতা; ৫ খোদাভীতি; ৬ আল্লাহ্‌র রহমতের আশা; ৭ সংসার বৈরাগ্য; ৮ ইখলাস; ৯ সকল মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার; ১০ মহব্বত। ইমাম গযালী আরো কতকগুলো পরিত্রান কর সদ্‌গুলোর উল্লেখ করেন। এ গুলো হলো দরিদ্রতা, নিয়ত, সিদ্‌ক মুহাসাবা ও

Dhaka University Institutional Repository

মুরাকাবা ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে এই গুণগুলোকে বলা হয় এক একটি স্তর (Station)। প্রত্যেকটি স্তর আবার তিনটি উপাদানে গঠিত। যথা- এলেম, হাল ও আমল। অন্যকথায় জ্ঞান অবস্থা এবং কর্মানুষ্ঠান। এই মূলত্রয়ের মধ্যে জ্ঞান হলো আদিমূল। হৃদয়ের মধ্যে ধর্ম পথের কোন স্তর সম্পর্কে জ্ঞানের উদয় হলে এক প্রকার অবস্থার উৎপত্তি হয়। সেই অবস্থাই হৃদয়কে সৎ কার্যের প্রতি প্রেরণা প্রদান করে।

(১) তওবা: পাপ কার্য হতে অনুতাপের সাথে তওবা করে আল্লাহ্তায়ালার নির্ধারিত সৎ পথের দিকে ফিরে আসা আধ্যাত্মিক উন্নতিকামী পথিকবৃন্দের প্রাথমিক পদক্ষেপ। কোন প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে পাপ কার্য করলে লজ্জিত ও অনুতপ্ত চিত্তে অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনাকে তওবা বলে। অর্থাৎ অতীতের গুণাহ্ বা পাপ কার্যের কথা স্মরণ করে অন্তরে অনুতাপ-অনুশোচনা সৃষ্টি হওয়া এবং সেই পাপ বর্জন করা, ভবিষ্যতে এই পাপ না করার জন্য দৃঢ় সংকল্প করা এবং মনে এই কাজের ইচ্ছা হলে নফসকে বিরত রাখাকেই তওবা বলে। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সূফী সহল তশতরী (রহ:) বলেছেন যে, তওবার প্রথম পর্যায়ে ধর্মের ডাকে সাড়া দেওয়া, দ্বিতীয় পর্যায়ে সবকিছু ছেড়ে আল্লাহ্র দিকে রুজু হওয়া, কৃত কর্মের অনুতাপ করে আল্লাহ্র অস্তিত্বের কাছে নিজের অস্তিত্ব বিলীন করা; নিজ অপরাধসমূহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা।[৭২] আল্লাহ্তায়ালা তওবার ফযিলত সম্পর্কে বলেন: "হে মুমিন গণ! তোমরা সকলে আল্লাহ্র সমীপে তওবা কর। নিশ্চয়ই, তোমরা সফলতা লাভ করবে।"[৭৩] এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি পাপ কাজ করে তওবা করে সে ব্যক্তি এমন নিষ্পাপ হয়ে যায় যেন সে পাপ কার্য করেই নাই।' তওবা শুধু বান্দার পাপই মোচন করে না বরং ইহা বান্দার মর্যাদাকে আল্লাহ্র নিকট উত্তর উত্তর বৃদ্ধি করে। তাই প্রেমিক এক মুহূর্তের জন্যও আল্লাহ্কে ভুলে না; এমনকি সামান্য সময়ের কোন অপচয় হলেও অনুতপ্ত হৃদয়ে তার জন্য তওবা করে।

401594

তওবার ভিত্তি হলো ঈমান এবং মারিফাত। সূফী সাধনায় রত মুরিদের তওবা করার জন্য প্রথমে পাপের কুফল সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। এ জ্ঞান অর্জন করার ফলে ব্যক্তির মনে একটি অবস্থার সৃষ্টি হবে। এ অবস্থায় ব্যক্তি অনুশোচনা করবে এবং অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্র দরবারে ক্ষমার জন্য কান্নাকাটি করবে এবং ভবিষ্যতে না করার জন্য দৃঢ় সংকল্প হবে। পাপাচারী যখন বুঝতে পারে যে প্রবৃত্তির তাড়নায় সে যে সমস্ত পাপ কার্য করেছে তার জন্য তাকে ভয়ানক শাস্তি ভোগ করতে হবে, তখন তজ্জনিত অনুতাপ তাকে সর্পের ন্যায়

Dhaka University Institutional Repository

দংশন করতে থাকে। এই অনুতাপ লজ্জা ও ভয়ের অগ্নি তার অন্তরের মধ্যে তীব্র জ্বালার সৃষ্টি করে তাকে নিতান্ত অধীর করে তুলে। পরিশেষে উক্ত কামনা ও লোভ অনুশোচনায় ও অনুতাপে রূপান্তরিত হয়, তখন সে অতীত পাপ সংশোধনে ও তজ্জনিত ক্ষতি পূরণে ব্যস্ত হয়ে পড়ে এবং পূনরায় পাপ পথে পা না বাড়াবার দৃঢ় সংকল্প করে। কাজেই কুপথের অন্ধকার হতে সুপথের আলোতে প্রত্যাবর্তন করার সংকল্পই তওবা।

(২) সবর: সাধারণত বিপদ-আপদ, দুঃখ-কষ্ট ধীরভাবে সহ্য করাকে সবর বলে। কিন্তু শরীয়তের পরিভাষায় সবর শব্দের অর্থ অনেক ব্যাপক। ভোগের আকাঙ্ক্ষা, প্রাপ্তির লোভ, কামের উত্তেজনা, প্রবৃত্তির দংশন তাড়নায় অবিচলিত থাকা এবং আনন্দের উচ্ছ্বাস ও সুখের সমাগমে আত্মহারা না হয়ে অটলভাবে স্বাভাবিক অবস্থায় স্থির থাকার শক্তিও সবরের অন্তর্গত। মহানবী (স.) বলেছেন, 'সবর ঈমানের অর্ধেক।' কাজেই সবর শরীয়তের যাবতীয় আমলের উপর প্রযোজ্য। অর্থাৎ শরীয়তে যখন যেভাবে যে কাজের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তখন সেভাবে সেকাজের উপর দৃঢ়পদ থাকার নামই সবর।

আল্লাহ্‌র মহব্বত লাভের জন্য সবরের গুরুত্ব অপরিসীম। ধৈর্যশীলতা আল্লাহ্‌র স্বভাব। তাই তিনি সবরকারীদের ভালবাসেন (আল-হাদীস) এবং সর্বাবস্থায় সাবেরদের (ধৈর্যশীলদের) সঙ্গে থাকেন।[১৪] শান্তি, রহমত এবং হেদায়েত এই ত্রিবিধ অমূল্য নেয়ামত। করুণাময় আল্লাহ্‌তায়ালা কেবল সাবেরদিগকে এক সঙ্গে দান করেন।[১৫] সাবেরের পুরস্কার আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বিনা হিসেবে প্রদান করবেন।

সবর হাসিল করার উপায়: আল্লাহ্‌র মহব্বত লাভের জন্য প্রবৃত্তির অনুকুল ও প্রতিকুল উভয় প্রকার কার্যে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। ধৈর্য ধারণ করার জন্য সালেকের ধৈর্য ধারণ করলে কি সুফল ও ধৈর্য ধারণ না করলে কি কুফল সে সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে হবে। ফলে তার মধ্যে এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হবে যে তখন সে বিভিন্ন কুকাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবেন এবং ধৈর্য ধারণ করে বিভিন্ন শারীরিক কাজ করবেন। কাজেই জ্ঞান এবং কর্মানুষ্ঠান উভয়ের অনুশীলনের মাধ্যমেই সবর করা সম্ভব। যেমন কোন ব্যক্তির কামভাবের উদ্রেক হলে তাকে ধৈর্য ধারণের জন্য প্রথমে কামভাবকে জ্ঞানমূলকভাবে নিবৃতির জন্য সচেষ্ট হতে হবে। অর্থাৎ কামের সুফল ও কুফলগুলো অন্তরে

Dhaka University Institutional Repository
স্মরণ করতে হবে। এভাবে যদি কামরিপু দমন না হয় তবে কামভাব জাগ্রত হবার কারণগুলোকে কর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে দুর্বল করে দিতে হবে।

(৩) শোকর: শোকর অর্থাৎ কৃতজ্ঞতা জ্ঞান হলো হৃদয়ের একটি উন্নততর অবস্থা। ইহা স্পর্শমণি স্বরূপ অতি মূল্যবান বস্তু, যা খোদাতায়ালার বড়ই পছন্দনীয়। তাই আহারে-বিহারে, শয়নে-জাগরণে, সম্পদে-বিপদে, প্রভুর গুণগান ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা প্রেমিকের কার্য। কেননা মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে মহান আল্লাহ্তায়ালা সন্তুষ্ট হন এবং তার প্রতি অধিকতর নেয়ামত বর্ষণ করেন। সুতরাং প্রত্যেক মানুষের আল্লাহ্র অনুগ্রহ প্রাপ্তির জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। ধর্ম পথের অন্যান্য স্তরের মতো শোকরেরও তিনটি পর্যায় রয়েছে। যথা- জ্ঞান, অবস্থা এবং অনুষ্ঠান বা আমল।

কৃতজ্ঞতামূলক জ্ঞানের পরিচয়: সর্ববিধ নেয়ামত অর্থাৎ সুখ-সম্পদ, প্রকৃত নেয়ামত আল্লাহ্তায়ালার তরফ হতে পাওয়া গেছে বলে উপলব্ধি করাই হলো শোকর বা কৃতজ্ঞতার মূল জ্ঞান।

শোকরের অবস্থার পরিচয়: কৃতজ্ঞতার জ্ঞান অন্তরে উৎপন্ন হলে ভক্তের হৃদয় যে এক অপূর্ব আনন্দে আপ্লুত হয়ে উঠে তাকে শোকরের হাল বা অবস্থা বলে। উল্লেখ্য যে তিনটি কারণে মানুষ নেয়ামত বা দান প্রাপ্ত হলে আনন্দিত হয়।

(ক) নেয়ামত প্রাপ্তিতে তার অভাব দূরীভূত হয় বিধায় সে আনন্দিত হয়।

(খ) নেয়ামতদাতা তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে নেয়ামত দান করেছেন এবং ভবিষ্যতে আরও দিতে পারেন বিধায় সে আনন্দিত হয়।

(গ) প্রাপ্ত নেয়ামতের সাহায্যে নেয়ামতদাতার সান্নিধ্য লাভ করা সম্ভব। তাই সে যথাসাধ্য চেষ্টা ও যত্নের সাথে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনে ও এবাদত কার্যে মশগুল হয় এবং প্রকৃত নেয়ামতদাতা আল্লাহ্তায়ালার সান্নিধ্য লাভের অন্বেষণে প্রয়াসী হয়। আর ইহাই হলো পূর্ণ শোকর। কেননা এই শ্রেণীর আনন্দ কখনই প্রাপ্ত নেয়ামতের জন্য কিংবা আরও অধিক নেয়ামত প্রাপ্তির আশা হতে উৎপন্ন হয় না; বরং উহাতে কেবল আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভের সুযোগ ঘটে বিধায় হৃদয়ে আনন্দ জন্মে।

শোকর অনুষ্ঠানের পরিচয়: শোকর অনুষ্ঠান (১) অন্তর; (২) মুখ এবং (৩) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এই ত্রিবিধ উপায় হতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

শোকর হাসিল করার উপায় : আল্লাহ্পাকের নেয়ামত সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করা, স্মরণ করা এবং সকল নেয়ামত আল্লাহ্র তরফ হতে এসেছে মনে করা শোকর হাসিলের উপায়। ইহাতে ধীরে ধীরে আল্লাহ্পাকের মহব্বত পয়দা হবে এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পরিপূর্ণ স্তর লাভ হবে।

(৪) আশা: ভবিষ্যৎ মঙ্গল কামনাকে রেজা বা আশা বলে। কিন্তু কোন কোন সময় এই ভবিষ্যৎ মঙ্গল কামনাতেই মানুষ অসম্ভব আকাঙ্ক্ষা করে ধোঁকায় পতিত হয় এবং বোকামিও করে থাকে। নির্বোধ লোকেরা ইহাদের পার্থক্য বুঝতে পারে না এবং সবগুলোকেই আশা বলে মনে করে। অথচ ইহা ঠিক নয়। আশা একটি প্রশংসনীয় মানসিক গুণ। যে কাজের বা যে বিষয়ের উপকরণসমূহ সংগ্রহ করা মানুষের আয়ত্তে, সে সমস্ত কার্যের বা বিষয়ের যাবতীয় উপকরণ পূর্ণরূপে সংগ্রহ করে, নিজের কর্তব্য সমাধা করার পর আল্লাহ্তায়ালার দরবারে ফল প্রদানের জন্য প্রত্যাশী থাকাই প্রকৃত রেজা বা প্রশংসনীয় আশা। কিন্তু আসবাব ও উপকরণ সংগ্রহ না করে কিংবা বৃথা নষ্ট করে ফলের প্রত্যাশা করে বসে থাকা ভ্রান্ত আশা বা বোকামি।

আশার ফযিলত আপরিসীম। শাস্তির ভয়ে আল্লাহ্র ইবাদত করা অপেক্ষা তাঁর সন্তুষ্টি লাভের আশায় তাঁর ইবাদত করা উত্তম। কেননা আশা হতে মহব্বত ও ভালবাসার উৎপন্ন হয়। আর আল্লাহ্তায়ালার মহব্বত অন্তরে উৎপন্ন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উন্নততর জিনিষ জগতে আর কিছুই নেই। তাই মহানবী (স.) বলেছেন: তোমাদের প্রত্যেকের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য কর্তব্য আল্লাহ্তায়ালার প্রতি অন্তরে সদ্ভাব ও ভালবাসা উৎপন্ন করে ইহলোক ত্যাগ করা।

আশা হাসিলের উপায়: দ্বিবিধ উপায়ে আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহ লাভের প্রকৃত আশা মানব হৃদয়ে উৎপন্ন হতে পারে।

প্রথমত: বিশ্বস্রষ্টা মহা-করুণাময় আল্লাহ্তায়ালার করুণার প্রবাহ বিশ্বের সর্বক্ষেত্রে ও সর্বপাত্রে সর্বদা অবধারিতভাবে বহিতেছে: এ কথাটি মানুষ উত্তমরূপে বুঝতে পারলে করুণাময়ের করুণা প্রাপ্তির আশা হৃদয়ে প্রবল হয়ে উঠতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয়ত : আল্লাহ্‌র রহমতের আশা অন্তরে পোষণ করা সম্বন্ধে কুরআনে যে সকল আয়াত[১৮] এবং হাদীস রয়েছে তদসমূহের মর্মের প্রতি গভীর দৃষ্টি রাখলে হৃদয়ে উক্ত প্রশংসনীয় আশা উৎপন্ন হতে পারে।

(৫) ভয়: ভয় আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের পথে মানব হৃদয়ের একটি উন্নত অবস্থা। ভয় মনোকষ্টের একটি অবস্থার নাম। ইহা হৃদয়ে উত্তপ্ত অগ্নি সদৃশ। অর্থাৎ ভবিষ্যতে কোন অপ্রিয় ঘটনার (আযাবের) আশঙ্কায় অগ্নি দহন সদৃশ মনের অবস্থাকেই ভয় বা ভীতি বলে। শরীয়তের পরিভাষায় ভয় হলো আযাবের আশঙ্কা। ভয়ের ফযিলত সম্পর্কে রাসূল (স.) বলেছেন, 'আল্লাহ্‌তায়ালাকে ভয় করা সমস্ত হেকমতের শিরোমনি।' ভয়ের অগ্নি প্রবৃত্তি ও কামনাকে দগ্ধ করে যেরূপ ভস্মেপরিণত করতে পারে তেমন আর কোন বস্তুই করতে পারে না। এ কারণেই খোদাভীরু লোকের জন্য আল্লাহ্‌তায়ালা পথ প্রাপ্তি, অনুগ্রহ, জ্ঞান এবং সন্তোষ এই চতুর্বিধ অমূল্য বস্তু নির্ধারণ করেছেন।

ভয়ের উৎপত্তির যেমন কারণ রয়েছে তদ্রুপ ইহার বিশেষ ফল রয়েছে। মানুষ যখন ধর্ম পথে পারলৌকিক কার্যে কোন বিপদ-আপদ দেখতে পায় অথবা তার সম্মুখে নিজের ধ্বংস ও বিনাশের কোন কারণ প্রকটভাবে উপস্থিত হয়, তখন অনিবার্যভাবে তার হৃদয়ে ভয়ের আগুন জ্বলে উঠে। ইমাম গায্‌যালীর মতে, 'দু'প্রকার পরিচয় জ্ঞান হতে ভয়ের উৎপন্ন হয়।'

প্রথমত : মানুষ যদি স্বীয় পাপ, দোষ, ইবাদতের আপদ, স্বভাবের জঘন্যতা সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে পারে এবং সমস্ত দোষ ত্রুটি সত্ত্বেও নিজের প্রতি করুণাময়ের অপরিসীম করুণাসমূহের পরিচয় পায় তাহলে স্বভাবতই নিজের দোষ ত্রুটির জন্য অন্তরে আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি ভয়ের উৎপন্ন হয়ে থাকে।

দ্বিতীয়ত : মানুষ নিজের পাপ ও দোষত্রুটির প্রতি লক্ষ্য করত ভীত না হয়েও বরং আল্লাহ্‌র প্রবল প্রতাপ ও অপ্রতিহত শক্তির পরিচয় পেলে তার হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হয়। এই প্রকার ভয় পূর্বোক্ত ভয় অপেক্ষা পূর্ণ ও উৎকৃষ্ট।

ভয়ের অবস্থা ও প্রকাশ (আমল): ভয়ের ফল অন্তরে, শরীরে ও হস্তপদাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়ে থাকে। আল্লাহ্‌তায়ালার ভয় অন্তরে প্রকাশ পেলে সংসারাসক্তি ও ভোগ-বিলাসের কামনা অন্তর হতে লোপ পায়। কামনা ও বাসনার প্রতি তার কোন লক্ষ্যই থাকে না। সে সর্বান্ত:করণে আল্লাহ্‌তায়ালার ধ্যানে নিজের কৃতকর্মের হিসাব নিকাশে এবং পরকালের

Dhaka University Institutional Repository

চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে যায়। অহংকার, ঈর্ষা, লালসা, মোহ ইত্যাদি কুপ্রবৃত্তি কিছুই তখন তার মনে অবশিষ্ট থাকে না। সবকিছুই অন্তর হতে বিদূরীত হয়ে যায়। ভয় শরীরে প্রকাশ পেলে শরীর অবসন্ন, দুর্বল ও পাণ্ডুবর্ণ হয়ে পড়ে। তখন সে কখনও অজ্ঞান হয়ে পড়ে, কখনও চিৎকার করে বা ক্রন্দন করে উঠে। ভয় হস্তপদাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রকাশ পেলে সেগুলো আর পাপ কার্যের দিকে চলতে পারে না। শান্ত আকার ধারণপূর্বক আদবের সাথে ইবাদতে প্রবৃত্ত হয়ে যায়।

খোদাভীতি অন্তরে উৎপন্ন করার উপায়

নিম্নক্ত উপায়ে হৃদয়ে খোদাভীতি উৎপন্ন করা যেতে পারে:

প্রথমত: নিজের ও আল্লাহ্তায়ালার প্রকৃত পরিচয় জ্ঞান লাভ করা।

দ্বিতীয়ত: মানুষ যদি নিজের ও আল্লাহ্তায়ালার পরিচয় জ্ঞান অর্জন করতে অক্ষম হয় তবে নিজের হৃদয়ে খোদাভীতি উৎপন্ন করা সহজ উপায় হলো খোদাভীরু লোকের সহচার্য অবলম্বন করা এবং মোহমুগ্ধ সংসারাসক্ত লোকের সংসর্গ হতে দূরে থাকা।

তৃতীয়ত: খোদাভক্ত পরহেজগার লোকের সংসর্গ লাভের সুযোগ না পেলে মানুষের কর্তব্য ধর্মভীরু, খোদাভক্ত ও পরহেজগার লোকের জীবন চরিত্র পাঠ করা।

(৬) সংসার বৈরাগ্য: ধর্ম পথযাত্রীদের মাকামগুলোর মধ্যে সংসার বৈরাগ্য একটি সুউচ্চ মাকাম। এই মাকামও অন্যান্য মাকামের ন্যায় জ্ঞান, অবস্থা ও অনুষ্ঠান বা আমলের সমন্বয়ে গঠিত। তবে ইহা এরূপ অবস্থা, যা জ্ঞান ও অনুষ্ঠান এ দু'দিক থেকেই সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ কোন আগ্রহের বস্তু বর্জন করত তদাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তুর দিকে আকর্ষিত হওয়া তথা ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াকে বর্জন করত চিরস্থায়ী আখেরাতকে গ্রহণ করাকে যুহ্দ বা বৈরাগ্য বলে । সংসার বৈরাগ্যের জন্য এরূপ জ্ঞান থাকা দরকার যার দ্বারা উপলব্ধি করা যায় আখেরাত সংসারের চেয়ে অধিক উত্তম এবং চিরস্থায়ী। সংসার বিরাগী যখন অলভ্য বস্তুর প্রতি লিপ্সা না করে এবং যা নিজের নিট আছে ইহাও পরিত্যাগ করে: অন্তর হতে ইহার খেয়াল দূরকরে দেয় তখন আল্লাহ্র মেহেরবানীতে তার অন্তর দুনিয়ার প্রতি বিমুখ হয়ে পড়ে।

Dhaka University Institutional Repository

বৈরাগ্য ক্রয়-বিক্রয়ের এক ব্যবসায় এবং ইহার লাভ অপরিসীম। কেননা আল্লাহ্তায়ালা বলেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মুসলমানদের নিকট হতে তাদের প্রাণ এবং ধন বেহেশ্তের বিনিময়ে ক্রয় করেছেন।"[৭৭] এ প্রসঙ্গে হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেছেন, 'দুনিয়া পরিত্যাগকারী আলেমের দুই রাকাত নামাজ সমস্ত আবেদের কেয়ামত পর্যন্ত ইবাদতের চেয়ে আল্লাহ্র নিকট অধিক প্রিয় ও পছন্দনীয়।' প্রকৃত সংসার বিরাগী দুনিয়ার যেরূপ উদাসীন থাকেন, আখিরাতের (সুখ সম্ভোগের) প্রতিও তদ্রুপ উদাসীন থাকেন। তিনি আল্লাহ্ ব্যতীত ইহকাল ও পরকালের সুখ-সম্পদের কিছু চাহেন না এবং তার মারিফত ও দর্শন লাভ ভিন্ন অপর কোন পদার্থেই তিনি পরিতুষ্ট হন না। কাজেই আল্লাহ্ ব্যতীত ইহকাল ও পরকালে যাবতীয় পদার্থের অনুরাগ ও বিরাগ হতে উদাসীন থাকাই প্রকৃত সংসার বৈরাগ্য।

বৈরাগ্য থেকে যে আমল বা অনুষ্ঠান উত্থাপিত হয় তা হলো নিকৃষ্ট বস্তুকে ত্যাগ করে উৎকৃষ্ট বস্তুকে গ্রহণ করা। কাজেই বৈরাগ্যতার জন্য সম্পূর্ণভাবে ভালবাসার বস্তু ত্যাগ করা এবং পার্থিব ও সুখ-সম্পদের সম্পর্ক ছিন্ন করা আবশ্যক। এর ফলে সংসারে প্রতি ভালবাসা হৃদয় থেকে বের হয়ে যাবে এবং তৎপরিবর্তে ইবাদতের ভালবাসা প্রবেশ করবে। হৃদয় থেকে যা বের হয়ে যায়, চক্ষুদ্বয় ও হস্তদ্বয় থেকেও তা বের হয়ে যায়। অতঃপর চক্ষু, হস্ত ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর ইবাদতের কাজগুলো এসে পড়ে। অর্থাৎ ইন্দ্রীয়সমূহের মাধ্যমে সালেক কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্ট লাভের জন্য কর্ম সম্পাদন করবেন।

বৈরাগ্য হাসিলের উপায়: দুনিয়ার দোষ-ত্রুটি, ক্ষতিসমূহ, ইহার ক্ষণস্থায়িত্ব এবং আখেরাতের উপকারিতা ও স্থায়িত্ব স্মরণ করা এবং চিন্তা-ফেকের করা যুহ্দ বা বৈরাগ্য হাসিলের উপায়।

(৭) ইখ্লাস (বিশুদ্ধতা): একটি মাত্র উদ্দেশ্য বা প্রেরণাদায়ক মনোভাব যদি মানুষকে কার্যে প্রবৃত্ত করে তবে তাকে খালেছ বা খাঁটি নিয়ত বলে। তবে একের অধিক উদ্দেশ্য যদি মানুষকে উক্ত কার্যের প্রতি উদ্বুদ্ধ বা উৎসাহিত করে তবে সেই নিয়তকে খালেছ বা বিশুদ্ধ বলা যাবে না। উদাহরণস্বরূপ: সওয়াবের আশায় তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কোন ব্যক্তি যদি জাগ্রত থেকে চোর হতে ধন-সম্পত্তি পাহাড়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে রাত্র জাগরণ করে তবে তার নিয়ত খালেছ হবে না। কাজেই বিশুদ্ধ নিয়তযুক্ত নেক কাজ তাকেই বলা হয় যাতে নিজস্ব ব্যক্তিগত স্বার্থ লেশমাত্র থাকে না; বরং ইহা কেবল

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ্তায়ালার প্রসন্নতা লাভের উদ্দেশ্যেই করা হয়ে থাকে। যেমন রাসূলে মাক্বুল (স.)কে ইখলাছ কেমন পদার্থ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'মনে প্রাণে বলা যে, আল্লাহ্ আমার প্রভু এবং তৎপর আল্লাহ্র পক্ষ হতে যে আদেশ হয়েছে তাতে দৃঢ়পদ থাকা।' ইখলাছের ফযীলত সম্বন্ধে আল্লাহ্তায়ালা বলেন: 'আল্লাহতায়াল প্রতি ঈমান বা বিশ্বাসকে বিশুদ্ধ করে তারা ইবাদত করুক, ইহা ভিন্ন তাদেরকে আর কিছুই আদেশ করা হয়নি।'[৭৮] আল্লাহ্ আরও বলেন: 'একমাত্র খালেছ বা অকপট ধর্ম-কর্মই আল্লাহ্তায়ালার জন্য।' আবার হাদীসে কুৎসীতে আছে, আল্লাহ্তায়ালা বলেন: 'ইখলাছ আমার গূঢ় রহস্যসমূহের অন্যতম। যে বান্দাকে আমি ভালবাসি কেবল তারই অন্তরে এই গূঢ় রহস্য স্থাপন করে থাকি।' মানুষ যে পর্যন্ত স্বীয় প্রবৃত্তির অধীনতা হতে মুক্ত না হবে, সেই পর্যন্ত এই অবস্থা লাভ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। এই জন্যই বুযুর্গগণ বলেছেন, 'বিশুদ্ধ সঙ্কল্পের অবস্থা লাভ করার ন্যায় অধিক কঠিন ও দু:সাধ্য কার্য আর কিছুই নেই।' যদি সারাটা জীবনের মধ্যে অন্তত একটি কার্যও বিশুদ্ধ সঙ্কল্পে অকপট মনে সঠিকভাবে করা যায় তবুও মুক্তির আশা আছে।

ইখলাছের সাথে কার্য করার উপায়: ইখলাছের সাথে কার্য করা যদিও সুকঠিন তবুও মানুষ চেষ্টা করলে প্রবৃত্তির প্রভাব হতে মুক্ত হয়ে ইখলাছের সাথে নিষ্কলঙ্ক সৎকার্য সম্পন্ন করতে পারে। সংসারের সকল আসক্তি ছিন্ন করত আল্লাহ্র মহব্বতে তন্ময় হয়ে প্রেমোন্মত্ত ব্যক্তির ন্যায় আল্লাহ্তায়ালার প্রসন্নতা লাভের জন্য পাগল হয়ে পড়াই ইখলাছের সাথে কার্য সম্পাদনের একমাত্র উপায়। কারণ প্রেমোন্মত্ত ব্যক্তি যা কিছু করে প্রেমাস্পদের অনুকম্পা ও দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই করে থাকে। একইভাবে সংসারের মোহাচ্ছন্নতা কাটিয়ে যে ব্যক্তি আল্লাহ্তায়ালার প্রেমে উন্মত্ত হতে পেরেছে তার প্রত্যেকটি গতিবিধি ও কার্যকলাপ কেবলমাত্র আল্লাহ্তায়ালার প্রসন্নতা লাভের জন্যই হবে। এমন ব্যক্তি আহার করলেও তা আল্লাহ্র জন্যই ইখলাছের সাথে করতে পারে। পক্ষান্তরে যার সংসারাসক্তি প্রবল তার পক্ষে নামায রোযাও ইখলাছের সাথে সম্পন্ন করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠে। কারণ মানবের বহ্য আচরণ তার আভ্যন্তরীণ স্বভাবের রূপ ধারণ করে। যে দিকে তার মনের আকর্ষণ থাকে, সেদিকেই সে ঝুঁকে পড়ে।

(৮) তাফাক্কুর (আল্লাহ্র মহিমা চিন্তন): তাফাক্কুর শব্দের অর্থ জ্ঞান অন্বেষণ করা; নতুন জ্ঞান লাভের উপায় অবলম্বন করা। অর্থাৎ দু'টি মৌলিক ও স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান হৃদয়ের মধ্যে সম্মিলিত হলে এবং যথানিয়মে সংযোগ সাধন

Dhaka University Institutional Repository

করলে যে নতুন জ্ঞানের উদ্ভব হয়, সেই জ্ঞানকে অনুসন্ধান ও অন্বেষণ করাই হলো তাফাক্কুর। কুরআনপাকের মধ্যে আল্লাহ্তায়ালা বহু জায়গায় তাফাক্কুর (ধ্যান-চিন্তন), তাদাব্বুর (অনুধাবন), নযর (অনুবীক্ষণ) এবং এতেবার (অনুধাবন) পূর্বক উপদেশ গ্রহণ করার নিমিত্তে আদেশ করেছেন। এই চারটি বস্তুই মূলত আল্লাহ্তায়ালার মহিমা চিন্তনের অন্তর্গত। এর মাধ্যমেই মানুষ আল্লাহর বড়ত্বের পরিচয় পেতে পারে। আল্লাহ্তায়ালার মহিমা চিন্তনের গুরুত্ব সম্পর্কে মহানবী (স.) বলেছেন; 'এক ঘন্টাকালের ধ্যান (আল্লাহ্র মহিমা) চিন্তন পূর্ণ এক বৎসর কালের ইবাদত অপেক্ষা উত্তম। এ সম্পর্কে আল্লাহ্তায়ালা বলেন: 'নিশ্চয়ই, আসমানসমূহ এবং জমিনের সৃষ্টির মধ্যে আর দিবস ও রজনীর পরিবর্তনের মধ্যে বুদ্ধিমান ও চিন্তশীল লোকদের জন্য বহু নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে।'[১৯]

আল্লাহ্তায়ালা মানুষকে অন্ধকার ও অজ্ঞানতার মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ জানেনা তার জীবনের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য কী? মানব জীবনের এই অজ্ঞতা দূর করার জন্য প্রয়োজন জ্ঞানের আলো। আর আল্লাহ্র মহিমা চিন্তন এই জ্ঞান লাভের উপায়। এর সাহায্যে মানুষ হৃদয়স্থিত স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের একটির সাথে আরেকটি সম্মিলন করে বাঞ্ছিত বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করে ইহার আলোকে সঠিক পন্থা জানতে পারে। এই তৃতীয় জ্ঞানের প্রভাবে মানুষের অজ্ঞানতার অন্ধকার দূরীভূত হয় এবং তার অন্তরের অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে তার মধ্যে কর্তব্যবোধ জেগে ওঠে। অর্থাৎ এই নতুন জ্ঞানের সাহায্যে সে যখন উত্তমরূপে বুঝতে পারে যে, ইহলোক অপেক্ষা পরলোক উত্তম, তখন ইহলোক হতে সে পরাম্মুখ হয়ে পরকাল প্রাপ্তির উদ্দেশ্য তার কর্ম তৎপরতা বৃদ্ধি পেতে পারে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, তাফাক্কুর হতে ত্রিবিধ আমলের সৃষ্টি হয়। যথা: মারিফাত, হালত (অবস্থা), আমল বা কর্ম প্রচেষ্টা। ইহাদের মধ্যে কর্ম প্রচেষ্টা মনের অবস্থার অধীন। অর্থাৎ মনের অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে কর্মস্পৃহা সৃষ্টি না হলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্মে প্রয়াসী হয় না। মনের অবস্থা আবার পরিচয় জ্ঞানে অধীন।

মহিমা চিন্তনের ক্ষেত্র:

জ্ঞান বা জ্ঞাতব্য বিষয়ের সংখ্যা যেমন অসীম তেমনি চিন্তার ক্ষেত্র বা য অবলম্বনের চিন্তা করা হয় তার সংখ্যাও অসীম। তবে মানুষের চিন্তার ক্ষে সাধারণত দুই প্রকার। যথা: (ক) নিজের সম্বন্ধে; (খ) আল্লাহ্র সম্বন্ধে।

Dhaka University Institutional Repository

(ক) ধর্ম পথের চিন্তার ক্ষেত্রে সালেককে প্রথমে নিজের সম্বন্ধে অর্থাৎ প্রথমত বাহ্য কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুষ্ঠেয় ইবাদত ও পাপকার্য নিয়ে চিন্তা করে তা সংশোধনে প্রয়াসী হতে হবে। দ্বিতীয়ত, অন্তরের স্বভাব বা প্রবৃত্তির প্রতি মনোযোগ দিতে হবে। এই চিন্তার মাধ্যমে অন্তরের কুপ্রবৃত্তিমূলক দোষসমূহ চিহ্নিত করে তা দূর করতে হবে এবং পরিত্রাণকারী সদ্‌গুণগুলো লাভ করতে যত্নবান হতে হবে।

(খ) ধর্ম পথ সম্পর্কিত চিন্তার দ্বিতীয় বিষয় হলো আল্লাহ্‌তায়ালা। আল্লাহ্‌ সম্বন্ধীয় চিন্তা আবার দু'প্রকার। প্রথমত, তাঁর অস্তিত্ব ও গুণাবলী সম্বন্ধে চিন্তা। এ সম্পর্কীয় চিন্তার স্থান অতি উচ্চে। এ সম্পর্কে চিন্তা করার ক্ষমতা মানুষের নেই। দ্বিতীয়ত আল্লাহ্‌র কার্যাবলী ও সৃষ্টি নৈপুণ্য সম্পর্কে চিন্তা। আল্লাহ্‌র সৃষ্টি নৈপুণ্য সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করলে মানুষ আল্লাহ্‌তায়ালার বড়ত্ব, প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা, সৃষ্টির প্রতি তাঁর মমত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে এবং নিজের ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে অবগত হতে সক্ষম হবে। পরিণামে মহান আল্লাহ্‌র প্রেমে তন্ময় হয়ে পড়বে।

(৯) তাওয়াক্কুল: তাওয়াক্কুল মানব হৃদয়ের একটি উন্নত অবস্থা। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌তায়ালার একত্ব (তাওহীদ) এবং তাঁর অপার করুণার উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করতে পারলে মানব হৃদয়ে এ অবস্থার উদ্ভব হয়।[৮০] হৃদয়ে এরূপ অবস্থা জন্মিলে মানুষ কার্যনির্বাহক আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি প্রত্যেক কার্যেই অন্তরের সাথে ভরসা করে। সেই ভরসাকে অন্তরে দৃঢ় রাখার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকে এবং প্রত্যেক কার্যে আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি দৃঢ় ও নির্ভয় থাকার জন্য অন্তরে কোন প্রকার উদ্বেগ স্থান পায় না; বরং শান্তি ও আরামের সাথে নিরুদ্বিগ্ন থাকে। জীবিকা সংগ্রহের চিন্তাও অন্তরে স্থান পায় না। ঘটনাক্রমে জীবিকা সম্বন্ধীয় বাহ্য উপায় বিনষ্ট হয়ে গেলেও তার হৃদয় ভগ্ন হয় না বরং এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌র প্রতি তার পূর্ণ ভরসা থাকে যে, তিনি পর্যাপ্ত পরিমাণ জীবিকা দান করবেন।

তাওয়াক্কুল কার্যকরী করার উপায়:

কেউ কেউ মনে করতে পারে আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভর করতে হলে মানুষের সর্ববিধ কার্যের ভার আল্লাহ্‌র উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতে হবে। কিন্তু তা ঠিক নয়। তাওয়াক্কুল শরীয়তের উপর প্রতিষ্ঠিত। শরীয়ত মানুষকে উপার্জন, সঞ্চয়, ভবিষ্যৎ বিপদ হতে আত্মরক্ষা এবং বর্তমান বিপদ বিদূরণের

Dhaka University Institutional Repository
অধিকার দিয়েছে। সুতরাং এ চতুর্বিধ কার্যের মধ্যে তাওয়াক্কুল কিভাবে স্থির রাখা যায় তাই বিবেচ্য বিষয়।

(১) উপার্জন: উপার্জনের ক্ষেত্রে তাওয়াক্কুল হলো কোন সৃষ্ট জীব ও উপকরণের উপর ভরসা না রেখে একমাত্র আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা রেখে উপার্জন করা। আর উপার্জনকারীর তাওয়াক্কুল হলো ধনের উপর ভরসা না করে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের উপর ভরসা করা।

(২) সঞ্চয়: সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে তাওয়াক্কুল হলো নিজের জন্য সঞ্চয় না করা। তবে সঞ্চয় না রাখলে যার মন চঞ্চল থাকে এবং অপরের মুখাপেক্ষী হয়ে তার পক্ষে সঞ্চয় করাই উত্তম। কিন্তু সঞ্চয় করে সঞ্চিত ধনকে আল্লাহ্‌র ধন ভাণ্ডারের ন্যায় মনে করলে এবং সঞ্চিত সম্পদের উপর ভরসা না করলে তাওয়াক্কুল নষ্ট হয় না। আবার পরিবার বিশিষ্ট লোক এক বছরের জীবিকা সংগ্রহ করে রাখলে তাওয়াক্কুল নষ্ট হয় না।

(৩) ভবিষ্যৎ বিপদ: মানব জীবনে যে সকল বিপদাপদ ঘটা আবশ্যম্ভাবী বা প্রায়ই ঘটে থাকে ইহা হতে আত্মরক্ষার উপকরণ সংগ্রহ করলে তাওয়াক্কুল নষ্ট হয় না। তবে মানব প্রদত্ত দুঃখ কষ্ট সহ্য করা এবং উহার প্রতি বিধান না করা তাওয়াক্কুলের অন্তর্গত। যেমন: আল্লাহ বলেন: 'তাদের প্রদত্ত যন্ত্রণা ভুলে যাও এবং আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করা।'[৮১]

(৪) বর্তমান বিপদ: বর্তমান বিপদের মধ্যে অন্যতম হলো রোগ-ব্যাধি। রোগের চিকিৎসা ক্ষেত্রে তাওয়াক্কুল জ্ঞানমূলক ও মনের ভাবমূলক ব্যাপার। এক্ষেত্রে ঔষধ ব্যবহার করা আবশ্যক। কিন্তু ঔষধের উপর ভরসা না করে রোগের সৃষ্টিকর্তার উপর ভরসা করা মানুষের কর্তব্য। কারণ বহু লোক ঔষধ সেবন করেও রোগ হতে মুক্তি লাভ করে না।

বস্তুত তাওয়াক্কুলের ক্ষেত্রে বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহ্‌তায়ালার হুকুম ব্যতীত কিছুই ঘটতে পারে না। তিনি যা চাবেন তাই হবে। তদবীর প্রয়োগ করে আল্লাহ্‌তায়ালার উপর ভরসা রাখতে হবে, কিন্তু তদবীরের উপর নির্ভর করা উচিত নয়। তাই তাওয়াক্কুল হাসিলের জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার ক্ষমতা, অনুগ্রহ, ওয়াদাসমূহ এবং নিজের অতীত সফলতাসমূহ স্মরণ করা ও চিন্তা করা উচিত।

Dhaka University Institutional Repository
উপরে বর্ণিত মাকামগুলোসহ পরিত্রাণকর অন্যান্য সদ্‌গুণ হাসিল হলেই কেবল সালেক আল্লাহ্‌র প্রতি প্রেম ও ভালবাসার মাকামে উপনীত হতে পারে। আল্লাহ্‌র প্রেম বা মহব্বত অর্জন করার পর আর কোন উচ্চতর মাকাম বাস্তবে নেই। তবে যা আছে তা হলো তার ফল। যেমন, অনুরাগ ও রেযা এবং এই প্রকার অন্যান্য বিষয়। উল্লেখ্য যে, এই মাকামে পৌঁছার জন্য সালেকের আত্মশুদ্ধির সাথে সাথে আল্লাহ্‌র পরিচয় জ্ঞানের ও প্রয়োজন। অর্থাৎ পার্থিব জগতে কোন মানুষকে ভালবাসতে হলে যেমন অপর সকল বিষয় থেকে দৃষ্টিকে ফিরিয়ে প্রেমিকার দিকে নিবদ্ধ করা উচিত তেমনি হৃদয়ে আল্লাহ্‌র মহব্বত পয়দা করার জন্য মানুষকে প্রথমত আল্লাহ্‌ ভিন্ন অপরাপর যাবতীয় পদার্থ হতে মুখ ফিরিয়ে নিতে হবে এবং দুনিয়ার মহব্বত বা সংসারাসক্তি এবং যাবতীয় কুপ্রবৃত্তি হতে হৃদয়কে পাক-সাফ করতে হবে। দ্বিতীয়ত প্রেমাস্পদ আল্লাহ্‌র পরিচয় জ্ঞান লাভ করতে হবে। কারণ পরিচয় হতে ভালবাসার জন্ম। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভালবাসেনা সে তাঁর পরিচয় পায়নি বলেই ভালবাসে না। আল্লাহ্‌তায়ালা পরম সুন্দর এবং মহৎ। তাঁর সৌন্দর্য ও পূর্ণ মহত্ব জানতে পারলে সুন্দর ও মহত্বের প্রতি মানব হৃদয়ের স্বাভাবিক আকর্ষণ বশত মানুষ তাঁকে ভালবাসবে।

৬। মারিফাত

মারিফাত শব্দের অর্থ হচ্ছে চেনা-জানা, কোন কিছুর প্রকৃতি ও সত্তা সম্পর্কে অবগত হওয়া বা কোন কিছু সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা। তাসাওউফ শাস্ত্রমতে বিশ্বসৃষ্টির পরমসত্তা মহান আল্লাহ্‌ ও তাঁর সুবিশাল সৃষ্টি জগৎ এবং আপন সত্তাকে জানার নামই মারিফাত। অন্য কথায় নূরে এলাহী তথা পরম জ্যোতির্ময় সত্তার পরিচিতি লাভ, নিজের আত্মদীপ্তি সম্পর্কে পরিচিত হওয়া, পরম প্রেমময়, পরম জ্যোতির্ময় সত্তার অবলোকন, মহান আল্লাহ্‌ পাকের পূত-পবিত্র নূরের সাথে পরিচিত হওয়াকেই মারিফাত বলে। এই স্তরে উত্তীর্ণ হতে পারলে আল্লাহ্‌ তায়ালার প্রদত্তনূর ও জ্ঞান দ্বারা ভক্তের হৃদয় নূরে মারিফাতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। এপ্রসংগে যুননুন মিস্রি মারিফাতের সংজ্ঞাদিতে গিয়ে বলেন, 'আল্লাহ্‌র কাজের মধ্যে গুপ্ত রহস্য এবং হেকমতকে জানতে থাকাই মারিফাত।'[৮২] আবার আবুইয়াযীদ (রা.) বলেন, দুনিয়ার যাবতীয় চলাফেরা ও চুপ থাকা আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে হয়ে থাকে ইহা জানাই হলো মারিফাত। তাঁর মতে আল্লাহ্‌ই মানুষের প্রকৃত কর্তা। আল্লাহ্‌ সর্বশক্তিমান। জগতের কোন কিছুই তাঁর শক্তি এবং সামর্থের বাইরে নয়। তাঁর গুণাবলী অসংখ্য এবং

Dhaka University Institutional Repository

বর্ণনাতীত। সাধারণ লোকের ক্ষমতা নেই আল্লাহ্‌র প্রশংসা যথাযথ ভাবে করা। তাই প্রখ্যাত সূফী আবু বকর ওয়াসতী বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে চিনতে পেরেছে সে অন্য কিছুর সম্পর্ক ত্যাগ করে বোবায় পরিণত হয়েছে।'[৮৩]

মারিফাতকে দুই ভাবে ভাগ করা যেতে পারে।[৮৪] যথা- জ্ঞানগত মারিফাত (এলমী মারিফাত) এবং হাল বা অবস্থাগত মারিফাত (হালী মারিফাত)। আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে বিশুদ্ধ জ্ঞান হলো জ্ঞানগত মারিফাত। ইহা ইহলোক এবং পরলোকে মানুষের কল্যাণের ভিত্তি। অন্যদিকে বান্দার অবস্থা অর্থাৎ কর্মময় জীবনে জ্ঞানগত মারিফাতের প্রতিকৃতি হল অবস্থাগত বা হালী মারিফাত। হালী মারিফাত এলমী মারিফাতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কারণ এলম হাল ছাড়া হতে পারে। কিন্তু হাল এলম ব্যতীত হতে পারে না। এখানে উল্লেখ্য যে কোন কিছুর পরিচয় জ্ঞান অর্জন করার মাধ্যম হল এলম। কিন্তু আল্লাহ্‌কে জানার জন্য এলম কিংবা আমলই যথেষ্ট নয়। কেননা এলম এবং আমলই যদি আল্লাহ্‌কে জানার জন্য যথেষ্ট হতো তাহলে প্রত্যেক জ্ঞানবান এবং আলেমই আরেফ হতো; এবং কোন অজ্ঞানী আল্লাহ্‌কে পেতনা। এই দু'টি বিষয়ই প্রকৃত ঘটনার বিপরীত। প্রকৃত বিষয় হচ্ছে এলম এবং আমল মারেফাতের কারণ নয় বরং মাধ্যম। উল্লেখ্য যে, মারিফাতের জ্ঞান লাভের উপায় সম্পর্কে সূফীরা একমত যে একমাত্র আল্লাহ্‌ই মানুষকে আল্লাহ্‌র দিকে পরিচালিত করে।[৮৫] অন্যকথায় আল্লাহ্‌ যখন কোন মানুষকে তার মারিফাতকে জানান তখনই সে তাঁকে জানতে পারে। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সূফী নূরী বলেন, 'আল্লাহ্‌ই মানুষকে আল্লাহ্‌র পথে পরিচালিত করে।'[৮৬] একইভাবে জুনায়েদ বাগদাদী (রহ:) বলেন, 'মারিফাত দু'প্রকার।[৮৭] যথা: মারেফাত-উত তাওয়াররুফ এবং মারিফাত-উত তারিখ।' মারেফাত-উত তাওয়াররুফ এর অর্থ হলো আল্লাহ্‌ তাঁর মাধ্যমে নিজেকে এবং বিশ্বজগৎকে জানান। আর মারেফাত-উত তারিখ এর অর্থ হলো আল্লাহ্‌ মানুষকে এ বিশ্বজগতে তাঁর নিদর্শনসমূহ দেখান। এরপর মানুষের মধ্যে এক বিশেষ রকম মেহেরবানী সৃষ্টি করেন। ফলে তাঁর নিদর্শনসমূহ ও মেহেরবানীর মাধ্যমে মানুষ বুঝতে পারে সৃষ্টির একজন স্রষ্টা আছে। এই প্রকারের মারিফাত হলো সাধারণ মোমেনদের। আর মারেফাত-উত তাওয়াররুফ আল্লাহ্‌র নির্বাচিত আরেফদের। তাই প্রখ্যাত সূফী ইবনে আতা বলেন, 'আল্লাহ্‌ সাধারণ মানুষের কাছে তাঁর পরিচয় দিয়েছেন তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে। আর তাঁর নির্বাচিত আরেফদের কাছে তাঁর পরিচয় দিয়েছেন তাঁর বাণী ও গুণাবলীর মাধ্যমে (অর্থাৎ কুরআনের দ্বারা) এবং নবীদের কাছে তিনি নিজেকে নিজের মাধ্যমে প্রাকাশ করেছেন।'[৮৮] পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌ বলেন: তিনি আল্লাহ্‌ যিনি মানুষের অন্তরকে উন্মুক্ত করেন আবার ছিলবদ্ধ করেন।[৮৯] তাই তো হযরত আলী (রা.) বলেন, 'আল্লাহ্‌র মেহের বানীতেই আমি

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ্‌কে চিনেছি এবং তিনি ব্যতীত যাবতীয় কিছুর পরিচয় তাঁর নূরের সাহায্যে অবগত হয়েছি। বস্তুত আল্লাহ্‌ই হলেন মানুষের প্রথম শিক্ষক। রুহের জগতে তিনি মানুষকে যা কিছু শিখিয়েছেন মানুষ তাই প্রথম শিক্ষা লাভ করেছে। এবং পার্থিব জীবনে তিনিই যাকে তাঁর পরিচয় লাভের সুযোগ দেন সেই তাঁকে জানতে পারে। তিনি ব্যতীত অন্য সবকিছু কারণ বা উপাদান। আর কারণ বা উপাদান কারণ কর্তার অনুগ্রহ ব্যতীত যথার্থ ভাবেই সঠিক পথের নির্দেশ দান করতে পারে না। তাই সাধেকের অনুসন্ধানের সামর্থ যখন শেষ হয়ে যায় তখন আল্লাহ্‌র শক্তি তাদের হয়ে যায়। অর্থাৎ তারা আল্লাহ্‌র কাছে পৌছার পথ পেয়ে যায় এবং সান্ত হয়। তাই আল্লাহ্‌ বলেন, 'তুমি যখন মুক্ত ছিলে তখন তুমি তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অনুশীলন দ্বারা আবৃত ছিলে এবং যখন এ গুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে তখন তুমি ব্যর্থ হয়েছ এবং ব্যর্থ হয়ে তুমি অর্জন করেছ।'

মারিফাত আলমে জাবারুত বা আত্মজগতের অন্তর্ভুক্ত বিষয়। মারিফাতের স্তরে উত্তীর্ণ আরেফ আল্লাহ্‌র যাত বা সিফাত সম্পর্কে অবগতি লাভ করে থাকেন। এ স্তরে উর্ত্তীণ ব্যক্তিকে বলা হয় আরেফ। তরীকতের সাধনায় দিলের ময়লা আবর্জনা এবং বস্তুজগতের চিন্তা ভাবনা বিদূরীত হবার সাথে সাথে প্রেমের আলোক প্রতিফালিত হতে থাকে আরেফের হৃদয়াভ্যন্তরে। তার চিত্ত সর্বদা আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ, তাঁর যাত ও সিফাত সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন ও তাঁকে জ্ঞানের চোখ দর্শন ও হৃদয়ের দ্বারা উপলব্ধি করার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। এভাবে সালেক মারিফাতের গুপ্ত রাজ্যে প্রবেশ করে। মারিফাত রাজ্যে গমন করলে সূফী অনেক অজানা রহস্য অবগত হতে থাকেন। তিনি আত্মদর্শনের মাধ্যমে পরমসত্তার পরিচয় পান। একই সাথে এবিশ্ব জগতের আদি রহস্য, সৃষ্টি রহস্য, তকদীর রহস্য অর্থাৎ অদৃষ্টের ভাল ও মন্দ আল্লাহ্‌র তরফ থেকেই ঘটে থাকে, পরকাল রহস্য অর্থাৎ মৃত্যুর পর আলম-ই-বরযখে কোন অবস্থা প্রাপ্ত হবে, হাশর, (সম্মিলন), কিয়ামত, পুনরুত্থান, বিচার, বেহেশত-দোযখ প্রভৃতি গুপ্তরহস্য এ সময় আরেফ ব্যক্তি স্পষ্টভাবে জানতে সক্ষম হয়। এক কথায় সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত আল্লাহ্‌র যাত ও সিফাত এবং পারলৌকিক সকল কিছুর গভীর রহস্য ও তত্ত্বসমূহ আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর প্রেমিক আরেফকে মারিফাতের এই উচ্চস্তরে একে একে জানিয়ে দেয় প্রেমের এই গভীর স্তরে সাগরে পতিত এক বিন্দু পানির ন্যায় সাধক আল্লাহ্‌তে মিশে গিয়ে সাগরের গুণাবলী লাভ করেন। এবং স্থান কালের ঊর্ধ্বে উঠে সকল রহস্যের সত্য উপলব্ধি করেন। তাই মহানবী (স.) বলেন, 'মারিফাত তাই যা আমি চিনেছি ও জেনেছি'।

Dhaka University Institutional Repository

৭. ঐশী প্রেমের অবস্থা

মুসলিম জীবনের মূললক্ষ্য তার স্রষ্টা, পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা মহান আল্লাহ্তায়ালার সন্তুষ্টি তথা প্রেম লাভ। শুধু তাই নয় তার সুখ-দুঃখ, শোক-তাপ, ইবাদত-বন্দেগী, এককথায় তার জীবন ও মরণের সকল সাধনার মূল উদ্দেশ্য আল্লাহ্র সন্তুষ্টি। কিন্তু এ জন্য প্রয়োজন আল্লাহ্র পরিচয় লাভ। তাই মানুষ যখন সাধনার মাধ্যমে করুণাময় আল্লাহ্র মেহেরবাণীতে তাঁর পরিচয় লাভ করেন তখনই সে তাঁর প্রেমে আবদ্ধহন। তাই বলা হয়ে থাকে--যিনি আল্লাহ্র পরিচয় পেয়েছেন, তাঁর প্রেমকে উপলব্ধি করেছেন তিনি আল্লাহ্তে মজেছেন, মুগ্ধ হয়েছেন। তার জন্য কোন ভয় ও দুশ্চিন্তা নেই কেননা আল্লাহ্র প্রেম ও মহব্বত সম্পর্কে তিনি যা যেনেছেন তাই ভয়কে ভালবাসায় রূপান্তরিত করেছে এবং প্রেমাস্পদ ব্যতীত অন্য সকল বিষয় থেকে তার চিন্তাকে মুক্ত করেছে। অর্থাৎ হৃদয়ের মধ্যে এশক বা খোদা প্রেমের আর্বিভাব হলে ইহা হৃদয় থেকে অন্য সব কিছু দূর করে দেয়।[১০] তাই হুজবেরী বলেন যে, আল্লাহ্র প্রতি মানুষের ভালবাসা এমন একটি গুণ যা ধার্মিক ব্যক্তির হৃদয়ে প্রকাশ পায় তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার মাধ্যমে। ফলে সে তার প্রেমাস্পদের সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে এবং তাঁর দিদারের জন্য অধৈর্য ও অস্থির হয়ে পরেন; এ অবস্থায় আল্লাহ্ ছাড়া অপর সকল কিছুর স্মরণ ত্যাগ করে কেবল তাঁরই ধ্যানের মাধ্যমে তাঁর নিকটবর্তী হতে থাকেন।[১১] কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, মানব হৃদয়ে ঐশী প্রেম প্রতিষ্ঠিত হলে তার মধ্যে কতকগুলো অবস্থার সৃষ্টি হয়। যেমন--

(১) আল্লাহর প্রিয় বস্তুকে ভালবাসেন: হৃদয়ে ঐশী প্রেমের সৃষ্টি হলে আল্লাহ্ প্রেমিক আল্লাহ্র উদ্দেশ্য নিজের প্রিয় বস্তু উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকে। আর যে বস্তু আল্লাহ্র সাথে তার সান্নিধ্য ঘটাতে সক্ষম তৎপ্রতি আসক্ত হন এবং যা আল্লাহ্ হতে দূরবর্তী করে দেয় তা হতে দূরে থাকেন। তিনি আল্লাহ্র বাণী কুরআন শরীফকে, তাঁর রাসূলকে এবং তাঁর সাথে সম্বন্ধযুক্ত পদার্থকে অন্তরের সাথে ভালবাসেন। এ ভালবাসা অন্তরের মধ্যে দৃঢ় হয়ে গেলে গোটা মানব জাতির প্রতি ভালবাসা আপনি উতলিয়ে উঠবে। কেননা তখন তার মনে হবে ইহারা সকলেই আল্লাহ্র বান্দা, পরিশেষে আল্লাহ্ সৃষ্ট বলে সমগ্র সৃষ্ট জগৎকে ভালবাসতে আরম্ভ করবে। কারণ যখন ভালবাসা প্রবল হয় তখন প্রিয়জনের সাথে যেসব বস্তুর সম্পর্ক থাকে সেসব বস্তুকেও সে ভালবাসে। তাই এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ মুহাম্মদ (স.) বলেন, 'আপনি বলুন: যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর। তাহলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালবাসবেন।'[১২]

Dhaka University Institutional Repository

(২) **নির্জনতাকে পছন্দ করা:** হৃদয়ে আল্লাহ্‌র মহব্বত পয়দা হলে আল্লাহ্‌প্রেমিক নির্জনবাস এবং নিভৃতে প্রেম নিবেদনের জন্য লালায়িত হন। এরূপ ব্যক্তি রজনী আগমনের প্রতিক্ষায় থাকে। কেননা রজনী আগমনে দিবসের কর্মব্যস্ততা ও সমস্ত বাঁধাবিঘ্ন ঘুচে যায় এবং তখন নির্জনে বন্ধুর নিকট আত্মনিবেদনের সুযোগ ঘটে। যে ব্যক্তি সময়ে অসময়ে নিদ্রা যায়, অনার্থক কথাবর্তায় সময় কাটায় এবং নির্জন বাস অপেক্ষা জনতা ভালবাসে, তার আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসা নিতান্ত অপূর্ণ। কেননা কোন প্রেমিকই তার প্রেমাস্পদ ব্যতীত শান্তি ও তৃপ্তি পায় না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌ বলেন: 'তারা ঈমান আনে এবং আল্লাহ্‌র স্মরণে তাদের হৃদয় প্রশান্ত হয়।' হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা:) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ভালবাসায় মিষ্টতা পায় তাই তাকে সংসার অন্বেষণ থেকে বিরত রাখে এবং অন্যান্য লোক থেকে দূরে রাখে।'[৯৩]

(৩) **আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ লাভের অগ্রহ:** আল্লাহ্‌র মারিফাত তথা মহব্বত লাভের পর সালেকের আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ লাভের আগ্রহ তথা অনুরাগ জন্মে। এ প্রসঙ্গে মাহনবী (স.) বলেছেন যে, 'আল্লাহ্‌ বলেছেন: নেককার লোকের আমার দেখবার যেমন প্রবল অনুরাগ আছে, তাদেরকে দেখবার আমার তদাপেক্ষা অনুরাগ আছে।'[৯৪] মানুষ যে পদার্থকে জানে সেই পদার্থ যদি এক দৃষ্টিকোণ থেকে তার চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত এবং অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে অনুপস্থিত থাকে তবে তা দেখার জন্য প্রেমিক হৃদয়ে আকাঙ্ক্ষা জন্মে। একইভাবে আল্লাহ্‌তায়ালার ক্ষমতা, মাহাত্ম্য ও প্রতাপ সম্বন্ধে মারিফাত বা তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করলে খেয়ালের চোখে তাঁকে এক প্রকার দেখা যায় কিন্তু তাতে প্রকৃত চোখের দেখা হয় না। সুতরাং আল্লাহ্‌তায়ালাকে এক হিসেবে দৃশ্য এবং অন্য হিসেবে অদৃশ্য বলা যায়। এমতাবস্থায় খোদা ভক্ত লোকের মনে আল্লাহ্‌র দর্শন লাভের আগ্রহ জন্মে । কিন্তু ইহকালে আল্লাহ্‌কে প্রত্যক্ষভাবে দেখা সম্ভব নয়। মৃত্যু ব্যতীত এই অনুরাগ বা আগ্রহ পরিতৃপ্ত হতে পারে না। মৃত্যুর পর পরলোকে আল্লাহ্‌তায়ালাকে প্রকৃত চোখে দর্শন করলেই এই আকাঙ্ক্ষা নিবৃত হয়। তাই সালেক মৃত্যুকে ভালবাসেন এবং মৃত্যুর জন্য সদা প্রস্তুত থাকেন। আল্লাহ্‌তায়ালার সৌন্দর্য-মাধুর্য ও মহিমা অপরিসীম। অন্যদিকে মানুষের জ্ঞান উপলব্ধি ক্ষমতা সীমিত। তাই আল্লাহ্‌র সম্যক গুণাবলী ও মহিমা উপলব্ধি করে শেষ করা ইহকাল কিংবা পরকাল কখনই সম্ভব নয়। পরকালে আল্লাহ্‌র দিদার যত অধিক হবে আনন্দও তত অধিক বৃদ্ধি পাবে। এই আনন্দ অপরিসীম। ফলে মানবাত্মা যখন আল্লাহ্‌তায়ালার সৌন্দর্য ও মাধুর্য উপলব্ধি করবে তাতে তার অন্তর আনন্দ ও খুশিতে ভরে যাবে। হৃদয়ের এই অবস্থা প্রাপ্তিকে বলা হয় উনস্ বা সখ্যতা। আবার যে সৌন্দর্য ও মহিমা এখনও উপলব্ধি করবার বাকি

Dhaka University Institutional Repository

আছে তৎপ্রতি লক্ষ্য করলে প্রেমিকের অন্তরে দারুণ আকাঙ্ক্ষা ও অনুসন্ধিৎসা প্রবল হয়ে উঠবে। ইহাকেই বলে অনুরাগ (শাওক)। এইরূপ শাওকের পর উনস্ অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষার পর পরিতৃপ্তি এবং পরিতৃপ্তির পর আকাঙ্ক্ষা উৎপত্তি ও নিষ্পত্তি হতে থাকবে । ইহকাল ও পরকালে এই পরিতৃপ্তির ও আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই,সীমাও নেই। তাই আল্লাহ্র প্রেমিকগণ আখারাতে সর্বদা বলতে থাকবেন, 'হে আমাদের প্রভু আমাদের জন্য আমাদের নূর পরিপূর্ণ হতে দাও।' বস্তুত আল্লাহ্ ভিন্ন আর কেউই আল্লাহ্তায়ালাকে চিনতে বা জানতে পারে না। পূর্ণ মাত্রায় চিনা কারো পক্ষে সম্ভবও নয়।

(৪) আল্লাহ্র নেয়ামতের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন: আল্লাহ্র মহব্বত লাভের ফলে প্রেমিক সর্বাবস্থায় অল্লাহ্র নেয়ামত ও আদেশের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন। অবশ্য আল্লাহ্র প্রতি পূর্ণ মাত্রার মহব্বত অন্তরে বিরাজমান থাকলেই আল্লাহ্র বিধানে সন্তুষ্ট ও প্রসন্ন থাকা যায়। এ কারণেই হুযুরে আক্রাম (স.) বলেছেন, আল্লাহ্রতায়ালার বিধানের উপর সন্তুষ্ট থাকা আল্লাহ্তায়ালার অভিমুখে শ্রেষ্ঠ দ্বার। ঐশী প্রেমিক যখন বুঝতে পারেন যে, আল্লাহ্র বিধানের উপর সন্তুষ্ট থাকলে আল্লাহ্তায়ালা তার উপর সন্তুষ্ট থাকবেন। তখন তিনি দারিদ্র, রোগ-শোক প্রভৃতি বিপদ-আপদে ও দুঃখ কষ্টে অবশ্যই সন্তুষ্ট থাকেন। এ প্রসঙ্গে হযরত জুনায়েদ (রহ:) বলেন—আমি হযরত সররি সকতি (রহ:)কে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ্ প্রেমিক কি বিপদ-আপদে দুঃখিত হন? তিনি বললেন- 'না'। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম যদি তাকে তলোয়ার দ্বারা আঘাত করা হয়? তিনি বলনে-- এক আঘাত কেন, সত্তর আঘাত করলেও প্রেমিক দু:খিত হন না। অন্য এক খোদা প্রেমিক বলেন, আল্লাহ্ যা ভালবাসেন আমি তা ভালবাসি। আল্লাহ্ আমাকে দোযখে নিক্ষেপ করতে চেইলেও আমি সন্তুষ্ট আছি এবং তিনি সন্তুষ্ট থাকলে দোযখই আমি পছন্দ করব।

(৫) প্রেমিক আল্লাহ্র গুণে গুণান্বিত হন: ঐশী প্রেমের চূড়ান্ত স্তরে প্রেমিক প্রেমাস্পদের গুণে গুণান্বিত হন। তাই হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন যে, 'যখন আমার বান্দা নফল ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করে তখন আমি তাকে বন্ধু বলে জানি। যখন আমি তাকে বন্ধু বলে জানি, তখন আমি তার কর্ণ হই, যদ্বারা সে শ্রবণ করে; আমি তার চক্ষু হই যদ্বারা সে দর্শন করে; আমি তার হস্ত হই, যদ্বারা সে ধারণ করে; আমি তার পদযুগল হই, যদ্বারা সে হাঁটে[৯৪]। অন্যকথায় তখন সে আমার মাধ্যমেই দেখে, শুনে, ধরে এবং চিন্তা করে।'

Dhaka University Institutional Repository

(৬) ফানা এবং বাকা স্তরে উন্নীত হয়: ফানা ও বাকা হলো সূফী সাধনার সর্বোচ্চ স্তর, যা হলো প্রেমের চূড়ান্ত পরিণতি। সূফী সাধনার লক্ষ্যই হলো মানব সত্তার বিলয় বা ধ্বংস এবং পরম সত্তায় অবস্থিতি এবং স্থায়িত্ব। মানব সত্তার বিলয়কে সাধারণত ফানা এবং পরম সত্তায় অবস্থিতিকে বাকা বলে। বস্তুত ফানা অর্থ আত্মবিনাশ। অর্থাৎ আত্মগরিমা, আত্মঅহংকার, হিংষা-বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, রিয়া, লোভ-লালসা, গীবত, দুনিয়ার ভালবাসা প্রভৃতি আত্মকেন্দ্রিক চিন্তা ও কার্যাবলীকে পরিত্যাগ করা, মানবীয় গুণ ও আত্মবোধকে ধ্বংস করা এবং তৎপরিবর্তে আল্লাহ্‌র গুণাবলী লাভ করা অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সিফাতের মধ্যে মানবিক সিফাতকে বিলীন করে দেওয়া এবং সর্বশেষে আল্লাহ্‌র অসীম জাতের মধ্যে বান্দার সসীম সত্তাকে লীন করে দিয়ে নিজ অস্তিত্ববোধকে ভুলে যাওয়াকে ফানা বলে। সর্বপ্রকার কামনা ও ইচ্ছা হতে ফানা হওয়ার অর্থ সাধকের নিজস্ব উদ্দেশ্য বা খায়েশ না থাকা। একমাত্র আল্লাহ্‌কে ছাড়া সূফী এসময়ে আর কিছুই চান না। ভাল-মন্দ, সুনাম-দুর্নাম, আপন-পর কোন কিছুতেই সাধকের মনোভাবের কোন পার্থক্য ঘটে না। আল্লাহ্‌র অসীম ইচ্ছাতেই তার সামান্য ইচ্ছা সমার্পিত হয়। এই ফানা লাভ করতে হলে চারটি সোপান পার হতে হয়। যথা-(ক) ফানাফিল অজুত; (খ) ফানাফিস সায়েক; (গ) ফানাফির রাসূল; (ঘ) ফানা ফিল্লাহ্‌। ফানার এই চারটি স্তরই নঞর্থক। হিন্দু দর্শনের সমাধি লাভ ও বৌদ্ধ দর্শনের নির্বাণ লাভ ফানার এই স্তরেই ঘটে। কিন্তু সূফী দর্শনে ফানা ফিল্লাহ্‌র পরেও একটি স্তর রয়েছে এবং সে স্তরে সূফীদের অভিনব পুনর্জীবন লাভ হয়। এ স্তরের নাম বাকাবিল্লাহ্‌।

আল্লাহ্‌তে স্থিতি লাভ করার নাম বাকা। ফানা ফিল্লাহ্‌ অবস্থায় যখন সূফী সাধক স্বীয় অস্তিত্ববোধ হারিয়ে ফেলেন আপনাতে আপনার কিছু থাকে না, বরং সেখানে স্বয়ং আল্লাহ্‌ই বিরাজ করেন, তখন তাকে বাকা বলা হয়। ফানা ফিল্লাহ্‌ হতে ধ্বংস এবং বাকাবিল্লাহ্‌ হতে পুনর্জীবন লাভ হয় বলে ফানা ফিল্লাহ্‌র স্তর হলো নঞর্থক। অন্যদিকে বাকা বিল্লাহ্‌ এর স্তর হলো সদর্থক। যতক্ষণ পর্যন্ত সালেকের (প্রেমিকের) আমিত্ব থাকবে ততক্ষণ তিনি মাশুককে পাবেন না, যখন তার আমিত্ব থাকবে না তখন তার আল্লাহ্‌ প্রাপ্তি হবে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, ফানা পর্যন্ত দ্বৈতবোধ বজায় থাকবে। আমি ও তুমি এর চিন্তা স্বাভাবিকভাবেই থাকবে। কিন্তু বাকা বিল্লাহ্‌ লাভ করলে দ্বৈতবোধ ভাব আর থাকে না- এখানে জাতের মধ্যে সিফাত মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। জাতের মধ্যে সিফাত থাকে বটে কিন্তু তা গুপ্ত অবস্থায় এবং পৃথক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে। এ স্তর সম্পর্কে আল্লাহ্‌ বলেন; 'আল্লাাহ্‌ ব্যতীত সকল

Dhaka University Institutional Repository

কিছু ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।' এ স্তরে আল্লাহ্‌র অনুভূতি সাধকের অনুভূতি, আল্লাহ্‌র অসীম চেতনাবোধই তার মহা চৈতন্য । এখানে দু'য়ের কোনরূপ চিন্তা বা বোধ নেই। এই একত্ব ও একত্ববোধকেই তাওহীদ বলে। এস্তরের বর্ণনায় নিকলসন বলেন, "He who hase attained to this station journeys in the Real, by the Real, to the Real and he than is a reality (haqq)"[১৫] এ স্তরে সাধকের অস্তিত্ব আল্লাহ্‌র স্বীয় অস্তিত্বে স্থিতি লাভ করে। এজন্যই পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌পাক ঘোষণা করেছেন, 'আমরা আল্লাহ্‌র তরফ থেকে এসেছি এবং আল্লাহ্‌রই দিকে প্রত্যবর্তন করব।' আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে যাওয়া, আল্লাহ্‌তেই সমাহিত ও বিলীন হওয়া এবং তাতেই পুনর্জীবন লাভ আত্মার আসল লক্ষ্য। বাকা বিল্লাহতে সূফীর এই পুনর্জীবন লাভ হয়। তখন তার হৃদয়ের চক্ষুর দুয়ার, দয়া-মায়া ও দানের দুয়ার আল্লাহ্‌তায়ালা খুলে দেন; তিনি যা চোখে দেখে নাই, কানে শুনে নাই এবং মনেও কল্পনা করে নাই অদৃশ্য জগতের সেইসব বস্তু আল্লাহ্‌ তাকে প্রদর্শন করান। সে তখন আসমান ও জমীনের রহস্যজনক বিষয়সমূহ দেখতে পায়, আল্লাহ্‌তায়ালার নৈকট্য লাভকরে এবং তাঁর মধুর ও বিনম্র বাণী শুনতে পায়। এমতাবস্থায় বান্দা একমাত্র আল্লাহ্‌তায়ালাকেই অবলম্বন করে, আল্লাহ্‌তায়ালার ইচ্ছামত ইচ্ছা করে, আল্লাহ্‌তায়ালার প্রচেষ্টামত প্রচেষ্টা করে, আল্লাহ্‌তায়ালা যেভাবে চালান সেভাবে চলে, আল্লাহ্‌তায়ালা যাতে সন্তুষ্ট হন তাতে সে সন্তুষ্ট হয়, আল্লাহ্‌তায়ালা ছাড়া অপর কারো আদেশ পালন করেন না। তাই বলা হয়ে থাকে ফানাফিল্লাহ্‌র স্তর থেকে রাসূলুল্লাহ (স.) ন্যায় স্বাভাবিক কর্মজীবনে রতথাকার নামই বাকাবিল্লাহ্‌। বস্তুত বাকাবিল্লাহ্‌র প্রকৃত অর্থ রাসূলুল্লাহ্‌ (স.) এর জীবন আদর্শে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকা। তারই ন্যায় ধর্মে কর্মে সুস্থিত থেকে কেবল হৃদয়ে প্রেমময়ের চিরন্তন প্রেম জাগিয়ে রাখা।

উল্লেখ্য যে ঐশী প্রেমের অতিশয্যে প্রেমিকের দেহ-মনে কখনও কখনও শিহরণ বা প্রেমস্পন্দন জেগে উঠে; একে বলা হয় অজদ্‌। প্রেমিক তখন আত্মবিহ্বল হয়ে পড়েন এবং নিজের অস্তিত্ববোধ পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেন। এই অজদ্‌ দুইভাবে উৎপন্ন হয়। একটি অজদে জিসমানী বা শারীরিক আলোড়ন; দ্বিতীয়টি অজদে রূহানী বা আত্মিক আলোড়ন। আবার অজদে জিসমানী দুইভাবে সৃষ্টি হয়। একটি স্বেচ্ছাকৃতভাবে; ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভণ্ডামী। অন্যটি অনিচ্ছাকৃততাবেই প্রেমাসক্তি থেকে সৃষ্টি হয়। একে বলা হয় অজদে রূহানী। ইহাই বাস্তব অজদ। ইহার প্রতিক্রিয়া দৈহিক ভাবেও প্রকাশ পায়। যেমন-হঠাৎ করে বিদ্যুৎ বেগে দেহ আঁতকে বা শিহরিত হয়ে উঠা। তাই দেখা যায় কোন কোন আশেক তার মাশুকের এশকের তাড়নায় লাফিয়ে উঠে, নেচে গেয়ে উঠে, চিৎকার করে উঠে। এরূপ অবস্থা যদি আল্লাহ্‌র প্রেমের তাড়নায়

Dhaka University Institutional Repository

অনিচ্ছাকৃত ভাবে ঘটে তবে ইহাকে এশ্‌কে হাকীকী বা পরম প্রেমাসক্তি বলা হয়। খোদা পাকের এরূপ অনাবিল প্রেমের নিদর্শন আশেকের জন্য সৌভাগ্যের বিষয়। এরূপ অবস্থা প্রায়ই মহানবী (স.) এর মধ্যে সৃষ্টি হত। তিনি আল্লাহ্‌র প্রেমে কখনো কখনো তন্ময় হয়ে পড়ে থাকতেন, প্রেমের অর্ন্তদাহে তিনি কখনো কখনো ছটফট করতে থাকতেন। ওহী নাজিলের কিংবা নামাজের সময় তাকে এরূপ অবস্থায় দেখা যেত। এমনিভাবে পরম প্রেমময় আল্লাহ্‌ তাঁর ঐশী প্রেমে আকৃষ্ট করে প্রেমিকে তার জাগতিক ইন্দ্রিয়ানভূতি থেকে নিরাসক্ত করে ফেলে এবং তাঁর প্রেমের বন্ধনে তাকে একাকার করে ফেলেন। প্রেমিক তখন পরম প্রেমময়ের জোতির্ময় সত্তায় হারিয়ে গিয়ে আল্লাহ্‌র রঙ্গে রঞ্জিত হয়ে উঠেন এবং আল্লাহ্‌র স্বভাবে স্বভাবিত হয়ে পড়েন। এই স্তরে উন্নীত এবং বেলায়েতের সম্রাট হযরত আলী (রা.) বলেছেন: 'এই কুরআন শ্রুত, আর আমি এক সবাক জীবন্ত কুরআন।' এই স্তরে উত্তীর্ণ বায়েজীদ বুস্তামী বলতেন: সমুদয় প্রসংসা আমারই জন্য। আর আমি কতইনা গৌরবের অধিকারী।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে ইহা সুস্পষ্ট যে, ঐশী প্রেম খোদায়ী দান। তবে ইহা অর্জনের জন্য প্রয়োজন কঠোর সাধনা; স্বীয় চেষ্টার মাধ্যমে মানুষ যখন আত্মাকে তার যথার্থ স্বরূপে উন্নীত করতে পারে তখন আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে সে আল্লাহ্‌কে জানতে এবং তাঁর মহব্বত লাভ করতে পারে। আল্লাহ্‌র মহব্বত লাভ করে আল্লাহ্‌ প্রেমিক তাঁর সাথে মিলিত হন অর্থাৎ তাঁর দিদারের আনন্দ উপভোগ করেন। উল্লেখ্য যে এই মিলন লাভে প্রেমিক আল্লাহ্‌র ঐশীগুণে গুণান্বিত হলেও তার স্বীয় অস্তিত্ব বজায় থাকে। তাই বলা যেতে পারে প্রেমের চূড়ান্ত স্তরে 'দুই সত্তা এক হয় দুই সত্তা থেকেই'।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ

১. *আল কুরআন*, ২ : ৩০

২. ঐ, ২ : ৩১-৩৩

৩. ঐ. ২ : ৩৪

৪. ইমাম গাযালী, *সৌভাগ্যের পরশমণি*. চতুর্থ খণ্ড. অনুঃ আব্দুল খালেক, তৃতীয় সংস্করণ, ঢাকা, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৯ পৃ.৩৩৯

৫. Qd. Arbery, A.J., The Doctrine of the Sufis, New york, Combridge University Press, 1989. p. 102

৬. Ibid., p. 102

৭. ইমাম গাযালী, প্রাগুক্ত পৃ. ৩৪০ থেকে উদ্ধৃত

৮. Qd., Nicholson, R.A., *Mystics of Islam*, Lebanon: Beirut; khayats, 1966, p. 112.

৯. Qd , Ibid., p. 115

১০. *আল কুরআন*. ৫:৫৪

১১. ঐ. ২ ১৬৫

১২. ঐ, ২:২২২

১৩. ঐ, ৩:৩১

১৪. ঐ. ২:১৫২

১৫. ঐ, ২:১৮৬

১৬. ঐ, ৯:২৪

১৭. ইমাম গাযালী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮২ থেকে উদ্ধৃত

১৮. ঐ. পৃ. ৩৪১-৪৫ থেকে উদ্ধৃত

১৯. ঐ. পৃ. ৩৪৫-৫২ উদ্ধৃত

২০. আবদুর রাহীম, *সূফী তত্ত্বের আত্মকথা*. ঢাকা, নগর প্রকাশনী, ১৯৮৮.পৃ.৪থেকে উদ্ধৃত

২১. প্রফেসর ড. ফকীর আবদুর রশীদ. সূফী দর্শন, তৃতীয় সংস্করণ, ঢাকা. প্রোগ্রেসিব বুক কর্ণার, ২০০০, পৃ. ৩৫ থেকে উদ্ধৃত

২২. Qd. Saiyed Abdul Hai, *Muslim Philosophy*, v.1, (2nd ed) Dhaka, Islamic Foundation Bangladesh, 1982, p.143

Dhaka University Institutional Repository

২৩. *আল কুরআন*, ৫:৪৮

২৪. হযরত হাসান আল বসরী হযরত মুহাম্মাদ (স.) এর পবিত্র বাণী বর্ণনা করে বলেন যে, বিদ্যা দু'প্রকার। এক প্রকার কুলব (হৃদয়) সম্বন্ধীয় এবং এটাই উপকারী বিদ্যা। অন্যটি রসনার সাহায্যের বিদ্যা (বস্তুগত দিক) এবং এটাই আদম সন্তানদের জন্য আল্লাহর প্রমাণ। এখানে হৃদয় সম্পর্কিত বিদ্যাই হলো তাসাওউফ। আবার হযরত আবু হোরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, " আমি হুযুরে পাক (স.) থেকে দু'টি জ্ঞানের পাত্র স্মরণ রেখেছি প্রথমটি সকলের নিকট প্রচার করেছি। দ্বিতীয় জ্ঞানের পাত্র সকলের কাছে প্রকাশ করিনি। যদি তা প্রকাশ করতাম তবে আমার খাদ্যণালী কর্তিত হতো।" এই দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞানই হলো তাসাওউফ।

২৫. ড. আমিনুল ইসলাম, *মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ঢাকা মাওলা ব্রাদার্স, ২০০০, পৃ. ১৭৪-৭৫ থেকে উদ্ধৃত

২৬. ঐ, পৃ. ১৭৭

২৭. Spencer Sidney, *Mysticism in world Religion*, U.S.A., A S Barnes & co. 1966.p.303

২৮. হযরত মাওলানা জালালউদ্দীন রুমি, মসনবীয়ে রুমী, প্রথম খণ্ড, সপ্তম মুদ্রণ, অনুঃ মাওলানা আবদুল মজীদ, ঢাকা, এমদাদিয়া পুস্তাকালয় ২০০২, পৃ.৪৬

২৯. Affifi, A.E, *The Mystical Philosopy of Mohyid Din Ibnul Arabi*, England, Combridge University press, p.171

৩০. Ibnul Arabi, *Futuhat*, II p. 437.1.8. From Footnote

৩১. Ibid, p.441.1.16.

৩২. Jalaluddin Rumi, *The Mathnavi*, trans. by Nicholson, R.A. V.-III, London, Lazac & co. Ltd. 1930. pa 552-554

৩৩. Affifi, A.E,op.cit.,p.171

৩৪. দ্রষ্টব্য, স্পিনোজার নীতিবিদ্যা, অনুবাদ মহিউদ্দীন, ঢাকা: বাংলা একাহেমী, ১৯৯০. পৃ. ২৯১-৯২

৩৫.

৩৬. Rumi,op.cit.,V. vi, 1934.p. 1947

৩৭. মুহাম্মদ আবু তালিব (সম্পাঃ) *লানন শাহ ও লালন গীতিকা*, ১ম খণ্ড, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃ.৩৮

৩৮. Rumi op.cit.,V.v., p.2012-14

৩৯. আলহাজ্জ খানবাহাদুর আহছান উল্লাহ, *সৃষ্টি তত্ত্ব*, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬৩, পৃ. ৪৫

Dhaka University Institutional Repository

৪০. ড. *ফকীর আবদুর রশিদ*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৭

৪১. Rumi,*op.cit.*,v-1, p.1982-84; V. III, p. 4723; v-vi, p. 63

৪২. আরাবীর ভাষায় মানুষ হলো অনুজগৎ (Microcosm) মানুষের সত্তায় অর্জিত ও আত্তীকৃত হয় অতিকায় বহিজগৎ ((Macrocosm) এর যাবতীয় পূর্ণতা বা গুণাবলি অর্জনের মাধ্যম হলো প্রেম।

৪৩. হযরত শেখ ফরীদউদ্দীন আত্তার, *তাজকেরাতুল আওলিয়া*, দ্বিতীয় খণ্ড, অনুঃ, মাওলানা নুরুর রহমান, ঢাকা, এদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯১, পৃ. ১৫৬ থেকে উদ্ধৃত।

৪৪. ঐ, ১ম খণ্ড, অনুঃ, মাওলানা নুর মোহাম্মদ ফরিদী, ঢাকা, বাংলাদেশ তাজ কোম্পানী ১৯৯৩, পৃ. ৮৬

৪৫. মাওলানা রুমি, *মাছনবী শরীফ*, অনুঃ, শাইখুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক, ঢাকা, রশিদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯৬, পৃ. ৪১৬

৪৬. Nicholson, R.A., Ibid., p.114

৪৭. হযরত ফরীদউদ্দীন আত্তার, *মানতিকুত তোয়ায়েব*, আব্দুল জলীল, ঢাকা, ইসলামিয়া লাইব্রেরী, ১৯৬৮, পৃ. ৪৩

৪৮. ঐ, পৃ. ৪৪

৪৯. আলহাজ্ব খান বাহাদুর আহছান উল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

৫০. শায়েখ শরফুদ্দীন আহম্মদ ইয়াহইয়া মানেরী (রঃ), মাকতুবাতে সদী, অনুঃ, মীর হাসান আলী, ২য় খণ্ড, ৯ম সংস্করণ, ঢাকা, মীর পাবলীকেশন্স, পৃ.৭৫

৫১. *তাযকেরাতুল আওলিয়া*, ১ম খণ্ড, প্রগুক্ত, পৃ.১৮০

৫২. ঐ, পৃ. ২৭৮

৫৩. Qd. Arberry, A.J.,*op.cit.*, p. 103

৫৪. ফরীদ উদ্দীন আত্তার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

৫৫. *তাজকেরাতুল আউলিয়া*, ১ম খন্ড, প্রগুক্ত, পৃ. ৯৩ থেকে উদ্ধৃত

৫৬. ঐ দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৫৬ থেকে উদ্ধৃত

৫৭. ইমাম গাযালী, *কিমিয়ায়ে সা'আদাত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭-৪৮

৫৮. ঐ, ২৪

৫৯. Nicholson R.A.,*op.cit.*, p. 112

৬০. *আল কুরআন*, ২৯:৬৯

Dhaka University Institutional Repository

৬১. ঈমানের সাতটি বিষয় হচ্ছে- আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস, আল্লাহ্‌র প্রেরিত মহাপুরুষগণের উপর বিশ্বাস, ফেরেশতাদের উপর বিশ্বাস, আল্লাহর প্রেরিত কেতাব সমূহের উপর বিশ্বাস, শেষ দিবসের উপর বিশ্বাস, তকদীরের ভাল বা মন্দের উপর বিশ্বাস, মৃত্যুর পর আবার পুণরুজ্জীবন লাভ সম্পর্কে বিশ্বাস।

৬২. ড.ফকীর রশিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮

৬৩. ঈমাম গাযালী , *সৌভাগ্যের পরশমনি*, ৪র্থ খণ্ড, অনুঃ, আবদুল খালেক, ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮৯, পৃ. ২৫১

৬৪. *আল কুরআন*, ৩/১৮০

৬৫. ইমাম গাযালী (র:), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬০-৬৩

৬৬. *আল কুরআন*, সূরা মাউন, ৩০

৬৭. ঐ. ৩:৩১৪

৬৮. ইমাম গাযালী (র:), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮ থেকে উদ্ধৃত

৬৯. *আল কুরআন*, ৬৩:৯

৭০. ঐ, ৩:১৪

৭১. ইমাম গাযালী, *কিমিয়ায়ে সা'আদাত*, চতুর্থ খণ্ড, পৃ.২৫১

৭২. *তাযকেরাতুল আউলিয়া*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৯

৭৩. *আল কুরআন*, ২৪:৩১

৭৪. ঐ, ২:১৫৩

৭৫. ঐ, ২:১৫৭

৭৬. ঐ, ৩৯:৫৩, ৩৯:১৬; ১৩:৬

৭৭. *আল কুরআন*, ৯:১১১

৭৮. ঐ, ৯৮:৫

৭৯. ঐ, ৩:১৯০

৮০. দ্রষ্টব্য, *কিমিয়ায়ে সা'আদাত*, চতুর্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩-২৯৯

৮১. *আল কুরআন*, ৩৩:৪৮

৮২. হযরত দাতা গনজে বখশ (র:), *কাশফুল মাহ্‌জুব*, অনুঃ আবদুল জলীল, প্রথম সংস্করণ, ঢাকা, শামস্ পাবলিকেশন্‌স, ১৯৮৪, পৃ. ২২০ থেকে উদ্ধৃত

৮৩. ঐ, পৃ. ২২০ থেকে উদ্ধৃত

Dhaka University Institutional Repository

৮৪. ঐ. পৃ. ২১৮

৮৫. *Kalabadi, Abu Bakr, Kitabal- Ta'arrufli, madhhlahl ab- tasawwuf,* trans. Arbery A.J., London, New Yourk, Melbourne Sydney, Cambridge University press., 1979, p. 46

৮৬. Ibid., p. 46

৮৭. Ibid., p. 47

৮৮. Ibid., p. 48

৮৯. আল কুরআন, ২৩:৬

৯০. ফরিদ উদ্দিন আত্তার, *তাযকেরাতুল আওলিয়া,* ২য় খণ্ড, অনুঃ মাওলানা নূরুর রহমান, ঢাকা, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯১, পৃ. ১৫৩ থেকে উদ্ধৃত।

৯১. Qd. Nicholson, R.A.OP.Cit,pp. 10-11

৯২. *কুরআন,* ৩:৩১

৯৩. ইমাম গাযালী, *এহ্ইয়াউ উলূমিদ্দীন,* ৮ম খণ্ড, অনুঃ এম.এন.এম. ইমদাদুল্লাহ, নরসিংদী, বাবুল লাইব্রেরী, ১৯৯৫, পৃ. ২০৩

৯৪. Arberry, A.J., Sufism, London, George Allen & Vnwin Ltd. 1950, p. 27

৯৫. Nicholson, R.A., The Myshes of Islam, op.cit, 110

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

হিন্দুধর্মে ঐশী প্রেম

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

হিন্দুধর্মে ঐশী প্রেম

হিন্দুধর্ম অনুসারে এই জগৎ প্রেমেরই প্রকাশ। এই প্রেমশক্তি নরকে নারীর প্রতি, নারীকে নরের প্রতি, মানুষকে মানুষের প্রতি, জীবজন্তুদের পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট করছে। ক্ষুদ্রতম পরমাণু হতে উচ্চতম প্রাণী পর্যন্ত অব্রহ্মস্তম্ব এই প্রেমের প্রকাশ। এই প্রেম সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান। চেতন-অচেতন, ব্যষ্টি-সমষ্টি সকলের মধ্যেই এই ভগবত প্রেম আকর্ষনীয় শক্তিরূপে বিরাজ করছে। জগতের মধ্যে প্রেমই একমাত্র প্রেরণা শক্তি। ইহার অভাবে জগৎ মুহূর্তের মধ্যে নষ্ট হয়ে যায় এবং এই প্রেমই ঈশ্বর। তাই উপনিষদে বলা হয়েছে, "কেহই পতির জন্য পতিকে ভালবাসে না, পতির মধ্যে যে আত্মা আছেন, তার জন্যই পতিকে ভালবাসেন, কেহই পত্নীর জন্য পত্নীকে ভালবাসেনা পত্নীর মধ্যে যে আত্মা আছে, তার জন্যই পত্নীকে ভালবাসে, কেহই কোন বস্তুর জন্য সেই বস্তুকে ভালবাসে না, আত্মার জন্যই সেই বস্তুকে ভালবাসে।"[১] আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে ঐশী প্রেম। কাজেই ঐশী প্রেম আলোচনার জন্য আমাদের ঐশী প্রেম কি? এর স্বরূপ কি? ঈশ্বরের সাথে মানুষের প্রেম কি সম্ভব? সম্ভব হলে এ প্রেম লাভের উপায় কি ও প্রেম লাভের অবস্থা কিরূপ ইত্যাদি বিষয়গুলো আলোচনা করা প্রয়োজন।

১. ঐশী প্রেম

যা দ্বারা অন্তঃকরণ সম্যকরূপে নির্মল হয়, যা অতিশয় মমতাযুক্ত এবং যা অতিশয় ঘনীভূত, এইরূপ যে ভাব তাকে পণ্ডিতগণ প্রেম বলে থাকেন। দেবর্ষি নারদ তাঁর ভক্তিসূত্রে প্রেমের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, '(প্রেম) নিরবচ্ছিন্ন ধারায় অনুক্ষণ বৃদ্ধিশীল, কামনা ও গুণাদি পরিশূন্য সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম একটি অনুভূতি স্বরূপ।'[২]

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ অতি অল্প কথায় প্রেমের একটা সংজ্ঞা দিয়েছেন 'কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি প্রেম।' অর্থাৎ ইহলোকের কি পরলোকের সর্ববিধ সুখবাসনা ত্যাগপূর্বক এমন কি নিরূপাদি শ্রীকৃষ্ণসেবা বশত স্বতঃই যে অনির্বচনীয় আনন্দের উদয় হয়, সেই আনন্দের প্রতিও বাসনাশূন্য হয়ে সেবাযোগ্য দেহে শ্রীকৃষ্ণসেবা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার যে বাসনা তাই

Dhaka University Institutional Repository

প্রেম। সাধারণত কোন ব্যক্তির অপর ব্যক্তির প্রতি যদি অনুরাগ হয় তাহলে তার প্রিয় সম্বন্ধীয় কোন কথা হলেই অনুরাগীর অশ্রুপুলকাদি ভাবের দ্বারা ইহা প্রকাশ পায়। একইভাবে ভগবান সম্বন্ধীয় প্রেমভাবও ভক্তের অশ্রুপুলকাদি দ্বারা প্রকাশ পেয়ে থাকে। প্রেমের প্রথম লক্ষণই ভাব। যার হৃদয়ে প্রেমের অঙ্কুর জন্মে তার মধ্যে স্মরণ, কীর্তন, মনন ও অশ্রুপুলকাদি সাত্বিকভাবের উদয় হয়।

১.১ ঐশী প্রেমের লক্ষণ

বিভিন্ন মনীষী প্রেমকে বিভিন্নভাবে ব্যখ্যা করেছেন। এতদসত্ত্বেও প্রেমের কতকগুলো সাধারণ লক্ষণ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, "প্রেমের লক্ষণ তিনটি।"[৩] তিন কোণ ব্যতীত যেমন ত্রিভুজ হতে পারেনা তেমনি প্রকৃত প্রেমও উহার নিম্নলিখিত তিনটি লক্ষণ ব্যতীত কোনরূপেই থাকতে পারে না।

(ক) প্রেমে আদান-প্রদান বা লাভ-ক্ষতির প্রশ্ন নেই

প্রেম চিরকালই দাতা-গ্রহীতা নয়। যেখানে কোন প্রতিদানের আশা থাকে, সেখানে প্রকৃত প্রেম জন্মাতে পারে না। এরূপ প্রেম বেচাকেনার বস্তুতে পরিণত হয়। যতদিন পর্যন্ত আমাদের ভগবানের প্রতি ভয়মিশ্রিত ভক্তি ও তাঁর আজ্ঞা পালনের জন্য তাঁর নিকট কোনরূপ বরপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা থাকে ততদিন আমাদের হৃদয়ে প্রকৃত প্রেম জন্মাতে পারে না। যারা ভগবানের নিকট কিছু প্রাপ্তির আশায় উপাসনা করে তারা ঐ বরপ্রাপ্তির আশা না থাকলে তাঁকে উপাসনা করতনা। ভক্ত ভগবানকে ভালবাসেন তিনি প্রেমাস্পদ বলে। প্রকৃত ভক্তের এই দেবদত্ত প্রেমোচ্ছ্বাসের আর কোন হেতু নাই। অন্য কথায় ভক্ত ভগবানকে ভালবাসেন কারণ তিনি তাঁকে ভাল না বেসে থাকতে পারেন না।

(খ) প্রেমে কোনরূপ ভয় নেই

যারা ভগবানকে ভয়ে ভালবাসে তারা মনুষ্যাধম। তাদের মনুষ্যত্ব এখনও স্ফূর্ত হয় নি। তারা শাস্তির ভয়ে ভগবানকে উপাসনা করে। তারা মনে করে, তিনি এক মহান পুরুষ, যাঁর এক হস্তে দণ্ড, অন্য হস্তে চাবুক, তাঁর আজ্ঞা পালন না করলে তিনি তাদের দণ্ডিত করবেন। ভগবানকে দণ্ডের ভয়ে উপাসনা অতি

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নশ্রেণীর উপাসনা। যতদিন হৃদয়ে কোনরূপ ভয় থাকে ততদিন প্রেম বিকাশের সম্ভাবনা থাকে না। বস্তুত প্রেম সমুদয় ভয়কে নাশ করে ফেলে। প্রেম ও ভয় দুইটি বিপরীত ভাবাপন্ন। যারা ভগবানকে ভালবাসেন, তারা তাঁকে কখনই ভয় করবেন না। ভালবাসেন বলেই একজন প্রেমিক তাঁকে স্মরণ করেন।

(গ) প্রেম উচ্চতম আদর্শ

প্রেমাস্পদ ব্যতীত প্রেমিকের ভালবাসার অন্য কোন পাত্র থাকে না। যতদিন না আমাদের ভালবাসার পাত্র আমাদের সর্বোচ্চ আদর্শ হয়ে দাঁড়ায় ততদিন প্রকৃত প্রেম আসতে পারে না। যখন মানুষ প্রেমের প্রথম ও দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য অতিক্রম করে তখন সে উপলব্ধি করে যে, প্রেমই সর্বদা তার উচ্চ আদর্শ। প্রত্যেক ব্যক্তির উচ্চতম আদর্শকেই ঈশ্বর বলে।" জ্ঞানী-অজ্ঞানী, সাধু-পাপী, নর-নারী, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সকল মানুষের উচ্চতম আদর্শ ঈশ্বর. কারণ জগতের সমুদয় সৌন্দর্য, মহত্ত্ব ও শক্তির উচ্চতম আদর্শসমূহের সমষ্টি করলেই প্রেমময় ও প্রেমাস্পদ ভগবানের পূর্ণতম রূপ পাওয়া যায়। এই আদর্শগুলো প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরে কোননা কোন রূপে বর্তমান থাকে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি আভ্যন্তরীণ আদর্শকে বাইরে প্রক্ষেপ করে তারই উপাসনা করে। এই বহির্জগৎ উপলক্ষ মাত্র। আমরা যা কিছু দেখি তা আমাদের মন হতে বাইরে প্রক্ষেপ করি মাত্র। এই জন্যই জগৎকে প্রেমিকেরা প্রেমপূর্ণ এবং দ্বেষপরায়ণ ব্যক্তিরা দ্বেষপূর্ণ বলে মনে করেন। অন্যদিকে যিনি পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছেন তিনি ইহাতে ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছু দর্শন করেন না। সুতরাং আমরা সর্বদাই আমাদের উচ্চতম আদর্শের উপাসনা করে থাকি এবং যখন আমরা এমন এক অবস্থায় উপনীত হই, যে অবস্থায় আদর্শকে আদর্শরূপেই উপাসনা করতে পারি, তখন আমাদের যুক্তিতর্ক সন্দেহ সব চলে যায়।

এরূপ অবস্থায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকেনা। কারণ আমাদের আদর্শ কখনো নষ্ট হতে পারে না; ইহা আমাদের প্রকৃতির অংশ স্বরূপ। যখন আমি নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করি শুধু তখনই ঐ আদর্শ সম্বন্ধে সন্দেহ করি এবং যেহেতু আমি আমার অস্তিত্বে সন্দেহ করতে পারিনা, সেহেতু ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিষয়েও সন্দেহ করতে পারিনা। প্রেমিকের ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দেহের অবকাশও নেই। কারণ তিনি এইভাব অতিক্রম করেছেন, তিনি সর্বপ্রকার শাস্তির ভয়, সন্দেহের এবং বৈজ্ঞানিক বা অন্য কোন

Dhaka University Institutional Repository

প্রমাণের ঊর্ধ্বে গেছেন। তাঁর পক্ষে প্রেমের আদর্শই যথেষ্ট। বস্তুত প্রেমিক ব্যক্তি অন্যকোন উদ্দেশ্যের বশবর্তী না হয়ে কেবল প্রেমের জন্য প্রেমাস্পদকে ভালবাসেন।

২. ঐশী প্রেমের স্বরূপ

ঐশী প্রেম এক অনির্বচনীয় বিষয়। একে মানবীয় ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। ইহা উপলব্ধির বিষয় মাত্র। সাধনার চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছতে পারলেই এই প্রেম লাভ করা যায়। তাই ভগবত ভক্তগণ এই প্রেমের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে এর স্বরূপ ব্যাখ্যায় সচেষ্ট হয়েছেন।

(ক) বাক্যের দ্বারা প্রেমের স্বরূপ বর্ণনা করা যায় না

প্রেম অনির্বচনীয়। সকল আধ্যাত্মিক সাধনার পরিসমাপ্তি হয় ঐশী প্রেম লাভে। এই প্রেমের স্বরূপ ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ইহা উপলব্ধি করা যায় মাত্র। ইষ্টকে আস্বাদনের যে আনন্দ তা ইষ্ট হতে ভিন্ন নয়। তাই মানবীয় ভাষায় সেই প্রেমকে যথাযথভাবে ব্যক্ত করার সামর্থ্য কারো নেই। এমন কি মানসিক ঘটনাবলীর মত মন দ্বারাও এর বিচার করা যায় না। মন যখনই বিচারমুখী হয়, অনুভব তখন দূরে সরে যায়। সুতরাং মনের দ্বারা প্রেমানুভূতির স্মৃতিমাত্রেরই বিচার-বাক্যের দ্বারা সেই স্মৃতিরই বর্ণনা সম্ভব হয়। কিন্তু স্মৃতি তো বাস্তব নয়।

(খ) প্রেম কেবল অনুভববেদ্য

যাদের বাক্‌শক্তি আছে তাঁরাই কেবল নানারূপ বাক্য বিন্যাসের দ্বারা উপাদেয় বস্তুর রসাস্বাদনের মাধুর্য পরস্পরকে বুঝাতে পারেন। আর যাঁদের সেই বস্তুর উপর সমান প্রীতি আছে এবং আস্বাদনের ফলে তৃপ্তিলাভ ঘটেছে তাঁরাই কেবল বস্তুটির উপাদেয়তা সম্বন্ধে একমত হন। কিন্তু বোবা ব্যক্তি কেবল আকারে ইঙ্গিতে মনের আনন্দ প্রকাশ করে ক্ষান্ত হন। একইভাবে প্রেমের আস্বাদ আমরা অন্তরেই অনুভব করতে পারি। বাক্যের দ্বারা তা প্রকাশের সামর্থ্য আমাদের হয় না। এখন প্রশ্ন হতে পারে প্রেমের স্বরূপ যদি বাক্যে প্রকাশ করা না যায় তাহলে অমৃত স্বরূপ প্রেম বস্তু যে সত্যই আছে, এবং তা লাভ করে যে মানুষের জীবন ধন্য হয় তার প্রমাণ কি? এর উত্তরে বলা যায় যে, কোন কোন

Dhaka University Institutional Repository

উপযুক্ত অধিকারীতে প্রেমের প্রকাশ দেখা যায়। প্রেম লাভ করে তাঁরা যে অতুল আনন্দের অধিকারী হন, তাঁদের দেহ মনে, আচরণে সেই দিব্যানন্দের কিঞ্চিৎ প্রকাশ আমাদিগকে প্রেমের অস্তিত্ব ও মাহাত্ম্য সম্বন্ধে নিঃসংশয় করে দেয়। এইরূপ ভাগ্যবান প্রেমিকের দর্শন না মিললে প্রেমস্বরূপ ভগবানের অস্তিত্ব সম্ভবত জগতে অপ্রমাণ্য রয়ে যেত। সাধনার সোপানের শেষ ধাপে চিত্ত যখন বাসনাশূন্য ও শুদ্ধ হয় তখনই অন্তরে এই দিব্য প্রেমের প্রকাশ পায়। সাধারণ অনুভবের সামগ্রীর অস্তিত্ব ক্ষণিকের কিন্তু প্রেমের অনুভব সেরূপ ক্ষণিক নয়। ব্যক্তির অস্তিত্বের অনুভবকে যেমন ব্যক্তি কোন সময়ে ছেড়ে থাকতে পারেনা, তেমনি ভাগ্য গুণে প্রেমোদয় হলে সে অনুভব আর কখনও প্রেমিককে ছেড়ে যায় না।

(গ) প্রেম গুণশূন্য

গুণের হ্রাস-বৃদ্ধি আছে। গুণের জন্য যদি কাউকে ভালবাসা হয়, তাহলে গুণের ক্ষয়ে সেই ভালবাসাও চলে যায়। গুণের আশ্রয় করেই মন বা ইন্দ্রিয়সমূহ বস্তু বিশেষের উপর আসক্ত বা বিরক্ত হয়। যে সকল পদার্থের গুণ আছে, তাকে আমরা কোন বিশেষণ দিয়ে বিশেষিত করতে পারি। ফলে বাক্যের দ্বারা সেই পদার্থের বর্ণনা সম্ভব হয়। কিন্তু প্রেমের ক্ষেত্রে কোন বিশেষণ আরোপ করা যায় না বিধায় একে বর্ণনাও করা যায় না। লৌকিক প্রেমের গভীরতাতেও দেখা যায় প্রেম প্রেমাস্পদের গুণের বিচার করে উদ্ভূত হয় না বরং প্রেমিকের হৃদয় হতে স্বতঃ উৎসারিত হয়। আবার প্রেমের ক্ষেত্রে সত্ত্ব, রজঃ তমঃ এই তিন গুণের কোনটারই লেশমাত্র সংস্রব থাকেনা। এই তিন গুণের সীমা অতিক্রম করতে পারলেই একজন সাধকের কামনা লোপ পায় এবং তার মধ্যে প্রেমের উদয় হয়। সুতরাং প্রেম হচ্ছে গুণ শূন্য।

(ঘ) প্রেম কামনাশূন্য

প্রেমে কামনার স্থান নেই। সাধারণত কামনা পূরণ হলে কাম্যবস্তুর উপর আসক্তি চলে যায়। আবার কামনা পূরণ না হলে কখনো কখনো কাম্যবস্তুর উপর বিরক্তি আসে। যেহেতু প্রেমে কামনার কোন স্থান নেই। কাজেই ইহার ক্ষয়ও নাই। প্রেমিক প্রেমাস্পদের নিকট হতে নিজের কোন স্বার্থসিদ্ধির আকাঙ্ক্ষা করে না। প্রেমাস্পদের সুখে-দুঃখে সকল অবস্থায়ই সে প্রেমাস্পদের মত অনুরূপ সুখী-দুঃখী হয়। অপরদিকে কামজ প্রীতিতে ভোগের পর আসে

Dhaka University Institutional Repository

অবসাদ। ভোগের আনন্দ যতই মধুর, যতই গভীর হউক না কেন, একদিন না একদিন তাতে অরুচি আসে। কিন্তু প্রেমে অবসাদ নাই। যতই আস্বাদন করা যায় আনন্দের মাত্রা ততই বাড়তে থাকে।

(ঙ) প্রেমানুভবে বিচ্ছেদনাই

প্রেমানুভবে বিচ্ছেদ বা অবকাশ নাই। প্রেমিকের যে বিরহ তা রসাস্বাদনের প্রকারভেদ মাত্র। প্রেমের গভীরতায় প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের মধ্যে ব্যবধান দূর হয়ে যায়।

(চ) প্রেম হচ্ছে সূক্ষ্মতর

বুদ্ধি যতই তীক্ষ্ণ ও মার্জিত হউক না কেন, সেই বুদ্ধির দ্বারা প্রেমের পরিমাপ করা যায় না। বুদ্ধির দ্বারা প্রেমের পরিমাপ করতে গেলেই প্রেম দূরে সরে যায়। আবার প্রেমিকের অন্তরের অনুভব অন্য কারো বুদ্ধি-বিচারের মধ্যে ধরা পড়ে না।

(ছ) প্রেমতত্ত্বে এক বহু হয় এবং বহু এক হয়

প্রেমতত্ত্বে যেমন এক বহু হচ্ছে তেমনি ঐ বহুও একের আকর্ষণে একের সাথে মিলিত হচ্ছে। প্রেম তত্ত্বের ইহা একটি মূল বিষয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের নিম্নক্ত শ্লোকটিতে তা সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

> রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
> অনোন্য বিলাসে রস আস্বাদন করি॥
> সেই দুই এক তবে চৈতন্য গোসাই
> রস আস্বাদিতে দোঁহে হইল এক ঠাঁই।

এক বহু হওয়া এবং বহুর পূর্ণতর এক হওয়া, এই প্রবাহের বিরাম নেই। পরস্পর পরস্পরের তৃষ্ণায় যেন চির তৃষিত। প্রেম তত্ত্বের এই ভাঙ্গাগড়ার স্বরূপ আমরা বৃহদারণ্যক উপনিষদে পাই। ঋষি বলেন যে, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ পূর্বে পুরুষরূপী আত্মারূপে বর্তমান ছিল। তখন আর কিছুই ছিলনা। তিনি আনন্দ পেলেন না; তাই তিনি দ্বিতীয় সঙ্গিলাভ

Dhaka University Institutional Repository

করতে চাইলেন এবং নিজের দেহকে দু'ভাগে ভাগ করলেন। এইভাবে পতি ও পত্নী হলেন।[৫] অর্থাৎ শ্রষ্টা সৃষ্টিরূপে বিভাজিত হয়ে তারই প্রেমে বিমোহিত হলেন। প্রেম তত্ত্বের এই ছন্দ অর্থাৎ একে বহু হওয়া, বহুর উন্নততর এক হওয়া বর্হিজগতে আমরা সর্বদাই প্রত্যক্ষ করছি। বৈজ্ঞানিক ক্রমবিকাশ এই তত্ত্বের উপরই স্থাপিত হয়েছে। বর্তমানে আনবিক শক্তি বিশ্লেষণে এই তত্ত্বের সমর্থন পাওয়া যায়। অর্থাৎ জগতে বিভিন্ন রকম পদার্থ দেখা গেলেও আনবিক অবস্থায় তারা সমস্তই এক। এই আনবিক শক্তিই আকর্ষণ করে নভোমণ্ডলের জ্যোতিষ্ক সমূহের স্থান, স্থিতি ও গতি রক্ষা করছে।

কাজেই একথা বলা যায় যে, হিন্দুমতে প্রেম সৃষ্টির মূলতত্ত্ব। ইহা উপলব্ধির বিষয়। মানবীয় ভাষায় একে ব্যক্ত করা যায় না। সাধনার মাধ্যমে হৃদয় পূত-পবিত্র হলেই তথায় ঐশী প্রেমের উদয় হয়, ফলে ভক্ত সকল কিছু ভুলে একমাত্র ঈশ্বরানুরাগে তন্ময় হয়ে পড়েন।

৩. ঈশ্বরের সাথে মানুষের প্রেম

ঈশ্বরের সাথে মানুষের প্রেম হতে পারে কিনা এ সম্পর্কে হিন্দু শাস্ত্র গীতা ও পুরাণের বক্তব্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট। ঈশ্বর মানুষের সঙ্কটকালে তাঁর অসাধারণ শক্তি বলে নরদেহ ধারণ করে মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রগতির জন্য ধরাপৃষ্ঠে আবির্ভূত হন। গীতায় একথা স্বীকার করা হয়েছে।[৬] বস্তুত অবতার শ্রীকৃষ্ণের ধরাপৃষ্ঠে আর্বিভাবের উদ্দেশ্য দু'টি: প্রথমত: দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করে সৎলোকদের সংরক্ষণ ও ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত করা, দ্বিতীয়ত: মানবকে দিব্য কর্মের আদর্শ দেখিয়ে দিব্য জীবনের দিকে ধাবিত করা, এবং সার্বভৌম ভাগবত ধর্মের প্রচার দ্বারা জীবকে ঈশ্বরের দিকে আকৃষ্ট করা।[৭] তাই গীতায় অর্জুনকে উদ্দেশ্য করে শ্রীকৃষ্ণ বলেন, "তুমি একমাত্র আমাতেই চিত্তরাখ, আমাকে পূজা কর, আমাকে নমস্কার কর। আমি সত্য প্রতিজ্ঞাপূর্বক বলছি তুমি আমাকেই পাইবে, কেননা তুমি আমার প্রিয়।"[৮] একইভাবে ভাগবদ্‌গীতায় বলা হয়েছে মানুষের প্রতি ভগবানের অকৃত্রিম প্রেম ও করুণাই তাঁকে ধরাপৃষ্ঠে নিয়ে আসে। মানুষের অকল্যাণ তিনি কখনও সহ্য করতে পারেন না। আর এ কারণেই তিনি তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা বলে বিভিন্ন রূপ নিয়ে, বিশেষত মানবীয়

Dhaka University Institutional Repository

দেহ নিয়ে ধরাপৃষ্ঠে অবতরণ করেন। ধরাপৃষ্ঠে অবতরণ করে তিনি মানবিক কল্যাণে এমন কর্ম করেন যা মানুষের মন ও হৃদয় হরণ করে, যার ফলে মানুষ তাঁর প্রতি প্রেমভাবাপন্ন হয়ে উঠে।[৯] ভগবানের এই অবতার লীলার মাধ্যমেই মানুষ বুঝতে পারে যে, তার পক্ষে চেতনার এমন এক স্তরে পৌঁছা সম্ভব যেখানে সে একই সঙ্গে মানুষ ও দেবতা দু'ই হতে পারে।[১০] ভগবান অবতারত্ব গ্রহণ করে নিজেকে মানবরূপে পরিবর্তিত করে মানুষের মন ও হৃদয়ের অতি সন্নিকটে আসে। আর এ ভাবেই তিনি মানুষকে তাঁর নিজের ঐশী স্বভাবের দিকে আকৃষ্ট করে, অতি উচ্চস্তরে নিয়ে যেতে চান। এতে সুস্পষ্ট হয় যে তিনি মানুষকে অত্যন্ত ভালবাসেন এবং মানুষও তার প্রেমাস্পদ-ভগবানকে ভালবাসেন। অন্যকথায় ভগবানকে ছেড়ে ভক্ত থাকতে পারেন না, ভগবানও ভক্তকে ছেড়ে থাকেন না। তাই শ্রীভগবান ঋষি দুর্বাসাকে বলেন:

অহং ভক্ত পারাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।

সাধুভিগ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈভক্তজনপ্রিয়ঃ (ভাগবত পুরাণ ৯/৪/৬৩)

সধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ং ত্বহম।

মদন্যৎ তেন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥ (ভাগবত পুরাণ,

৯/৪/৬৮)

অর্থাৎ আমি ভক্তের অধীন, সুতরাং পরাধীন। আমার কিছু মাত্র স্বাধীনতা নেই। সাধুভক্তগণ আমার হৃদয় অধিকার করে আছেন। আমি ভক্তের প্রিয়; ভক্ত আমার প্রিয়।... আমার প্রেমী ভক্ত আমার হৃদয়, আবার আমি সাধু ভক্তের হৃদয়। আমাকে ছাড়া আর কিছু তারা জানে না, আবার আমিও তাদের অতিরিক্ত আর কিছু জানি না। সুতারাং ঈশ্বর যেহেতু মানুষকে ভালবাসেন, মানুষের মঙ্গলের জন্য যেহেতু তার সমস্ত কর্মপ্রয়াস, তাই মানুষ তাকে ভাল না বেসে পারেন না। কেননা মানুষ স্বভাবই উপকারীকে ভালবাসে। এছাড়া সসীম মানুষের পুর্ণতা লাভের জন্যও ঈশ্বরকে ভালবাসা প্রয়োজন।

৪. ঐশী প্রেম লাভের উপায়

হিন্দুধর্মানুসারে মানবজীবনের লক্ষ্য হচ্ছে জন্ম-মরণ বন্ধন হতে মুক্তি বা মোক্ষ লাভ। অর্থাৎ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া বা পরমাত্মার সাথে মিলিত হওয়া। কিন্তু ব্রহ্ম

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ণতম এবং শুদ্ধতম সত্তা। সুতরাং ব্রহ্মকে পেতে হলে বা ব্রহ্মের সাথে মিলিত হতে হলে ব্রহ্মের ন্যায় পূর্ণত্ব বা শুদ্ধত্ব অর্জন করতে হবে। যতক্ষণ মানুষ তার জৈবিক দেহের সঙ্কীর্ণতা ও কামনার নাগপাশে আবদ্ধ থাকবে ততক্ষণ অসীমের সাথে মিলিত হবার কল্পনা আকাশ-কুসুম মাত্র। নিজেকে দৈহিক কারাগার হতে, মুক্ত করে দেবত্বে আরোহণ করতে পারলেই মানুষ ব্রহ্মের সাথে মিলিত হতে পারে। হিন্দু ধর্ম এবং দর্শনের স্পৃহা হচ্ছে নরত্ব হতে দেবত্বে উত্তরণের দীক্ষা দেওয়া। অবশ্য এ লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য বিভিন্ন ঋষি, সাধক এবং শাস্ত্রকার ভিন্ন ভিন্ন পথ নির্দেশ করেছেন। এ গুলো হলো জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি এবং রাজ (ধ্যান) যোগ।[১১] এসবগুলো পথেরই গন্তব্যস্থল এক এবং সাধক যে পথই নির্বাচন ও অনুসরণ করুক না কেন, মোক্ষ পথ যাত্রীর বিশিষ্ট পাথেয়গুলো সব পথেই সমভাবে অপরিহার্য। তবে মোক্ষ পথ লাভের পথ গুলোর মধ্যে ভক্তি বা ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ সহজতর[১২] এবং শ্রেষ্ঠতর।[১৩] কারণ অনুরাগ বা ভালবাসা মানুষের একটি স্বাভাবিক আবেগ এবং এই স্বাভাবিক আবেগের উপরই ভক্তিমার্গ প্রতিষ্ঠিত। ভক্তিমার্গের ক্ষেত্রে এই অনুরাগ ঈশ্বরের প্রতি ধাবিত হয়। গীতা অনুযায়ী, "সর্বভূতে অবস্থিত পরম পুরুষকে অনন্য ভক্তি দ্বারাই লাভ করা যায়, আর কিছুতে নয়।"[১৪]

কাজেই ভক্তিযোগ হচ্ছে প্রেমের উচ্চতর বিকাশের দ্বার স্বরূপ। প্রেমকে যথাযথ পথে পরিচালিত করতে, আয়ত্তে আনতে এমনকি উচ্চতর জীবন্মুক্ত অবস্থায় নিয়ে যাওয়ার একমাত্র উপায় ভক্তি। প্রকৃতির গুনে মানুষ কামনা-বাসনায়, সুখে- সৌন্দর্যে সদাসক্ত। ভক্তিযোগ সেই আসক্তিকে দূর করে ভক্তকে সত্যিকার প্রেমাস্পদ ভগবানের দিকে নিয়ে যায়। জগতের আসক্তি হ্রাসের ফলে মন অনন্ত প্রেমাধারের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

৪.১. ভক্তিযোগের পরিচয়

বর্তমান যুগে বৈষ্ণব সম্প্রদায়কেই প্রধানত ভক্তিমার্গী বলে চিহ্নিত করা হয়। বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনের সারকথা- প্রেম-ভক্তি করুণা। অপরের কল্যাণে আপন স্বার্থত্যাগ তথা বিশ্বজনীন প্রেমানুভূতির উপর রচিত সনাতন বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনের ভিত্তি। আমরা যাকে বৈষ্ণবধর্ম বলি তার প্রধান অনুষ্ঠান-শ্রী বিষ্ণুর নামকীর্তন। বিষ্ণুর উপাসনা বিষয়ে সবচেয়ে প্রাচীন দলিল ঋগ্বেদ সংহিতা। তাতেই ব্যাখ্যাত বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনের মূলসুর। তবে বৈষ্ণব ভক্তিবাদের মূল গ্রন্থ হলো ভগবতগীতা এবং ভাগবতপুরাণ।[১৫] এছাড়া রয়েছে নারদীয়

Dhaka University Institutional Repository

ভক্তিসূত্র। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে বৈষ্ণব সম্প্রদায় প্রধান ভক্তিমার্গী হলেও শৈব, শাক্ত, সৌর ও গাণপত্য সম্প্রদায়ও ভক্তিমার্গের অন্তর্ভুক্ত।[১৬] কারণ ইহারা সকলেই অদ্বৈতবাদী এবং ভক্তিযোগে উপাসনার ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রচার করেছেন। পদ্ম পুরাণ অনুসারে ভক্তিবাদের উদ্ভব দক্ষিণ ভারতে অর্থাৎ দ্রাবিড়দের মধ্যে। প্রথমে ইহা ব্রহ্মধর্মের প্রবল বাঁধার সম্মুখীণ হয়। কারন ইহা ছিল প্রচলিত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি বিতশ্রদ্ধ। পরবর্তিতে অনেক ব্রাহ্মণ এর উন্নতিতে প্রভূত অবদান রেখেছেন।

যদিও ভক্তিবাদের ঈশ্বরের বীজ ঋগ্বেদে নিহিত তবুও এই একেশ্বরবাদের বীজের ভক্তের ঈশ্বররূপে বিকশিত হতে অনেক সময় লেগেছিল। উপনিষদ যুগে ছিল ব্রহ্মবাদের একচ্ছত্র আধিপত্য। ষড়দর্শনের যুগে জ্ঞানমার্গের প্রাধান্য। কাজেই ভক্তিবাদের দর্শন গড়ে উঠতে দেরী হয়ে গিয়েছিল। এদিকে খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের পূর্ব হতেই বিগ্রহ পূজার প্রবর্তন হয়। রামায়ণে রামকে এবং মহাভারতে কৃষ্ণকে বিষ্ণুর অবতাররূপের প্রতিষ্ঠিত করা হয়। সুতরাং অবতারবাদও তখন গড়ে উঠে। এভাবে দেখা যায় খ্রিষ্টের আবির্ভাবের কিছু আগে ঈশ্বরের ব্যক্তিরূপ স্বীকৃত হয়ে এক নতুন উপাসনা রীতি গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ বৈদিক হিন্দুধর্মের স্থানে স্থাপিত হয়েছে পৌরাণিক হিন্দু ধর্ম। যজ্ঞ কর্মের স্থান নিয়েছে ঈশ্বরকে শিব বা বিষ্ণুর বিগ্রহের আকারে কিংবা বিষ্ণুর অবতাররূপে কল্পিত রাম ও কৃষ্ণের উপাসনা। কিন্তু এইভাবে সাকার উপাসনা রীতি প্রবর্তিত হলেও এই রীতির সমর্থক কোন দর্শন গড়ে ওঠেনি। সব থেকে প্রাচীন ভক্তিবাদী দর্শন হলো পাশুপাত দর্শন। ইহা খ্রিষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে গড়ে উঠেছিল বলে দাবি করা হয়।[১৭] তবে এই দর্শনের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হয় শংকরাচার্য রচিত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যের ভিত্তিতে অদ্বৈতবাদ স্থাপিত হবার পর। শঙ্করের অদ্বৈতবাদ ছিল জ্ঞানমুখী। তাই রামানুজের দর্শনের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়াল শঙ্করের পরম অদ্বৈতবাদ এবং মায়াবাদকে খণ্ডন করা এবং বেদান্ত দর্শনের মধ্যে ভক্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। তিনি বিষ্ণু পুরাণকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে বিষ্ণুকেই পরম ব্রহ্মারূপে কল্পনা করেন। পরবর্তীকালে মাধ্বাচার্য, বল্লভাচার্য, নিম্বার্ক প্রমুখ বিখ্যাত বৈষ্ণবাচার্যের হাতে বৈষ্ণবীয় প্রেম ভক্তিবাদের যে দার্শনিক রূপায়ণ তাও প্রতিষ্ঠিত ছিল বেদান্তের অদ্বৈতবাদ খণ্ডনের উপর। মধ্যযুগে বাংলায় বৈষ্ণব দর্শনের প্রবক্তা ছিলেন চৈতন্যদেব (১৪৮৫-১৫৩৩)। বৈষ্ণব ধর্মকে তিনি

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন প্রেমধর্ম বা ভক্তিধর্ম রূপে। সংস্কৃত ভাষায় মাত্র আটটি শ্লোকের মাধ্যমে তিনি বিধৃত করেন তার প্রেমাত্মক মানবতাবাদী দর্শন।

৪.১.১. ভক্তির তাৎপর্য

ভক্তি শব্দটি ভজ্ ধাতু থেকে উদ্ভূত। ভজ্ শব্দের অর্থ বিভাগ, হিস্যা, অংশ, দেওয়া ও লওয়া ইত্যাদি। বৈদিক সাহিত্যে ভজ্ বলতে পশু বলিদান অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করা বুঝাত। পরবর্তী সাহিত্যে ভক্ত ও ঈশ্বরের ব্যক্তিগত সম্পর্ক প্রকাশ করতে ভজ্ শব্দটি প্রায়ই ব্যবহার করা হত।[১৮]

কাজেই উৎপত্তিগত দিক থেকে ভক্তি বলতে বুঝায় বণ্টন, বিভাজন, অংশ গ্রহণ। শব্দটি আবার ক্ষেত্রবিশেষে বিভিন্ন গূঢ়ার্থ প্রকাশ করে। যেমন আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্ক, আবেগ, শ্রদ্ধা ইত্যাদি। তবে সাধারণভাবে বলা যায় ভক্তি বলতে বুঝায় প্রেম অথবা অনুরাগ। অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা বা প্রেমপূর্ণ অনুরাগ, আত্মসমার্পন, ঐশী সত্তায় অংশ গ্রহণ।

ভক্তির সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে, ব্যক্তিগত দেবতাকে প্রেমের সংগে উপাসনা করার নাম ভক্তি।[১৯] অন্যভাবে এর সংজ্ঞাদিতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, ব্যক্তিগত ঈশ্বরে ব্যক্তিগত বিশ্বাস, তাঁর জন্য মানবীয় প্রেম, তাঁর সেবায় সবকিছু উৎসর্গ করা এবং জ্ঞান, কর্ম বা ত্যাগের মাধ্যমে মোক্ষ অর্জনে ব্রতী না হয়ে এ উপায়ে মোক্ষ লাভ করার নাম ভক্তি।[২০]

বেদান্ত মতে, ঈশ্বরের প্রতি পরার নিরতিশয় যে প্রীতি তাকে ভক্তি বলে। বেদান্ত দার্শনিক রামানুজ ধ্যান বা ভক্তিকে 'তৈলধারাবদ্ অবিচ্ছিন্ন স্মৃতি সন্তান রূপ ধ্রুবা স্মৃতিঃ (শ্রীভাষ্য ১/১/১) বলে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ একপাত্র হতে অপর পাত্রে নিক্ষিপ্ত অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় ধেয় বস্তুর নিরন্তর স্মরণের নাম ধ্যান বা ভক্তি। বেদান্ত দার্শনিকদের ভক্তি হলো জ্ঞান ও কর্মের সমন্বিত রূপ। আবার নারদ ভক্তির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন,

'অনন্য মমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা ভক্তি বিত্যুচ্যতে'

নারদ পঞ্চরাত

অর্থাৎ অন্য কোন বিষয়ে মমতা না থেকে একমাত্র বিষ্ণুতে যে প্রেমযুক্ত মমতা তাকেই বলে ভক্তি।

Dhaka University Institutional Repository

বেদে ভক্তি বলতে বুঝায় ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করা।[২১] মহাভারত এবং রামায়ণে ভক্তি শব্দটি জাগতিক এবং ধর্মীয় উভয় প্রেম নির্দেশ করেছে। ধর্মীয় দিক থেকে ভক্তি বলতে ঈশ্বরের প্রতি মানুষের প্রেম এবং অনুরাগই বুঝায় না বরং ঈশ্বরের মানুষের প্রতি ভালবাসা বুঝায়। কিন্তু গীতায় ভক্তি বলতে জাগতিক প্রেম বুঝায়নি। গীতায় ভক্তি হলো মুক্তি লাভের উপায় (১৮/৫৫) এবং লক্ষ্য (১৮/৫৪) উভয়ই।

সর্বোপরি গীতায় ভক্তি বলতে বুঝায় ঈশ্বরের ভক্তের প্রতি ভালবাসা। কৃষ্ণ তাঁর সহচর অর্জুনের প্রতি যেমন সহিষ্ণু এবং ধৈর্যশীল তেমনি তাঁর ভক্তের প্রতি। তাই তিনি বলেন: "যে আমাকে যেভাবে উপাসনা করে, আমি তাকে সেই ভাবেই তুষ্ট করি।[২২] পিতা যেমন পুত্রের নিকট, বন্ধু যেমন বন্ধুর নিকট, প্রেমিক যেমন প্রেমাস্পদের নিকট প্রিয় তদ্রুপ তিনি তাঁর ভক্তের নিকট প্রিয়। তাঁর ভক্ত কখনই বিনষ্ট হয় না।[২৩] তিনি প্রসন্ন হয়ে নিজেকে ভক্তের নিকট প্রকাশ করেন। ফলে তাঁর অনুগ্রহে ভক্তের সমস্ত সঙ্কট এবং সকল সংশয় দূর হয়।[২৪] এবং তিনি তাদের পরম শান্তিওমুক্তি প্রদান (চিরন্তন স্থান) করেন।"[২৫] সুতরাং আধ্যাত্মিক পথ হিসেবে ভক্তিযোগ মানুষের ঈশ্বরের প্রতি প্রকৃত ভালবাসা, তাঁর সেবা করা, তাঁর জন্য আত্মত্যাগ করা, ঈশ্বরেরও মানুষকে অনুরূপ ভালবাসা এবং মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে আনন্দময় মিলনের দ্বারা গঠিত। এর উপাদানসমূহ হচ্ছে- ব্যক্তিগত ঈশ্বর, ঐশ্বরিক করুণা, ভক্তের আত্মনিবেদন ও প্রেম; বর্ণ ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সার্বজনীন মুক্তির আশ্বাস এবং নিগূঢ় মিলন। সর্বোপরি ঈশ্বরতুল্য গুরু ভক্তি।

৪.২. ভক্তির তথা ঈশ্বরানুরাগের জন্য প্রয়োজন নৈতিক বিশুদ্ধতা

ভক্তি তথা ঈশ্বরানুরাগের জন্য মুক্তিকামী সাধকের সর্বাগ্রে প্রয়োজন আত্মশুদ্ধির। কোন ব্যক্তি ঈশ্বরানুরাগী হতে পারে না যদি না তার ঈশ্বরের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস না থাকে। ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ ব্যক্তির মনে তখনই জাগ্রত হয় যখন ব্যক্তি কোন-না-কোনভাবে জানে ও বিশ্বাস করে যে, ঈশ্বর করুণাময় এবং জীবের কল্যাণকামী। এই বিশ্বাস বা জ্ঞান ব্যক্তির মধ্যে দু'ভাবে আসতে পারে- আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে ব্যক্তির বিচারমূলক জ্ঞান থেকে এবং শাস্ত্রের বা গুরুর উপদেশ থেকে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই ঈশ্বরে বিশ্বাস ব্যক্তির মনে জাগতে পারে না বা সুদৃঢ় হতে পারে না যদি মন অশুচি, চঞ্চল ও অস্থির থাকে। দেহ-মনের শুচিতার জন্য সাধারণত প্রয়োজন অষ্টাঙ্গ যোগের অভ্যাস[২৬]

Dhaka University Institutional Repository

এবং রাগ-দ্বেষ মোহমুক্ত হয়ে কর্ম সম্পাদন করা। যখন ব্যক্তির দেহ মন শুদ্ধ হয়ে ওঠে তখন শাস্ত্র বাক্য পাঠ করে এবং গুরুর উপদেশ শ্রবণ করে তার মনে ঈশ্বরে বিশ্বাস জাগ্রত হয়। কাজেই ভক্তিমার্গ অনুসরণকারী ব্যক্তি রাজযোগ, জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ উপেক্ষা করতে পারেনা। গীতায় ভগবান কৃষ্ণ তা সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন।[২৭]

চিত্ত শুদ্ধির অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে মন বুদ্ধির একাগ্রতা সম্পাদন। ইন্দ্রিয় ও বিষয়বুদ্ধি তাড়িত চঞ্চল মনের দ্বারা দৃঢ় আত্মার ধারণা করা সম্ভব নয়। তাই পরম সত্তার দর্শন বা অতীন্দ্রিয় অনুভূতির জন্য প্রয়োজন স্মৃতিলব্ধ বা অবিচ্ছিন্ন স্মৃতিধারা[২৮] সূক্ষ্ম বুদ্ধি[২৯] অর্থাৎ যে নির্মল বুদ্ধির দ্বারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল পৃথিবীর উর্ধ্বস্থ সূক্ষ্ম বিষয়ের চিন্তাকরা সম্ভব, প্রজ্ঞান বা বিজ্ঞান।[৩০] ইহার কোনটাই চিত্ত শুদ্ধি ব্যতীত অর্জন করা যায় না।

গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে (১৬/১৩) চিত্ত শুদ্ধি, আত্মজ্ঞান নিষ্ঠা প্রভৃতি দৈবী প্রকৃতির ছাব্বিশটি গুণের উল্লেখ করা হয়েছে। এই ছাব্বিশটি সাত্ত্বিক গুণ এবং ত্রয়োদশ অধ্যায়োক্ত কুড়িটি জ্ঞানীর লক্ষণ[৩১] প্রায় একই। এই গুলো মোক্ষ পথের সহায়ক। তাই আধ্যাত্মিক উন্নতিকামী ব্যক্তি মাত্রেরই এই গুণগুলোর অনুশীলন করা প্রয়োজন। এগুলো হলো- নির্ভীকতা, চিত্তশুদ্ধি, আত্মজ্ঞান নিষ্ঠা ও কর্মযোগে তৎপরতা, দান, বাহ্যেন্দ্রিয় সংযম, যজ্ঞ, শাস্ত্র অধ্যয়ন, তপঃ সরলতা, অহিংসা, সত্য অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, পরনিন্দা বর্জন, জীবে দয়া, লোভহীনতা, মৃদুতা, (অক্রৌর্য), কুকর্মে লজ্জা, অচাঞ্চল্য, তেজস্বিতা, ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ, দ্রোহ বা হিংসা না করা, অনভিমান।

অন্যদিকে দেবর্ষি নারদের মতে নারায়ণ ঋষি কর্তৃক প্রপঞ্চিত সনাতন ধর্ম এই ত্রিশ লক্ষণ যুক্ত।[৩২] যথা- (১) সত্য, (২) দয়া, (৩) তপঃ, (৪) শৌচ, (৫) তিতিক্ষা, (৬) ঈক্ষা (বা বিচার) (৭) শম, (৮) দম, (৯) অহিংসা, (১০) ব্রহ্মচর্য্য (১১) ত্যাগ, (১২) স্বাধ্যায়, (১৩) আর্জব, (১৪) সন্তোষ, (১৫) সমদৃষ্টি (১৬) সেবা, (১৭) গ্রাম্যেহোপরম, (১৮) মনুষ্যের ভাগ্য বিপর্যয় বিচার, (১৯) মৌন, (২০) আত্মবিচার, (২১) সমস্ত প্রাণীদিগতে, বিশেষত মনুষ্যদিগেতে, আত্মবুদ্ধি ও ভগবদ্‌বুদ্ধি এবং সেইহেতু অন্নাদির যথাযোগ্য সংবিভাগ (২২-৩০) ভগবানের নাম শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, সেবা, ইজ্যা, অবনতি, দাস্য, সখ্য এবং আত্মসমর্পন (নবধা ভক্তি)। এগুলো মনুষ্যগণের পরমধর্ম, এগুলো পালন করলে সর্বাত্মা হরি সন্তুষ্ট হন এবং আপনাকে প্রদান

Dhaka University Institutional Repository

করেন। অর্থাৎ ভক্তের নিকট আপন প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করেন, যাতে সে তাঁর মায়া অতিক্রম করে।

গীতা এবং ভাগবত জ্ঞান-ভক্তি নির্বিশেষে সকল যোগীর পক্ষেই দৈবী সম্পদের যে তালিকা দিয়েছেন তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে সেগুলো উপনিষদ নির্দেশিত কয়েকটি প্রশস্ততর পন্থা হতে উদ্ভূত এবং পরম সত্তাকে লাভের প্রাথমিক পদক্ষেপ-চিত্ত শুদ্ধির জন্য এ গুলো অপরিহার্য। নিম্নে ক্রমানুসারে এগুলো আলোচনা করা হলো। উল্লেখ্য যে, মানুষের আধ্যাত্মিক স্তর বা গ্রহণ ক্ষমতার ভিন্নতা হেতু বর্তমান তালিকাভুক্ত চিত্ত শুদ্ধির আঙ্গিকগুলোর মধ্যে কোনটি কখন অবলম্বন করতে হবে এ বিষয়ে বিভিন্ন সম্পদায়ের মধ্যে মতভেদ থাকতে পারে। কিন্তু হিন্দু ধর্মের প্রত্যেক মার্গ ও সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য যেহেতু এক ব্রহ্মত্ব লাভ করা, তাই ব্রহ্ম সাযুজ্য লাভ করতে হলে নিম্নোক্ত প্রায় সবগুলো সোপানই অতিক্রম করতে হবে।

৪.২.১. যম

অহিংসা সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ (রাজযোগের) এই পঞ্চাঙ্গ সাধনকে বলা হয় যম। ইহা প্রত্যেক নর-নারী, জাতি, দেশ-কাল নির্বিশেষে সকলের জন্য প্রযোজ্য। ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করতে হলে এ গুণগুলো অর্জন করা প্রয়োজন। নিম্নে এগুলো বর্ণনা করা হলো।

(ক) অহিংসা

অহিংসা অর্থ সর্বভূতের (মানুষ, পশু বা হীনতর প্রাণী) প্রত্যেকের প্রতিই শত্রুভাব, ঘৃণা, এমনকি কারও অনিষ্ট চিন্তা পর্যন্ত ত্যাগ করা। সুতরাং যিনি অহিংস সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন, তিনি নির্বৈর বা শত্রুহীন হবেন। হিন্দুধর্মের এই অহিংসা বেদান্তের নিগূঢ় তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। পরমাত্মা সর্বভূতের অন্তরে অবস্থিত আছেন। এই সমদর্শন যিনি উপলব্ধি করেন তিনি বুঝেন যে অপর কোনও জীবকে হত্যা বা হিংসা করার অর্থ হলো নিজের আত্মাকেই হিংসা করা।[৩৩] এই রূপ কায়মনোবাক্যে অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হলে একমাত্র অহিংসা দ্বারাই সেই সাধক মুক্তিপ্রাপ্ত হবেন। উল্লেখ্য যে অহিংসা কেবল অপরের প্রতি দ্বেষহীনতাই নহে; ইহা হতে উপজাত হয় দুটি স্বতন্ত্র গুণ, মৈত্রী ও করুণা।[৩৪] গীতা মতে যিনি কোন প্রাণীর প্রতি দ্বেষ করেন না,

Dhaka University Institutional Repository

পক্ষান্তরে সকালের সাথে মিত্রভাবে ব্যবহার করে এবং সকল দুঃখীর প্রতি করুণাবান, সে ভক্ত ভগবানের প্রিয় (১২/১৩-১৪)। অন্যকথায় যেহেতু ভগবান সর্বভূতের সুহৃৎ[৩৭] সুতরাং, সর্বভূতহিতে রতি ভগবদ্ভাবেরই অনুকৃতি মাত্র।

(খ) সত্য

বিশুদ্ধসত্ত্ব হতে হলে (বা আত্মজ্ঞান লাভ করতে হলে) প্রয়োজন অবিচল সত্যনিষ্ঠা। সত্য অর্থ সত্য ভাষণ, সত্যের উপলব্ধি ও অনুষ্ঠান। গীতার সত্যকে বাঙময় বা বাচিক তপস্যা বলে অভিহিত করা হয়েছে (১৭/১৫)। একই অর্থে মনু অপ্রিয় সত্য বর্জন করে প্রিয় সত্য উচ্চারণকে সনাতন ধর্ম বলে অভিহিত করেছেন ৪/১৩৮। উপনিষদেও অনেক ক্ষেত্রে সত্য ভাষণের প্রয়োজনীয়তা উক্ত হয়েছে। যার অস্তিত্ব আছে তা সৎ এবং সত্য।[৩৬] উপনিষদমতে ব্রহ্মই একমাত্র সৎ বস্তু। সুতরাং ব্রহ্মই একমাত্র সত্য; অন্য যা কিছু সবই ব্রহ্ম হতে উদ্ভূত এবং ব্রহ্মতে লয়প্রাপ্ত হবে। কাজেই সত্য স্বরূপ ব্রহ্মকে লাভ করতে হলে আমাদের সত্যভাষী ও সত্য সন্ধ হতে হবে।

(গ) অস্তেয়

সাধারণত অস্তেয় অর্থ চুরি না করা। কিন্তু হিন্দুধর্মে অস্তেয় শব্দটি ব্যাপকতর অর্থে অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে পরদ্রব্যের প্রতি নিস্পৃহ এই অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে। কারণ কেবলমাত্র পরের দ্রব্য হস্তগত নয় বরং ইহার প্রতি লোভ করাও মুক্তি পথের অন্তরায়। কাজেই আত্মশুদ্ধির জন্য অস্তেয় অপরিহার্য।

(ঘ) ব্রহ্মচর্য

ব্রহ্মচর্য হলো হিন্দুধর্মের চতুরাশ্রমের প্রথম আশ্রম। এ অবস্থায় ব্রহ্মচারী গুরুগৃহে বাস করে এবং গুরুসেবা করে বিদ্যার্জন করবেন। এই আশ্রমের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ব্রহ্মচর্য পালন, ইহাতে শুধু যে অবিবাহিত জীবন বুঝায় তা নয়, বরং ইহাতে সর্বপ্রকারের ইন্দ্রিয়ানুশাসন সূচিত হয়। কর্মদ্বারা, বাক্যদ্বারা ও মনের দ্বারা সর্বদা মৈথুন ত্যাগের নাম ব্রহ্মচর্য। এ অবস্থায় সাধক যা অর্জন করতে চান তা হচ্ছে ব্রহ্মবিদ্যা, যার জন্য প্রয়োজন ইন্দ্রিয়সমূহকে অন্তর্মুখী করা। ব্রহ্মচর্য তারই ভিত্তি স্বরূপ। সুতরাং চতুরাশ্রমের প্রথম আশ্রম ব্রহ্মচর্য হলেও মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য যে চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন এর জন্য আশ্রম নির্বিশেষে ব্রহ্মচর্যের প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

(ঙ) অপরিগ্রহ

যে কোন অবস্থায় কারো নিকট হতে দান, উপহার গ্রহণ না করাকে অপরিগ্রহ বলে। দান ইত্যাদি গ্রহণে হৃদয় সঙ্কুচিত হয়, চিত্তের স্বাধীনতা বিনষ্ট হয়, মানুষ হীন হয়ে যায়। (কারণ এর ফলে গ্রহীতার দাতার প্রতি দাস মনোভাব ও কামনা জন্মিতে বাধ্য।) কাজেই ভক্ত কারো নিকট হতে কিছু গ্রহণ করবেন না এমনকি আকাঙ্ক্ষাও করবেন না, বরং সর্বাবস্থায় ভগবানের প্রতি নির্ভরশীল হবেন। অপরিগ্রহের মূলে দুটিগুণ বিদ্যমান আছে একটি স্বাবলম্বন অপরটি বৈরাগ্য।

২. নিয়ম

রাজযোগের অষ্টাঙ্গ সাধনের দ্বিতীয়টি হচ্ছে নিয়ম। ইহার পাঁচটি অঙ্গ- শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রনিধান। এগুলো রাজযোগের অন্তর্গত হলেও অন্যান্য মার্গাবলম্বিগণের পক্ষেও অবশ্য কর্তব্য।

(ক) শৌচ

শৌচ বলতে সাধারণত পরিচ্ছন্নতা বুঝায়। কিন্তু চিত্তশুদ্ধির জন্য যে শৌচ অবলম্বন করা প্রয়োজন তা দ্বিবিধ: বাহ্য শৌচ এবং আন্তঃশৌচ। ইহারা সাপেক্ষ। অশুদ্ধ দেহে সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে মনঃশুদ্ধি বা মনঃ সংযোগ আশা করা যায় না। তাই যে পর্যন্ত মানসশৌচ (আন্তঃ শৌচ) শিক্ষা না হয় ততদিন যত্ন সহকারে বাহ্য শৌচ পালন করা উচিত। মৃত্তিকা, জল ইত্যাদির সহায়তায় দৈহিক শুদ্ধি সম্পাদনকে বাহ্য শৌচ বলে।[৩৭] অন্যদিকে আন্তঃশৌচ বা মনঃ শুদ্ধি অধ্যাত্মবিদ্যা দ্বারা লভ্য। এ প্রসংগে যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, ধর্মের অনুীলন এবং পিতা ও আচার্যের নিকট হতে কায়মনোবাক্যে শ্রদ্ধা-ভক্তি সহকারে অধ্যাত্মবিদ্যা অর্জন করে মনঃশুদ্ধি সম্পন্ন করতে হয়।[৩৮] মনঃ শুদ্ধির জন্য কামনাও ত্যাগ করতে হয়। এই জন্য ভাগবত বলেন যে, প্রকৃত শৌচ-স্নানাদি বাহ্যক্রিয়ার দ্বারা সম্পন্ন হবে না, ইহার জন্য প্রয়োজন কর্মে বা কর্মফলে পূর্ণ অনাসক্তি।[৩৯] মহাভারতে মানসিক সুকৃতিকে আভ্যন্তর শৌচ বলা হয়েছে। ইহার উপাদান সর্বজীবের কল্যাণ কামনা, সত্যাশ্রয়, সরলতা, ব্রতোপবাস ব্রহ্মচর্য দম ও শম।[৪০]

Dhaka University Institutional Repository

(খ) সন্তোষ

সন্তোষ অর্থ জীবনযাপনের জন্য যখন যা জোটে তাতেই সন্তুষ্ট থাকা। মানুষের অফুরন্ত অভাব পূরণের বাসনা দুঃখের মূল উৎস। কাজেই সমাহিত ও সুখী হতে হলে অযাচিতভাবে যা পাওয়া যায় তাতেই সন্তুষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

(গ) তপস্যা

একাগ্রতা ও চিত্তশুদ্ধির জন্য তপস্যার প্রয়োজন এই জন্য ইহাকে ব্রহ্মবিদ্যার প্রতিষ্ঠা বা পাদসমূহের অন্যতম বলা হয়েছে।[৪১] ব্রহ্ম দর্শন ব্রহ্মেরই কৃপাসাধ্য। তপস্য সেই কৃপালাভ করাবার জন্য একটি উপায়। কারণ একাগ্রতাহীন, অশান্ত ব্যক্তি আত্ম জ্ঞান বা ব্রহ্মপ্রাপ্তির আশা করতে পারেন না। তাই যতক্ষণ ব্রহ্মজিজ্ঞাসার নিবৃত্তি না হয়, ততক্ষণ ব্রহ্ম কী তা জানবার জন্য তপস্যা করে যেতে হবে।

তপস্যা শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে কোন সংকল্প বা ব্রতের চর্চা বা সাধন। ব্যাপকতর অর্থে তপস্যা একটি সামগ্রিক নিয়মানুবর্তিতা বা বিধিবদ্ধ ঐকান্তিক আচরণ। যার দ্বারা সাধকের চিত্তের পরিশোধন কার্য সম্পাদিত হয় এবং ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথ সুগম হয়। ভক্তি মতে তপস্য অপরিহার্য, কারণ অহংলোপ না হলো ভগবানকে ঐকান্তিক এবং অহেতুক ভালবাসা যায় না এবং এই অহঙ্কার ত্যাগের একটি উপায় হচ্ছে তপস্যার বিবিধ অনুষ্ঠান।[৪২] গীতা মতে, শরীরাদি ভেদে তপস্যা তিন প্রকার।[৪৩] শারীরিক, বাচিক এবং মানসিক। সামগ্রিক বিশুদ্ধিলাভ করতে হলে এই ত্রিবিধ তপস্যা অনুষ্ঠান করতে হবে।

(ঘ) স্বাধ্যায়

মন্ত্র জপ, বেদপাঠ বা ধর্মশাস্ত্রাদির অধ্যয়নকে স্বাধ্যায় বলে। উপনিষদ অনুসারে আত্মাকে দর্শন করতে হলে শ্রবণ মনন ও ধ্যান এই তিনটি উপায়কে পর্যায়ক্রমে অবলম্বন করতে হবে।[৪৪] অর্থাৎ প্রথমে আচার্য শাস্ত্রকারগণ যা বলেছেন তা শ্রবণ করে বারবার তাতে মনকে নিবদ্ধ করতে হবে, এইরূপে মন নিশ্চল হলে তখন আত্মাকে একাগ্রচিত্তে ধ্যান করলে পরমাত্মা চিত্তমুকুরে প্রতিফলিত হন।

Dhaka University Institutional Repository

(ঙ) ঈশ্বর প্রণিধান

ব্রহ্মের সাকাররূপ ভক্তি সহকারে পূজা করাকে ঈশ্বর প্রণিধান বলে। ইহা ভক্তিমতের সারতত্ত্ব হলেও রাজযোগের সমাধি এবং জ্ঞানযোগের মোক্ষ বা ব্রহ্মপ্রাপ্তির সহায়ক।

ভক্তিমার্গে ঈশ্বর উপাসনার স্থান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভক্তির উদ্দেশ্য ভগবানকে ঐকান্তিকভাবে ভালবাসা। এ জন্য ঈশ্বর ভিন্ন অন্য বিষয়ে অনুরাগ এবং অন্য কর্মাদি বর্জন করে একমাত্র ঈশ্বরকেই কায়মনোবাক্যে আশ্রয় করা আবশ্যক। তাই পূজা ও ঈশ্বরোপাসনার অন্যান্য আঙ্গিকের প্রতি অনুরাগকেই ভক্তি বলা হয়েছে। ঈশ্বর উপাসনার অন্যতম মাধ্যম প্রতীক উপাসনা। প্রাকৃতিক বস্তু অথবা চিহ্নের মাধ্যমে ঈশ্বর অথবা দেব-দেবীর উপাসনা প্রতীক উপাসনা হিসেবে বিবেচিত। একইভাবে প্রতীক অথবা ছবি অথবা প্রতিকৃতির উপাসনা প্রতীক উপাসনা। বস্তুতপক্ষে প্রতীক এবং প্রতীমা উভয়ের উপাসনা হল ঈশ্বরের উপাসনা। ঈশ্বর উপাসনার অপর একটি মাধ্যম অবতারদের উপাসনা। অর্থাৎ যেসব স্বর্গীয় ব্যক্তিত্ব পৃথিবীতে অবতর হিসেবে বিবেচিত তাদের ভালবেসে ঈশ্বরকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করা যায়। এ সকল ক্রিয়া অবলম্বনে চিত্তশুদ্ধ হয় এবং পরিণামে সাধকের চিত্ত ভগবানে লীন হয় বা স্বীয় হৃদয়ে তিনি তাঁকে উপলব্ধি করেন। অবশ্য বাহ্যিক পূজার আবশ্যকতা ততক্ষণ, যতক্ষণ সাধকের এই উপলব্ধি না জন্মে যে ঈশ্বর সর্বভূতে অবস্থিত; সুতরাং তিনি তো সাধকের নিজ হৃদয়েই আছেন।

(৩) জপ

জপ শব্দের অর্থ পুনঃপুনঃ আবৃতি। অর্থাৎ আত্মদর্শন বা ব্রহ্ম দর্শনের উদ্দেশ্যে পুনঃপুনঃ আত্মার চিন্তা ও ধ্যানকে জপ বলে। যাজ্ঞবল্ক্যের মতে জপ বা অভ্যাস দ্বিবিধ[৭৭]- (ক) অধীত শাস্ত্রের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি-- ইহাকে স্বাধ্যায়েরই অঙ্গ বলা যেতে পারে। (খ) গুরু উপদিষ্ট বেদনির্দেশিত মন্ত্রের অভ্যাস। বর্তমানকালে, এই মন্ত্রজপকেই আমরা জপ বলে জানি। গুরুর নিকট দীক্ষা নিবার সময় গুরু শিষ্যের কর্ণকুহরে তার ইষ্ট দেবতা ও সেই দেবতার জপের জন্য তন্ত্রোক্ত বীজমন্ত্র প্রদান করেন। শিষ্য সঙ্গোপনে সেই বীজমন্ত্র জপ করে ইষ্ট দেবতার সান্নিধ্য ও কৃপালাভ করতে যত্নবান হন। ভক্তি মতে ইষ্টমন্ত্র জপ করে সিদ্ধিলাভ করলে ইষ্ট দেবতা, সেই মন্ত্রের ধ্যানমূর্তিতে সাধকের সম্মুখে

Dhaka University Institutional Repository

আবির্ভূত হন। রাজযোগে মন্ত্র জপ সিদ্ধিলাভের অন্যতম উপায়। জপের মাহাত্ম্য সম্পর্কে মনু বলেন যে, যদি কোন ব্রাহ্মণ বৈদিক যজ্ঞাদি নাও করেন, শুধুমাত্র ওঁকার (যা ব্রহ্মের বাচক বা প্রকাশক) ও ব্যহৃতি পূর্বক ত্রিপাদ গায়ত্রীমন্ত্র জপ করেই তিনি সিদ্ধিলাভ করতে পারেন।[৪৬] গীতাও যজ্ঞসমূহের মধ্যে জপযজ্ঞের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেছেন।[৪৭] কারণ, জপযজ্ঞে কোনরূপ আড়ম্বর উপকরণের প্রয়োজন নেই।

জপের দ্বারা সিদ্ধিলাভ করতে হলে তৎপূর্বে সাধককে যম, নিয়ম, শম, দমাদি দৈবী সম্পদ অর্জন করতে হবে। কারণ জপ নিবৃত্তি মার্গের সোপান। সুতরাং জাপক যদি ফল কামনা করে জপ করেন অথবা চঞ্চল চিত্তে বা অবহেলা করে জপ করেন কিংবা জপলব্ধ যৌগিক ঐশ্বর্য্যাদির প্রতি অনুরক্ত হন বা অহঙ্কার বা মোহগ্রস্ত হন, তা হলে তিনি জপের ফল হতে বঞ্চিত হয়ে পুনর্জন্মরূপ নরকে পতিত হবেন।

(৪) দম

দম, শম সাধনার প্রাথমিক পর্যায়। দম সাধনের ফলেই শমলাভ হয়ে থাকে। বিষয়সমূহ হতে সমস্ত ইন্দ্রিয়সমূহকে প্রত্যহৃত করে তাদের নিজ নিজ স্থানে নিশ্চল অবস্থায় নিরুদ্ধ করাকে দম বলা হয়।[৪৮] এই অবস্থায় ইন্দ্রিয়সমূহকে দমন করা হয় বলে এই সাধনকে দম বলা হয়। দম সাধনে সফল হলে, সেই নিশ্চল চিত্তকে ব্রহ্মলাভের জন্য স্থিরীকৃত করা যায় এবং সাধক শান্তি প্রাপ্ত হন।

ইন্দ্রিরগুলোকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা- বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়। অন্তরিন্দ্রিয় চারটি- মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত। অন্যদিকে বহিরিন্দ্রিয় দুই প্রকার- কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়। আবার কর্মেন্দ্রিয় পাঁচটি যথা, বাক, পানি, পাদ, পায়ু (মলদ্বার) ও উপস্থ (লিঙ্গ) এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটি যথা, কর্ণ, ত্বক, নেত্র, জিহ্বা ও নাসিকা- যা দ্বারা আমরা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ আস্বাদন করি। এ বহিরিন্দ্রিয়সমূহের সংযমকে দম বলে। ইহা দুরূহ সাধন। তাই নির্জনবাস দম অভ্যাসের অনুকূল।

(৫) শম

অন্তরিন্দ্রিয় সংযমকে শম বলা হয়, সাধকের লক্ষ্য হচ্ছে পরমাত্মার সাথে মিলন। সেই লক্ষ্যে চিত্তকে নিশ্চলরূপে এবং নিয়ত প্রতিষ্ঠা করবার জন্য মনকে

Dhaka University Institutional Repository

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সমস্ত বিষয় হতে বৈরাগ্যের দ্বারা বিরত করে অহং বাসনা বা দেহাভিমান ত্যাগ করতে হবে। এই প্রক্রিয়াই শম। দম আয়ত্ত করতে পারলে শম সহজসাধ্য হয়। ইন্দ্রিয়সমূহ মনের দ্বারা পরিচালিত হয় বলে মনকে সংযত করতে না পারলে কায়িক কৃচ্ছসাধনের দ্বারা ইন্দ্রিয় সংযমের চেষ্টা মিথ্যাচার এবং নিষ্ফল হবে। বুদ্ধি হচ্ছে মনের নিয়ন্তা। যখন মন বিষয়ের দিকে ধাবিত হয় তখন তাকে সংযত করতে পারে বুদ্ধি বা পরমাত্মাই অনন্দ ও অমৃতময় তুচ্ছ বিষয় নয়- এইরূপ বিচার। বিবেক -বুদ্ধি সম্পন্ন জ্ঞানী ব্যক্তি মনোরূপ বল্গা দ্বারা ইন্দ্রিয়কে বশে এনে সংসার মার্গ অতিক্রম করে ব্রহ্মপদ লাভ করেন। তাই সংক্ষেপে বলা যায় জ্ঞানের দ্বারা বুদ্ধিকে, বুদ্ধির দ্বারা মনকে, এবং মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহকে নির্মল ও শুদ্ধ করতে পারলে সেই বিশুদ্ধ সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও মন দ্বারা পরমাত্মাকে দর্শন করা যায়। কিন্তু মনোজয় ব্যতীত শম বা শান্তিলাভ করা যায় না। উল্লেখ্য যে, শমসাধনায় সিদ্ধি লাভের জন্য প্রয়োজন রিপুদমন, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা ও সমাধান।

ক) রিপুদমন

শমের জন্য প্রয়োজন কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য এই ষড়রিপুর দমন।[৪৯] কারণ কাম (কামনা) ক্রোধ, লোভ, মোহ (অনিত্য বিষয়ে আসক্তি), মদ (ধন-জন-যৌবন গর্ব) এবং মাৎসর্য্য (পরশ্রীকাতরতা) ইন্দ্রিয়ের এই বিকারগুলো মানুষকে অনেকটা জোর করে পাপের পথে পরিচালিত করে। ইহারা দুষ্পূরণীয় এবং অতিশয় উগ্র। ভোগের দ্বারা এদের তৃপ্তি সাধন করা যায় না। বরং ইহাদের প্রকৃতি এরূপ যে ইহাদের একটি থেকে অন্যটির উদ্ভব। যেমন, বিষয়াসক্তি হতে কামনা অর্থাৎ সেই বিষয় লাভের অভিলাষ জন্মে, সেই কামনা কোন কারণে প্রতিহত বা বাধাপ্রাপ্ত হলে প্রতিরোধকের প্রতি ক্রোধ জন্মে, ক্রোধ হতে মোহ, মোহ হতে স্মৃতিভ্রংশ, স্মৃতিভ্রংশ হতে বুদ্ধি নাশ, বুদ্ধি নাশ হতে বিনাশ ঘটে।[৫০] ইহারা সকলেই আত্মজ্ঞান এবং আত্মোন্নতির পথে অন্তরায় স্বরূপ বলে ইহাদেরকে রিপু বা শত্রু বলা হয়; তন্মধ্যে আদি রিপু কাম হতে অপর রিপুগুলো উদ্ভূত ও উত্তেজিত হয় বলে কামকে গীতায় প্রধান এবং দুর্জয় শত্রু বলা হয়েছে।[৫১] সুতরাং যাদের ইন্দ্রিয়নিরোধ হয়নি তাদের পক্ষে বেদাধ্যয়ন তপস্যা ইত্যাদি কোন কিছুতেই সিদ্ধিলাভ হবে না।

Dhaka University Institutional Repository

(খ) উপরতি

শম সাধনার পরবর্তী উপায় হচ্ছে উপরতি। স্থূলভাবে উপরতি ও নিবৃত্তি সমার্থক। ইন্দ্রিয়ভোগ হতে কায়মনোবাক্যে বিরত হওয়াকে উপরতি বলে। সাধন মার্গে দমের পরবর্তী অবস্থা হচ্ছে উপরতি। বাহ্যেন্দ্রিয়কে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ব্যতীত অপর সর্ব বিষয় হতে চেষ্টা করে সংযত করাকে দম বলে। এইরূপ চেষ্টার দ্বারা যে অবস্থায় উপনীত হওয়া যায় তাকে উপরতি বলে। অর্থাৎ তখন আর চেষ্টার প্রয়োজন হবে না। তখন স্বভাবতই বিষয় ভোগে আর প্রবৃত্তি হবে না। উপরতি অভাবে মন অশান্ত হয় এবং এইরূপ চঞ্চলচিত্ত ব্যক্তির আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় না; পরন্তু উপরত বা শান্ত চিত্ত ব্যক্তি প্রজ্ঞার সহায়তায় এই জ্ঞান লাভ করতে পারেন।[৫৯] অর্থাৎ সংযতেন্দ্রিয় সমাহিত চিত্তেই আত্মা প্রতিভাত হন।

উপরতির সাধনাও অত্যন্ত দুরুহ। এজন্য মনকে ধীরে ধীরে বিষয় হতে নিরুদ্ধ করার অভ্যাস করতে হবে এবং ইহাতে সাধক এমন এক অবস্থায় উপনীত হবেন, যখন মন সম্পূর্ণ রূপে চিন্তাশূন্য হবে। যিনি এই অবস্থা আয়ত্ত করতে পেরেছেন তাকে আত্মরাম বলা হয়।[৫৩]

(গ) তিতিক্ষা

চিত্তকে যদি অবিচল রাখতে হয় তাহলে শারীরিক বা মানসিক আলোড়ন করে এরূপ পরস্পর বিরোধী ভাবের দ্বারা অভিভূত না হয়ে শীত, উষ্ণ, হর্ষ-বিষাদ, লাভ-ক্ষতি, মান-অপমান ইত্যাদিকে তুল্যরূপে গ্রহণ করতে হবে। ইহাই তিতিক্ষা, সকল যোগের পক্ষেই যে ইহা প্রয়োজন তা গীতা[৫৪] ও ভাগবত পুনঃ পুনঃ বলেছেন।

সহিষ্ণুতা তিতিক্ষার লক্ষণ। যে কোনরূপ দুঃখই আসুক-না কেন, সে বিষয়ে বিচলিত না হওয়া,কোনরূপে প্রকাশ না করা এবং প্রতিকারের কোন চেষ্টা না করা, এগুলো তিতিক্ষার লক্ষণ।[৫৫] এরূপ যিনি সকল প্রকার দুঃখ (আধ্যাত্মিক, অধিদৈবিক ও অধিভৌতিক) সহ্য করতে পারেন তাকে স্থিত প্রজ্ঞ মুনি বলা হয়। এরূপ স্থিতপজ্ঞ ব্যক্তিই মোক্ষ বা অমৃতত্ত্বলাভের অধিকারী।[৫৬]

Dhaka University Institutional Repository

(ঘ) শ্রদ্ধা

বেদ ও গুরু বাক্যকে সত্য বলে অন্তরে গ্রহণ করাকে শ্রদ্ধা বলে এবং এর সহায়তাই ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ হয়। কারণ কেবল অন্ধবিশ্বাসের দ্বারা আধ্যাত্মিক মার্গের চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছা যায় না। এর জন্য প্রয়োজন পরিপ্রশ্ন,[৫৭] তত্ত্বজিজ্ঞাসা; কেননা বিচারের দ্বারা সব প্রশ্নের মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত শাস্ত্র বা আচার্য হতে লব্ধ জ্ঞানে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাতে পারে না; অপর দিকে সদুত্তর পাবার পরও যার সংশয় দূর হয় না তার কখনই জ্ঞান লাভ হয় না। আত্মা অতীন্দ্রিয় অনুভূতি দ্বারা লভ্য তর্কের বিষয় নয়।[৫৮] কাজেই গুরু ও শাস্ত্র বাক্যে যার শ্রদ্ধা নেই তার পক্ষে মোক্ষ লাভ সম্ভব নয়।

(চ) সমাধান

শমের অন্তর্গত ষষ্ঠ সম্পদ হলো সমাধান। ব্রহ্মই একমাত্র লক্ষ্য এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত করে একাগ্রচিত্তে সেই ব্রহ্মে বুদ্ধিকে সংলগ্ন করে রাখাকে সমাধান বলে। কৌতূহল বশে শাস্ত্রপাঠ হতে তৃপ্তি হতে পারে, কিন্তু সমাধান হয় না। ইহার জন্য প্রয়োজন, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য সর্ব বিষয় হতে চিত্তকে সংযত করে একমাত্র ভগবদ্বিষয়ের শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনে নিয়োজিত করা।

(ঙ) দান

ছান্দোগ্য উপনিষদে দানকে ধর্মের প্রথম সোপানের মধ্যে অন্তর্গত করে ধর্ম সাধনায় ইহার গুরুত্ব নির্দেশ করা হয়েছে।[৫৯] গীতাও দানকে যজ্ঞ ও তপস্যার সাথে চিত্তশুদ্ধির অন্যতম উপায় হিসেবে নির্দেশ করেছে।[৬০] কোন রূপ ফল বা উপকার কামনা না করে বা কষ্টবোধ না করে, লোক হিতার্থ এবং কর্তব্যবোধে দান করলে মমত্ববোধ ক্ষয়প্রাপ্ত হবে ইহা সহজেই অনুমেয়। এই জন্যই ইহাকে পুরুষযজ্ঞের দক্ষিণা বলা হয়েছে।[৬১] কিন্তু যথেচ্ছ দান শাস্ত্রানুমোদিত নয়। দানকে ধর্মের সোপানরূপে পরিণত করতে হলে কয়েকটি নির্দিষ্ট অনুশাসন মেনে চলতে হবে। যেমন,

ক) যে ধন দান করবে তা ন্যায়ার্জিত হতে হবে।

খ) পরিমাণ যাই হউকনা কেন, শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে দান করতে হবে।

গ) সামর্থানুসারে দান করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

ঘ) বিনম্রভাবে দান করতে হবে।

ঙ) দানের গ্রহীতাকে মিতভাবে দান করতে হবে।

চ) অযোগ্য ব্যক্তিকে (যেমন মদ্যপ, দুশ্চরিত্র ব্যক্তি) দান এবং সুপাত্রে দান না করা উভয়ই বিগর্হিত।

(৭) দয়া

গীতায় দয়াকে দৈবী সম্পদের অন্যতম বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।[৬১] মুক্তিকামী প্রত্যেক মানুষের পক্ষেই ইহার অনুশীলন অবশ্য কর্তব্য। অহিংসা ও দয়া উভয়ই মনুষ্যাদি সর্বভূতের প্রতি আচরণবিধি। অহিংসা নঞর্থক। ইহা দ্বারা হিংসা বা শত্রুতা না করা বুঝায়, অন্যদিকে দয়া নির্দেশবাচক অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে ও কর্ম দ্বারা সমস্ত প্রাণীকে অনুগ্রহ করার ইচ্ছাকে নির্দেশ করে। দয়া হতে উদ্ভূত অপর একটি গুণের নাম করুণা। যাঁর শত্রুমিত্রে ভেদজ্ঞান নাই, তিনি শত্রুকে ক্ষমা করেন এবং সর্বভূতে সমদর্শী বলে দুঃখী ব্যক্তিকে তিনি দয়া এবং অজ্ঞান ব্যক্তিকে করুণা করেন। এই সম্পদ থাকলেই সর্বোপকারক হওয়া যায়। ভক্তিমতে ভগবৎকৃপা লাভ করতে হলে সর্বভূতে দয়া অপরিহার্য,[৬৩] কারণ তিনি নিজেই সর্বভূতের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছেন।

উপর্যুক্ত গুণসমূহ অনুশীলনের ফলে ভক্তের চিত্ত সম্যক পরিশুদ্ধ হয় এবং ভগবদ্‌গুণ শ্রবণ মাত্র অনায়াসে এবং শ্রীঘ্র তাঁতে নিবিষ্ট হয়; ফলে ব্রহ্মভাব লাভে তিনি সমর্থ হন।

৪.৩. মুক্তি লাভের উপায় হিসেবে ভক্তি।

প্রাচীন ভাগবতধর্মে ভক্তিকে অতি প্রাধান্য দেওয়া হত এবং ভগবদ্‌লাভের প্রায় শ্রেষ্ঠ উপায় বলে মনে করা হত। ভগবান নারায়ণ ঋষি বলেছেন যে, বেদসমূহ এবং আশ্রমসমূহ অর্থাৎ বেদানুযায়ী সমস্ত আশ্রমের লোকগণ নানা মতে সমাস্থিত হয়েও যদি ভক্তি সহকারে তাঁর সম্যক পূজা করে, তবে তাতে সন্তুষ্ট হয়ে তিনি শীঘ্র তাদেরকে সদ্‌গতি প্রদান করেন।[৬৪] নারায়ণীয়াখ্যানে বিবৃত হয়েছে যে শ্বেতদ্বীপবাসী মহাত্মাগণ ভক্তির দ্বারাই জগৎকারণ ভগবানকে প্রত্যক্ষ করেন।[৬৫] গীতায়ও ভক্তিযুক্ত নিষ্কামকর্মীকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। কৃষ্ণ বলেন, "সকল যোগীর মধ্যে সেই আমার মতে যুক্ততম (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতমযোগী)

Dhaka University Institutional Repository

যে আমাতে অন্তকরণ রেখে শ্রদ্ধা সহকারে আমার ভজন করে।"[৬৬] (বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণে বলা হয়েছে, ভগবদ্ভক্তি রহিত নিষ্কামকর্ম শোভা পায় না, তা ব্যর্থ। (১/৫/১২;১২/১২/৫২) সেখানে আরো বলা হয়েছে যে দান, ব্রত, তপ, হোম, জপ, স্বাধ্যায় এবং ইন্দ্রিয় সংযম তথা অপর যেসকল শ্রেয়োজনক কর্ম আছে, তৎসমস্তেরই একমাত্র সাধ্য ভগবানে ভক্তি। (১০/৪৭/২৪) ভক্তির মহিমা প্রকাশ করতে গিয়ে কৃষ্ণ বলেন- "আমি সর্বভূতের পক্ষেই সমান। আমার দ্বেষ্যও নাই, প্রিয়ও নাই। কিন্তু যারা ভক্তিপূর্বক আমার ভজনা করেন তাঁরা আমাতে অবস্থান করেন এবং আমিও সে সকল ভক্তেই অবস্থান করি। অতি দুরাচার ব্যক্তিও যদি অনন্যচিত্ত হয়ে আমার ভজনা করে, তাকে সাধু বলে মনে করবে। কেননা সে যথার্থ নিশ্চয়াত্মকবুদ্ধিযুক্ত হয়েছে। সে শীঘ্র ধর্মাত্মা হয় এবং নিত্য শান্তি লাভ করে। হে কৌন্তেয়, তুমি সর্ব সমক্ষে নিশ্চিত প্রতিজ্ঞা করে বলতে পার আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হয়না। কেননা হে পার্থ, স্ত্রীলোক, বৈশ্য ও শূদ্র অথবা যারা পাপযোনিসম্ভূত অন্তজঃজাতি, তারাও আমার আশ্রয় নিলে নিশ্চয়ই পরমগতি প্রাপ্ত হন।"[৬৭] অতঃপর কৃষ্ণ অর্জুনকে ভগবানের ভক্ত হতে উপদেশ দিয়ে বলেন, "তুমি সর্বদা মনকে আমার চিন্তায় নিযুক্ত কর, আমাতে ভক্তিমান হও, আমার পূজা কর, আমাকেই নমস্কার কর। এইরূপে মৎপরায়ন হয়ে আমাকে মন সমাহিত করতে পারলে আমাকে প্রাপ্ত হবে।"[৬৮]

ভক্তগণ কি প্রকারে ভাবযুক্ত হয়ে ভগবানে ভক্তির মাধ্যমে তাঁর প্রাসাদ লাভ করে তার বর্ণনা দিতে গিয়ে কৃষ্ণ বলেন 'তারা দৃঢ়ব্রত এবং (ইন্দ্রিয় সংযমাদি বিষয়ে) যত্নশীল হয়ে সতত আমার (লীলাদি) কীর্তন করে এবং আমাকে নমস্কার করে। এইরূপে ভক্তিদ্বারা নিত্যযুক্ত হয়ে তারা আমার উপাসনা করে।'[৬৯] 'তারা মচ্চিত্ত এবং মদগত প্রাণ হয়ে নিত্য পরস্পরকে আমার তত্ত্ব বুঝিয়ে থাকে এবং আমার (লীলাদি) কীর্তন করে থাকে তাতেই তারা প্রীতিলাভ করে এবং পরিতৃপ্ত থাকে।'[৭০] 'এই প্রকারে নিত্যযুক্ত হয়ে প্রীতি পূর্বক যারা আমার ভজনকারী তাদিগকে সেই বুদ্ধিযোগ (অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান) প্রদান করি যাতে তারা আমাকে প্রাপ্ত হয়। তাদের প্রতি অনুগ্রহার্থ আমি তাদের অন্তঃকরণে স্থিত হয়ে উজ্জ্বল জ্ঞানদীপ দ্বারা তাদের অজ্ঞানান্ধকার বিনষ্ট করি।'[৭১] অর্থাৎ ভগবান স্বয়ং তাঁর ভক্তের অন্তঃকরণে আপন স্বরূপের পূর্ণজ্ঞান জানিয়ে দেন; তাতেই তার মন অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয় এবং সে ভগবানে প্রবেশ করে।

Dhaka University Institutional Repository

ভাগবতধর্ম মতে ভক্তি দ্বারা চিত্তশুদ্ধিতে জ্ঞানোদয় হয়। ভাগবত পুরাণে বলা হয়েছে, 'ভগবান বিষ্ণুর চরণপ্রাপ্তির এষণা দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত তীব্র ভক্তি (রূপ অগ্নি দ্বারা মনুষ্যের) গুণকর্মজ চিত্তমলসমূহ দগ্ধ হয়; চিত্ত বিশুদ্ধ হলে মানুষ আত্মতত্ত্ব তেমন সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করে, যেমন নির্মল নেত্র সূর্যের প্রকাশ উপলব্ধি করে।'[৭২] ভাগবত পুরাণের বেশ কিছু স্থানে ভগবানের বা তাঁর লীলাবতারের চরিত্র শ্রবণ কীর্তন প্রভৃতি করে মানুষ অনায়াসে অজ্ঞানান্ধকার উত্তীর্ণ হতে পারে বলে উল্লেখ রয়েছে।[৭৩] অজ্ঞানতা থেকে মুক্ত হতে পারলেই জ্ঞানোদয় হয় এবং জ্ঞানোদয়ে মুক্তি লাভ সম্ভব হয়।

বেদান্ত দার্শনিকগণওমনে করেন ভক্তি হলো ঈশ্বর লাভের প্রধান উপায়। যেমন- শঙ্করাচার্য বলেন যে, ঈশ্বরের অনুরাগী হয়ে, তার উপাসনা করে, তার ভক্ত হয়ে তাঁকে পাওয়া যায়, জ্ঞানের দ্বারাও তাঁকে পাওয়া যায়। তবে ভক্তি হলো মুক্তি অর্জনের প্রধান মাধ্যম।[৭৪] ভক্তির মাধ্যমেই মন কার্যকরভাবে এবং সফলজনকভাবে বিশুদ্ধ হতে পারে। আবার রামানুজ বলেন, ভক্তি ব্যক্তিকে সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের প্রতি আত্মসমর্পণে উদ্বুদ্ধ করে। আর ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের (প্রপত্তির) মাধ্যমেই ভক্ত ঈশ্বরের কৃপালাভে সক্ষম হন। তিনি আরো বলেন, প্রিয়তম ব্যক্তি বরণীয় হয়। এই প্রিয়তম ব্যক্তির লক্ষণ বর্ণনা করে তিনি বলেন যে, যার নিকট পরমাত্মা নিরতিশয় প্রিয়, সেই তাঁর প্রিয়তম। তাঁকেই পরমাত্মা নিজের প্রকাশার্থ বরণ করেন। এবং ঐ প্রিয়তম ব্যক্তি যাতে তাঁকে পেতে পারে ভগবান স্বয়ং সে জন্য সচেষ্ট হয়। সুতরাং বেদান্তমতে সতত ভগবদ স্মরণ (ধ্যান) যার অতিশয় প্রিয় সেই ভগবানের প্রিয়তম এবং বরণীয় হয়; সেই ভগবানকে লাভ করতে পারে।

৫. ঐশী প্রেমের অবস্থা

ঐশী প্রেমের প্রাথমিক অবস্থায় সাধকের ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি তার চিন্তার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয় এবং প্রেমের চেয়ে শ্রদ্ধা ও ভয়ের অনুভূতিই ভক্তের বেশী থাকে। তিনি অনুভব করেন ঈশ্বর হলেন এ জগতের স্রষ্টা ও শাসক। এ সময়ে ভক্তের লক্ষ্য হচ্ছে কিভাবে সকল প্রকার দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে ঈশ্বরকে ভালবাসা যায়। কিন্তু যখন ঈশ্বরে ভালবাসা জন্মে তখন ভক্ত আর এ ধারণার মধ্যে নিমজ্জিত থাকেন না। তাঁর কাছে তখন ঈশ্বর হন প্রেমময় এবং ঈশ্বরের প্রেম তার চিন্তা, অনুভূতি এবং অনুরাগের একমাত্র চালিকাশক্তি হিসেবে পরিণত হয়। তাঁর প্রতি ভালবাসার প্রভাবে তার হাত কর্ম

Dhaka University Institutional Repository

করে, তার মন চিন্তা করে তার হৃদয় অনুভব করে। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে ভক্ত কেবল ঈশ্বরের জন্য বেঁচে থাকে। ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ আরো গভীর হলে সে ঈশ্বরের ভালবাসা এবং সহানুভূতির প্রতি মনযোগী হয় এবং ঈশ্বরের প্রতি তার আরো গভীর মনোযোগের সৃষ্টি হয়। এসময়ে ঈশ্বরকে সে নিজের জন্য অনুসন্ধান করে, সে অনুভব করে যে সেই তিনি; তিনিই সে। এই অনুভূতি সাধকের সামর্থ এবং স্বাভাবিক প্রবনতা অনুসারে বিভিন্ন ভক্তি মূলক ধারণার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়।

হিন্দুধর্ম অনুসারে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তের এসব ভক্তি মূলক অনুরাগ বা ভক্তিরস পাঁচ ভাবে প্রকাশিত হতে পারে। যথা-

(ক) শান্তরস

শান্তরস ভাক্তির প্রথম সোপান। শান্তরসের দুটি গুণ- (ক) ঈশ্বরে নিষ্ঠা এবং (খ) সংসার বাসনা ত্যাগ। এই দুটি গুণে ভক্তির সূচনা হয়। শান্ত রসের গুণদ্বয় অন্যান্য রসেও বিদ্যমান থাকে। এ সময়ে ঈশ্বরে মমতা হয় না, কেবল তার স্বরূপ সম্পর্কিত জ্ঞান হয়, ঈশ্বর হলেন পরমসত্তা, পরমাত্মা, জগতের আদি, অন্ত এবং সৃষ্টির প্রধান লক্ষ্য।

(খ) দাস্যরস

ইহা শান্তরস হতে উচ্চতর সোপান। এই স্তরে ভক্তের মনে মমতার সঞ্চার হয়, তখন তার মধ্যে এ অনুভূতি জন্মায় যে, সে ভগবানের একান্ত একজন দাস। ভগবানের প্রতি তখন ভক্তে সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ এতই সুদৃঢ় হয় যে, সে তাঁর দাস বলে নিজেকে পরিচয় দিতে আনন্দবোধ করেন। আদর্শ দাস যেমন প্রভুর সেবা করতে ব্যস্ত থাকেন। ভক্ত তেমনি ভগবানের সেবা করতে ব্যাকুল হন। কৃষ্ণ সেবা ভিন্ন তার কিছুই ভাল লাগে না। তিনি ভগবানের কোন বিষয়েরই কামনা করেন না। এ রসের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রহলাদ। প্রহলাদের সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান তাঁকে বর দিতে চাইলেন। উত্তরে প্রহলাদ বলেন 'আমি স্বভাবতই কামেতে আসক্ত, আমাকে আর বর দ্বারা প্রলোভিত করিওনা। আমি সে কামাশক্তি হতে ভীত হয়ে তা হতে মুক্ত হবার জন্য তোমার আশ্রয় নিয়েছি। ..... হে বরদাতা দিগের শ্রেষ্ঠ, যদি আমাকে নিতান্তই বর দিতে ইচছা হয়, তবে তোমার নিকট এই বর চাই যে, কোন প্রকারের কাম যেন আমার হৃদয়ে অঙ্কুরিত হতে না পরে।'[১৭৫]

Dhaka University Institutional Repository

(গ) সখ্যরস বা বন্ধুভাব

বন্ধুদ্বয়ের মধ্যে যেমন একটা সমান সমান ভাব থাকে, তদ্রূপ সখ্যরসের পর্যায়ে উন্নীত ভক্ত ও তার ভগবানের মধ্যে যেন একই রকম সমতার ভাবের উন্মেষ ঘটে। ভক্ত এই অবস্থায় তার বন্ধু ভগবানের নিকট হৃদয়ের সবকথা খুলে বলতে পারেন এ ভরসায় যে তিনি যাতে আমাদের মঙ্গল হয় তাই করবেন। এপর্যায়ে ভক্তের মধ্যকার ভীতিভাব লোপ পায় এবং ভগবানের গৌরব, সম্ভ্রম, এ সকল গুণাবলীর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ না করে তার প্রতি বন্ধুভাবাপন্নভাবের উদয় হয়। ফলে তার সাথে গলাগলি, কোলাকুলি, প্রেমের বিবাদ, অভিমান, ক্রীড়া কৌতুক ভক্তি ইত্যাদি অভিব্যক্তি ক্রিয়াশীল থাকে। ভক্ত-

কাঁধে চড়ে, কাঁধে চড়ায়, করে ক্রীড়া রণ:

কৃষ্ণ সেবে, কৃষ্ণে করায় আপন-সেবন।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য-১৯)

সখ্যরসের প্রধান লক্ষণ ভক্তের নিকটে ভগবান অপেক্ষা কেহ প্রিয়তম হতে পারে না। গুহকরাজ বলেছেন;

'নহি রামাৎ প্রিয়তরো সমাস্তি ভুবি কশ্চন।'

(রামায়ন, অযোধ্যাকাণ্ড-৮৬)

অর্থাৎ পৃথিবীতে রাম অপেক্ষা আমার কেহ প্রিয়তর নাই। সখ্য রসের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত অন্ধ বিল্বমঙ্গল। অন্ধ বিল্বমঙ্গল বৃন্দাবনের পথে যাচ্ছেন, শ্রীকৃষ্ণ বালক বেশে পথ দেখিয়ে চলছেন। বিল্বমঙ্গলের বড়ই ইচ্ছা তাঁর সেই বরাভয়প্রদ মঙ্গল মধুর হস্ত একটিবার স্পর্শ করা। কোনরূপে সে হস্ত ধরলেন: যখন ধরলেন অমনি শ্রীকৃষ্ণ বলপূর্বক তাঁর হস্ত দূরে নিক্ষেপ করে চলে গেলেন। ভক্ত বিল্বমঙ্গল বললেন-

হস্তাবুৎ ক্ষিপ্য নির্য্যাসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমদ্ভুতম?

হৃদয়াদ যদি নির্য্যাসি পৌরষং গনয়ামি তে॥

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ হে কৃষ্ণ বলপূর্বক হস্ত নিক্ষেপ করে চলে গেলে, ইহাতে আশ্চর্য কি? হৃদয় হতে যদি দূরে যেতে পার তবে তোমার পৌরুষ আছে মনে করব। এই স্তরে ভক্তরা শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব ভুলে যান। শ্রীকৃষ্ণের সখারা যখন খেলাচ্ছলে তাঁর স্কন্ধে আরোহন করতেন, তখন তাদের মনে থাকত না যে. শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন ভগবান।এই সম্পর্ক শুদ্ধ প্রেমের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। তাই ভক্তরা কেবল শ্রীকৃষ্ণেরই আনন্দদান করতে চান আর শ্রীকৃষ্ণও তাঁর বন্ধুদের নিজ স্কন্ধে আরোহন করিয়ে আনন্দ উপভোগ করেন।

(ঘ) বাৎসল্য রস বা পিতৃ-মাতৃভাব

ভক্ত এ অবস্থায় ঈশ্বরকে নিজের সন্তান হিসেবে দেখেন। মাতা যেমন পুত্র কন্যার প্রতি স্নেহে গদগদ হয়ে সর্বদা কেবল তাদের সুখের প্রতি দৃষ্টি রেখে সেবা করে থাকে; সন্তানকে কিছু দেওয়া ভিন্ন তাদের নিকট অন্য কিছু পাওয়ার প্রত্যাশা রাখে না তদ্রুপ ঈশ্বরের প্রতি মাতৃবৎ আচারণের ভাবই বাৎসল্য রস।

(ঙ) মধুর রস

ইহা সর্বরসের শ্রেষ্ঠ। প্রাণে মধুর রসের সঞ্চার হলে ভক্ত ভগবানে পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে সদা বিভোর থাকে। যেমন গীতায় বলা হয়েছে সর্বধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণ লও (১৮/৬৬)। আমি ভিন্ন জগতে অন্য কিছু নাই- সমস্তই ব্রহ্মময়। এই সোহহং জ্ঞানই মধুর রসের চরম ফল। ভক্ত ও ভগবান অথবা জীবাত্মাও পরমাত্মার মিলন। মধুর রস সঞ্চারিত হলে সতী যেমন পতি বিনে অন্য নাহি জানে, ভক্তও তেমনি ভগবান ভিন্ন অন্য কাকেও জানে না। তখন ভগবানে পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে ভক্ত বলেন-

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে শুনে মন ভোর।

প্রতি- অঙ্গলাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।

এ- অবস্থায় ভক্ত ও ভগবান- সতী ও পতি। শ্রীচৈতন্যদেব এই ভাবে বিভোর ছিলেন। বৃন্দাবনে গোপিকাগণের কামগন্ধহীন প্রেম মধুর রসের পরম আদর্শ। কৃষ্ণ ক্রীড়া করতে করতে হঠাৎ অন্তর্হিত হলেন, কেননা লুকোচুরি-খেলা ভগবানের চিরাভ্যাস গোপীগণ উম্মাদিনী হয়ে বনময় তাকে অন্বেষণ করছেন, আর সচেতনবোধে বৃক্ষদিগকে সম্বোধন করে বলছেন- 'হে অশ্বত্থ, হে প্লক্ষ, হে ন্যগ্রোধ, প্রেমহাসিমাখা দৃষ্টি দ্বারা আমাদিগের চিত্ত হরণ করে

Dhaka University Institutional Repository

নন্দনন্দন কোথায় গমন করেছেন, তোমরা দেখেছ কি? হে কুরুবক, অশোক, নাগ, পুন্নাগ, চম্পক, যার হাস্যদর্শনে মানিনীর মানভঙ্গ হয়, সেই কৃষ্ণ কোথায় গিয়েছেন? হে কল্যাণি, হে গোবিন্দচরণপ্রিয়ে তুলসি, তোমার অতিপ্রিয় অচ্যুত যিনি অলিকুলমালিনী তোমাকে পাদপদ্মেধারণ করে থাকেন তাকে দেখেছ কি? হে মালতি, মল্লিকে, জাতি, যূথিকে করস্পর্শে তোমাদিগকে আনন্দিত করে মাধব এ দিকে গিয়াছেন কি? হে চুত, হে পিয়াল, হে পনস, হে আসন, হে কোবিদার, জম্বু, অর্ক, বিল্ব, বকুল, আম্র, কদম্ব, নীপ, হে যমুনা তীরবাসী তরুগণ তোমরা তো পরের উপকারের জন্য জন্ম গ্রহণ করেছ, আত্মহারা এই হতভাগিনীদিগকে কৃষ্ণ কোন পথে গিয়েছেন দেখিয়ে দাও।'[১৬] এই মর্মস্পর্শনী বিরহগীতির তুলনা এ জগতে সত্যিই বিরল।

এই স্তরগুলোর প্রত্যেকটি সফলভাবে অতিক্রম করার পরই ঈশ্বরের সাথে ভক্তের অন্তরঙ্গতা বৃদ্ধি পায়। এর প্রত্যেকটি স্তরে ঈশ্বরের সাথে ভক্তের পারস্পরিক ভালবাসা থাকে। যে দৃষ্টি কোন থেকে ভক্ত ঈশ্বরকে ভালবাসে ঈশ্বরও ভক্তকে সেই দৃষ্টিকোন থেকেই ভালবাসেন। যদিও ঈশ্বর ভক্তের সাথে প্রভু, পিতা, মাতা, বন্ধু অথবা প্রেমিকের ভূমিকা পালন করতে পারেন তবু তিনি হলেন প্রভু। কিন্তু ভক্ত তাকে উপলব্ধি করতে পারি না; তাঁর চেয়ে প্রিয় ভক্তের নিকট আর কেউ নেই।

৫.১. ঐশী প্রেম ও ঈশ্বরের করুণা

যখন কোন ভক্ত ঈশ্বরের সাথে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের পর্যায়গুলো অতিক্রম করে ঈশী প্রেমের পথে অগ্রসর হন তখন তিনি ভক্তিযোগের অনুশীলনে কিছু উন্নতি সাধন করেন।[১৭] এভাবে যে ভক্ত ভক্তিপথের সর্বোচ্চ স্তরে ওঠেন তিনি ঈশ্বরের প্রিয় ভক্তে পরিণত হন। এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করেন। এর ফলে তিনি ঈশ্বরের জ্ঞান লাভ করেন এবং বন্ধ অবস্থা থেকে মুক্তিলাভ করেন। ঈশ্বরের অনুগ্রহ ভিন্ন কোন মানুষই পরমাত্মার জ্ঞান এবং মোক্ষলাভ করতে পারেন না। তাই শ্রুতিতে বলা হয়েছে যে উত্তম রূপে বেদাধ্যয়ন, মনের ধারণা বা চিন্তাশক্তি অথবা বহু লোকের নিকট শ্রবণদ্বারা ইহাকে পাওয়া যায় না। এই আত্মা যাঁকে বরণ করেন অর্থাৎ যোগ্য বলে গ্রহণ করে তিনিই তাঁকে পেয়ে থাকেন। তারই নিকটে এই আত্মা স্বীয় তনু অর্থাৎ আপনার স্বরূপ ও মহিমা প্রকাশ করেন।[১৮] বিষ্ণু ভাগবত পুরাণে আছে, ভগবানের মায়ায় আবদ্ধ থাকার কারণেই জীব আপন স্বরূপ

Dhaka University Institutional Repository

বিস্মৃত হয়ে নানা গুণ ও কর্ম নিবন্ধন সংসার মার্গে ঘুরছে; সেই কারণে তাঁর মহৎ অনুগ্রহ ব্যতীত অপর কোন উপায়ে নষ্ট স্মৃতি পুনরুজ্জীবিত হতে পারে না, তার স্বরূপ প্রাপ্তি হতে পারে না (৩/৩১/১৫)। বস্তুত যারা ঈশ্বরের প্রতি গভীরভাবে অনুরাগী এবং তাঁর অনুগ্রহ প্রত্যাশা করেন, ঈশ্বর তাদের নিকট নিজেকে প্রকাশ করেন। ঈশ্বর হলেন পরম প্রভু তিনি তাঁর অনুগ্রহ দ্বারা তাঁর ভক্তের পাপ বিনাশ করেন এবং ভক্তি লাভ তার জন্য সহজতর করেন। যিনি আন্তরিক ভাবে ঈশ্বরের প্রতি অনুরক্ত এবং ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সমার্পণ করেন, তিনি সর্বদা ঈশ্বরের ধ্যানে মগ্ন থাকেন এবং ঈশ্বরকে সর্বত্র দেখতে পান। এ ধরণের গভীর ঈশ্বরানুরাগী ঈশ্বরের একজন একনিষ্ঠ প্রেমিকে পরিণত হন। ঈশ্বর তার প্রেমিক ভক্তের পথ থেকে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা অপসরণ করেন, তাকে অনুকূল অবস্থার মধ্যে রাখেন, তার মনকে বিশুদ্ধ করেন এবং তাঁর বুদ্ধিকে আলোকিত করেন যাতে সে তাঁকে জানতে পারে।[১৯] অতএব যেহেতু মানুষের নৈতিক উন্নতি এবং আধ্যাত্মিক পূর্ণতার জন্য ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রয়োজন সেহেতু মানুষকে ঈশ্বরের প্রতি গভীর অনুরাগ এবং আত্মসমর্পণের মাধ্যমে তাকে ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

৫.২ গৌণী ও পরাভক্তি

ভক্তির পথ ব্যক্তির আত্মোপলব্ধির এবং ঈশ্বরোপলব্ধির ক্রমোন্নতিমূলক পথ। এই পথে ব্যক্তির ঈশ্বরানুরাগ নিম্নতর স্তর থেকে উচ্চতর স্তরে উত্তীর্ণ হয়। ঈশ্বরানুরাগের নিম্নতর স্তর হলো গৌণী ভক্তির স্তর এবং উচ্চতর স্তর- পরাভক্তির স্তর। কাজেই ভক্তি দু'প্রকার। যথা- গৌণীভক্তি ও পরাভক্তি। এই গৌণী ও পরাভক্তিকে শঙ্করাচার্য ও নিম্বার্ক যথাক্রমে স্থূল ও অপরা এবং সূক্ষ্ম ও পরাভক্তি বলে আখ্যায়িত করেছেন।

৫.২.১ গৌণীভক্তি: গৌণীভক্তিতে ঈশ্বরানুরাগের সাথে আত্মানুরাগ মিশ্রিত থাকে। এই স্তরে ভক্ত তার কোন কাম্য বস্তু লাভের জন্য ঈশ্বরোপসনায় ব্রতী হয়। সত্ত্বঃ রজঃ ও তমঃ এই ত্রিবিধ গুণভেদ হেতু অথবা আর্ত, জিজ্ঞাসু ও অর্থার্থী- এই তিন প্রকার ভক্তভেদে গৌণীভক্তি তিন প্রকার। সাত্ত্বিক, রাজাসিক ও তামসিক ভক্তের লক্ষণ বর্ণনা করতে গিয়ে ভগবান কপিল বলেন- "যে ভেদদৃষ্টি সম্পন্ন ক্রোধী পুরুষ অন্তরে হিংসা, দম্ভও মাৎসর্য নিয়ে আমাকে ভজনা করে সে আমার তামস ভক্ত। বিষয়, যশঃ বা ঐশ্বর্য কামনা করে যে ভেদদর্শী ব্যক্তি প্রতিমা প্রভৃতিতে আমার অর্চনা করে সে রাজস ভক্ত। আর যে

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তির ভেদভাব যায় নাই কিন্তু পাপক্ষয়ের উদ্দেশ্য এবং ঈশ্বরের প্রতিকামনায় কর্তব্যবোধে উপাসনা করেন তিনি সাত্ত্বিক ভক্ত।"[৮০] অন্যদিকে কোন বিপদে পতিত হয়ে উদ্ধার লাভের জন্য ভগবানকে ডাকার নাম আর্তভক্তি, ভগবানকে জানবার নিমিত্তে একান্ত আগ্রহতাই জিজ্ঞাসু ভক্তির লক্ষন ; ধন-জন, দারা-পুত্র, বিষয়-বিভব, মান-সম্মান পাবার জন্য ভগবানকে ডাকাই অর্থাথী ভক্তের লক্ষণ। সকল প্রকার গৌণভক্তিই নিকৃষ্ট ভক্তি কিন্তু কিছুদিন সাধনা করলেই ইহা উৎকৃষ্ট ভক্তিতে পরিণত হয়। যেমন তামসীভক্তি হতে ক্রমে রাজসী ভক্তির ও রাজসী হতে সাত্ত্বিকী ভক্তির উদয় হয়। পরে সাত্ত্বিকী ভক্তি পরাভক্তিতে পরিণত হয়। এখানে উল্লেখ্য যে আর্ত জিজ্ঞাসু, অর্থাথী ভক্ত ছাড়াও গীতায় জ্ঞানী (অর্থাৎ তত্ত্বদর্শী) নামে অপর একপ্রকার ভক্তের উল্লেখ রয়েছে (৭/১৬)। সকল প্রকার ভক্তের মধ্যে এই জ্ঞানীভক্ত শ্রেষ্ঠ; কেননা তিনি সতত (ভগবানে) যুক্তচিত্ত এবং তাতেই ভক্তিমান (৭/১৭)। তিনি পরিশেষে উপলব্ধি করেন বাসুদেবেই সমস্ত; এইরূপ জ্ঞানলাভ করে তিনি তাকে প্রাপ্ত হন। গীতার এই জ্ঞানই ভক্তই নারয়ণীয়াখ্যানের একান্তীভক্ত। একান্ত ভক্তিকে গীতায় আবার একভক্তি, অভ্যবিচারী ভক্তি বা অনন্যভক্তি বলা হয়েছে। একান্তভক্তের লক্ষণ হচ্ছে- তিনি ঈশ্বরভিন্ন সকল আশ্রয় ত্যাগ করেন এবং সর্বত্র তাকেই দেখেন।

৫.২.২ পরাভক্তি: ভক্তিযোগের সর্বোস্তর হল পরাভক্তির স্তর। ইহা ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ও অনুরাগের পরিপক্ক স্তর। দীর্ঘ কাল যাবৎ ভক্তিযোগের অনুশীলন দ্বারা ব্যক্তি এই স্তরে উন্নীত হয়। এই স্তরে ভক্ত নিজের জন্য কিছুই কামনা করে না, ঈশ্বরই তার একমাত্র ধ্যানের বস্তু হয় এবং ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ ভাবে আত্মসমর্পণ করে। তখন তার যা কিছু থাকে তা ঈশ্বরের সিদ্ধান্তেই থাকে, তিনি যা কিছু করেন তা ঈশ্বরের সেবার জন্য করেন এবং তিনি যে সকল বস্তু দর্শন করেন তাতে তার প্রিয়তমা ঈশ্বরকেই দেখেন।

তাই গীতায় বলা হয়েছে "ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হলে পর তিনি প্রসন্নচিত্ত হয়ে নষ্ট বিষয়ের জন্য শোক করেন না বা অপ্রাপ্ত বস্তুর জন্য আকাঙ্খা করেন না। তিনি সর্বভূতে সমদর্শী হন এবং আমাতে পরাভক্তি লাভ করেন। যিনি এই রূপ পরাভক্তির দ্বারা আমাকে স্বরূপত জানিতে পারেন, তিনিই বুঝিতে পারেন- আমি কে, আমার কত বিভাব, আমার সমগ্র স্বরূপ কি; এবং এইরূপে আমাকে স্বরূপতঃজেনে তদন্তর তিনি আমাতে প্রবেশ করেন"(১৮/৫৪-৫০)। এই রূপ পরা ভক্তের লক্ষণ বর্ণনা প্রসংঙ্গে গীতায় বলা হয়েছে "আমার ভক্ত কাউকে

Dhaka University Institutional Repository

দ্বেষ করেন না, তিনি সকলের প্রতিই মিত্রভাবাপন্ন, দয়ালু ও ক্ষমাবান, তিনি সমত্ববুদ্ধি ও অহঙ্কার বর্জিত, তিনি শত্রু-মিত্র, মান-অপমান, শীত-উষ্ণ, শুভ-অশুভ, নিন্দা-স্তুতি, হর্ষ-বিষাদ ইত্যাদি দ্বন্দ্ব বর্জিত-সর্বত্র সমত্ববুদ্ধি সম্পন্ন। তিনি উদাসীন হয়েও অনলস, গৃহে থেকেও গৃহাদিতে সমত্ববুদ্ধি হীন। যিনি মৎপরায়ণ হয়ে শ্রদ্ধা সহকারে এই অমৃততুল্য ধর্মের আচরণ করেন, তিনিই আমার প্রিয়ভক্ত"(১২/১৩-২০)। পরাভক্তির স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

পরা ভক্তির লক্ষণ

ভক্ত পরম তৃপ্তি লাভ করেন

পরাভক্তি লাভ করলে মানুষ সিদ্ধ হয়, মরণ ভয় অতিক্রম করে এবং পরম তৃপ্তি লাভ করে।[৮১] অর্থাৎ ভক্ত তার মনবুদ্ধি ভগবানে অর্পণ করায় সে তাঁকে ছাড়া ব্রহ্মার অধিকার ইন্দ্রত্ব সমগ্র পৃথিবীর বা পাতালের অধিপত্য অষ্টযোগ সিদ্ধি বা বিদেহমুক্তি কিছুরই কামনা করেন না।

ভক্তের কোন আকাঙ্খা থাকে না

পরাভক্তি লাভ হবার পর ভক্ত আর কোন বস্তু পাবার আকাঙ্ক্ষা করেন না, কোন বস্তু নাশে শোক করেন না, কাকেও দ্বেষ করেন না, কোন বস্তু পেয়ে আহলাদিত হননা বা কোন বস্তু পাবার জন্য উৎসাহ প্রকাশ করেন না।[৮২] তার সংসারাসক্তি বিষয় বুদ্ধি একেবারে চলে যায়। ভক্ত কোন ব্যাপারে উৎসাহী হন না। কর্ম ত্যাগ বা গ্রহণেরও কোন চেষ্টা তার থাকে না। এক কথায় তিনি হন সর্বত্যাগী ও ত্রিগুণাতীত।

তিনি উন্মাদের ন্যায় আচরণ করেন

প্রেমলাভ করলে ভক্ত উন্মাদ হয়, জড়বৎ হয়, নিজের আনন্দে বিভোর হয়ে থাকে। তখন তিনি বিধি-নিষেধের অতীত হয়ে যান। নিজের ইচ্ছা বুদ্ধি বিচার সব কিছু ইষ্টের পায়ে সমর্পণ করে তিনি তন্ময় হয়ে যান। বিচার বিবেচনা করে কাজ করবার তার কোন ক্ষমতা থাকে না; লোকে কি বলে, কি ভাবে, সে সবও

Dhaka University Institutional Repository

ভাবতে পারে না। কাজেই অনেক সময় লোকদৃষ্টিতে তাঁর আচরণ দুর্বোধ্য কখনও বা নিন্দনীয় হিসেবে বিবেচিত হয়। আবার কখনও কখনও সমাধিস্থ হয়ে, বাহ্যশূণ্য হয়ে জড়ের ন্যায় চুপ করে বসে থাকে। আবার কখনও পাগলের মত ব্যবহার করে- কভু হাসে, কভু কাঁদে, কখনও বাবুর মত ব্যবহার করে, আবার খানিক পরে ন্যাংটা। শুচি-অশুচি তার কাছে দুই সমান। ঈশ্বর দর্শনের পরেই এ অবস্থা হয়ে।

কর্মে আসক্তি ত্যাগ হয়

পরাভক্তি লাভ হলে লৌকিক বা বৈদিক কর্মসমূহে আসক্তি ত্যাগ হয়।[৮৩] অন্য কথায় ঈশ্বরের প্রতি প্রেম হলে কর্ম আপনি ত্যাগ হয়ে যায়। সমাধি হলে সব কর্ম ত্যাগ অবশ্যম্ভাবী। তখন যাগযজ্ঞ, পূজা ইত্যাদি বৈদিক কর্ম সম্মাদন করা প্রয়োজন হয় না। যতদিন না প্রেম ভক্তি পাকা না হয় ততদিন শাস্ত্র বাক্য মেনে চলতে হয়। প্রেমের উদয় হলে সকল কর্ম কিরূপে আপনিই ক্ষয় হয়ে যায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীদের একটি বাক্যে চমৎকারূপে পরিস্ফুট হয়েছে। কৃষ্ণযখন গোপীগণকে যমুনাকুল ত্যাগ করে গৃহে ফিরতে উপদেশ দিলেন তখন তারা বললেন- 'হে প্রিয় আমাদের মন তো পরমানন্দে গৃহকর্মে আসক্ত ছিল, সে মন তুমি চুরি করে নিয়েছ। আমাদের হাত সাংসারিক কাজে লিপ্ত ছিল সে হাত এখন অবশ। আর তোমার শ্রীচরণের আশ্রয় ত্যাগ করে আমাদের পা এক পাও চলতে রাজী নয়। এখন আমরা কেমন করে ব্রজে যাই? আর সেখানে গিয়ে করিই বা কি?'

সাধক সকল আশ্রয় ত্যাগ করে

প্রেমের অতিশয্যে ভক্ত একমাত্র প্রিয়তমাকে নিয়ে ব্যাপৃত থাকে এবং ইষ্টবিরোধী সকল বিষয়ের প্রতি ঔদাসীন থাকে। পরা ভক্তি লাভ হলে ঈশ্বর ভিন্ন সকল আশ্রয় ত্যাগ করে সাধক একনিষ্ঠ ভক্ত হয়।[৮৪] কারো উপর আশ্রয় করে কোনো মানুষ যদি দেখতে পায় উক্ত ব্যক্তি তাঁর সব বাসনা পূরণ করতে সক্ষম নন তা হলে তিনি অন্য আশ্রয়ের সন্ধান করেন। কিন্তু ভক্তিযোগে ভক্ত দেখেন ইষ্টই তার একমাত্র গতি, একগতি আশ্রয়। সকল রাজার রাজা, সকল দেবতাদের দেবতা। তাই তার দেহ মনের সকল চেষ্টা ঈশ্বরকে আশ্রয় করে থাকে। এরূপ একনিষ্ঠ ভক্তের সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তির নিরোধ হয়ে যায় এবং তিনি সব কিছুকে ইষ্টময় দেখেন।

Dhaka University Institutional Repository

ভক্ত সকল কিছুকে ঈশ্বরময় দেখেন

ঐশী প্রেম লাভ করে প্রেমিক কেবল এই প্রেমই দর্শন করেন, এই প্রেম শ্রবণ করেন, এই প্রেম বর্ণনা করেন, এই প্রেম চিন্তা করেন।[৮৫] প্রেমিকের কাছে প্রেম ও প্রেমময় অভেদ। ঐশী প্রেমে যখন ভক্ত বিভোর হন তখন তাঁর ইন্দ্রিয়-মন বুদ্ধির সমক্ষে অন্য কোন বিষয় আর প্রকাশিত হয় না; সে অবস্থায় তার সকল চিন্তা, সকল প্রচেষ্টার পর্যাবসান হয় প্রেমাস্বাদনে। ইষ্টকেই অন্তরে-বাইরে দেখা, তারই কথা শোনা, তারই কথা বলা, তাকেই চিন্তা করা ছাড়া প্রেমিকের আর কোনো কাজ থাকেনা মাতালের বেশী নেশা হলে যেমন সে বলে- 'আমিই কালী, তেমনি ঈশ্বরের প্রতিভালবাসা গভীর হলে ভক্ত বলেন 'তিনি আমি।' এঅবস্থায় ভক্ত সর্বভূতে ঈশ্বরকেই দর্শন করেন। গোপীরা সর্বভূতে শ্রীকৃষ্ণকেই দর্শন করেছিল এবং বলেছিল আমি কৃষ্ণ। তবে সাধারণ চর্মচক্ষে ভগবানকে দেখা যায় না। ভগবান যদি ভক্তকে দিব্য চক্ষুদেন তবে ভক্তে তার মাধ্যমে তাঁকে দেখতে পান। যেমন অর্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শনের সময় কৃষ্ণ দিব্য চক্ষু দিয়েছিল। এ প্রসংঙ্গে রামকৃষ্ণ পরসহংস বলেন ' সাধনা করতে করতে একটি প্রেমের শরীর হয়, আর তার প্রেমের চক্ষু, প্রেমের কর্ণ; সে চোক্ষে তাঁকে দেখা, সে কর্ণে তাঁর বাণী শোনা যায়। আবার এই প্রেমের শরীরে আত্মার সহিত রমন হয়।[৮৬]

বস্তুত ভক্তি পথের প্রতিটা সম্মুখ পদক্ষেপ নৈতিক জীবনের অগ্রগতিমূলক পদক্ষেপ। মানুষ যতই ঈশ্বরকে ভালবাসে, তাঁর ইচছাকে শ্রদ্ধা করে ততই তিনি পার্থিব জীবনের কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত হন। এভাবে মানুষ তাঁর মন ও ইন্দ্রিয় সমূহকে নিয়ন্ত্রণ করে ঈশ্বরের দিকে ধাবিত করতে সক্ষম হন। তিনি তার সমস্ত আশা আকাঙ্খা এবং কর্ম ফলকে ঈশ্বরের প্রতি উৎসর্গ করেন। ফলে তার অহংবোধ লুপ্ত হয়; তিনি যে একটি স্বাধীন সত্তা এবং নিজের ভাগ্যের নির্মাতা এই চিন্তা থেকেও বিরত থাকেন এবং তিনি তার আত্মাকে পরমাত্মার অংশ হিসাবে চিহ্নিত করে কেবল তাঁর উপর নির্ভর করেন। আত্মার এই জ্ঞান মানুষের ইচ্ছাকে সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের প্রতি সমর্পনের দিকে পরিচালিত করে। এভাবে যিনি ঈশ্বরকে তার প্রেমাস্পদ হিসেবে ভালবাসেন এবং নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে তাঁর কাছে সমর্পণ করেন, ঈশ্বর তাকে তাঁর অনুগ্রহ দান করেন এবং তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্য ও মহত্ত্বসহ তার নিকট প্রকাশিত হন। ফলে ভক্ত এক পরম আনন্দ উপভোগ করেন। ঈশ্বর হলেন পরম আনন্দ স্বরূপ। তিনি তার

Dhaka University Institutional Repository

আনন্দকে ভক্তের জন্য সংরক্ষণ করেন। ফলে ভক্ত মুক্ত অবস্থায় ঈশ্বরে অবস্থান করেন এবং আনন্দময় মিলন উপভোগ করেন। ইহাই হলো চূড়ান্ত মুক্তি। ভক্তি বা অনুরাগই ভক্তকে মুক্তির দিকে পরিচালিত করে, তবে মোক্ষ প্রাপ্ত অবস্থায় ভক্তের আত্মা ঈশ্বরের মধ্যে হারিয়ে যায়না বরং ব্রহ্মের সাথে পরম আনন্দ উপভোগ করেন। তাই উপনিষেদ বলা হয়েছে- যিনি আত্মাকে প্রাপ্ত হন তিনি সেই আনন্দময় পুরুষকে লাভ করে স্বয়ং আনন্দ অনুভব করে। কাজেই মোক্ষহলো পরম পুরুষকে বা ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়ে ব্রহ্মে স্তিতি লাভ করা।

তথ্যনির্দেশ

১। *বৃহদারণ্যক উপণিষক*, ২/৪/৫, অনুবাদ, অতুলচন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্বভূষণ ও মহেষে চন্দ্র ঘোষ, অখণ্ড সংস্করণ, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা-১৯৯৪।

২। দেবর্ষি নারদ, *ভক্তিসূত্র*- ৫৪, দ্রষ্টব্য, স্বামী বেদান্তানন্দ, '*ভক্তি প্রসঙ্গ*' (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ অবলম্বনে দেবর্ষি নরদ বিরচিত ভক্তি সূত্রের ব্যাখ্যা)।

৩। স্বামী বিবেকানন্দ, '*ভক্তিযোগ*' চতুর্থ সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩৪৯, পৃ ৮৭।

৪। স্বামী বিবেকানন্দ, প্রাগুক্ত, পৃ ৯০।

৫। বৃহদারণ্যকউপনিষদ, ১/৪/২-৩

৬। গীতা, ৪/৮, সম্পাঃ জগদীশচন্দ্র ঘোষ, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ষষ্ঠ বিংশতিতম সংস্করণ-১৯৯৬।

৭। ঐ, ৪/১০, সম্পাঃ প্রাগুক্ত।

৮। ঐ, ১৮/৬৫,

৯। ভাগবত পুরাণ, ১০/৩৩/৩৬।

১০। মোঃ মতিউর রহমান, *বাঙালির দর্শণঃ মানুষ ও সমাজ*, -ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০০ইং, পৃ ২৭।

১১। গীতা, ১৩/২৪-২৫,

Dhaka University Institutional Repository

১২। S C. Chatterjee, *Fundamental of Hinduism: A philosophical Study*, 7th Ed. Calcutta university, 1970 P. 173.

১৩। *গীতা*, ৬/৪৬-৪৭,

১৪। ঐ, ৮/২২

১৫। Benjamin walker, *Hind world, an Encyclopedic Survey of Hinduism, v.2*, London, George Allen & Unwin Ltd., 1968. P. 138.

১৬। ডঃ দুর্গাদাস বসু *হিন্দু ধর্মের সারতত্ত্ব*, ভারত সেবাশ্রম সংঘ, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ ১৪০১, পৃঃ ১২৫।

১৭। হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারতীয় দর্শন, কলিকাতা ১৯৮০, পৃঃ ১১২।

১৮। Mariasusai Dhavamony, *Love of God, According to Saiva Siddhanta*, oxford university press, 1971, P. 14

১৯। Barnett, *Some Notes on the History of the Religion of Love in India*, International congress for the History of Religion, 1908.

২০। ডঃ তারাচাঁদ, *ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব*, অনুবাদঃ করুনাময় গোস্বামী, বাংলা একাডেমী-১৯৯৯ পৃ. ১৪, থেকে উদ্ধৃত

২১। ভক্তি শব্দটি বেদে উপাসনা কিংবা ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। পারিভাষিক দিক থেকে ভক্তি শব্দটি ঈশ্বরের প্রতিভালবাসা অর্থে প্রথম ব্যবহৃত হয় শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৬/২৩)।

২২। *গীতা*, ৪/১১

২৩। ঐ ৯/৩১

২৪। ঐ ১৮/৫৮,৭৩

২৫। ঐ ১৮/৬২

২৭। অষ্টাঙ্গ যোগ হচ্ছে- নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি।

Dhaka University Institutional Repository

২৮। গীতা, ১৮/৫৪,৫৫,৫৭, ৭/১৭-১৮, ৮/৭, ৯/২৭, ১১/৫৫, ১২/৬-৭, ৬/২৯, ২/৪৮, ৫৩

২৮। *ছান্দোগ্য উপনিষদ*, ৭/২৬ অনুবাদ, অতুলচন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ ও মহেষ চন্দ্র ঘোষ, অখন্ড সংস্করণ হরফ প্রকাশনী, কলকাতা-১৯৯৪।

২৯। *কঠ উপনিষদ*, ১/৩/১২

৩০। ঐ ১/২/২৪

৩১। গীতোক্ত (১৩/৭-১১) জ্ঞানের সাধন বা জ্ঞানীর লক্ষণ হচ্ছে- শ্লঘা-রাহিত্য, দম্ভ রাহিত্য, অহিংসা, ক্ষমা, সরলতা, গুরুসেবা, শৌচ, সৎকার্যে একনিষ্ঠা, আত্মসংযম, বিষয়- বৈরাগ্য, নিরহঙ্কারিতা, জন্ম-মৃত্যু-জরা ব্যাধিতে দুঃখ দর্শন বিষয়ে বা কর্মে অনাসক্তি, স্ত্রী-পূত্র-গৃহাদিতে মমত্ববোধের অভাব, ইষ্টানিষ্টলাভে সমচিত্ততা, আমাতে (ভগবান বাসুদেবে) অনন্যভাবে ঐকান্তিক ভক্তি, পবিত্র নির্জন স্থানে বাস, প্রাকৃত জনসমাজে বিরক্তি, সর্বদা অধ্যাত্মজ্ঞানের অনুশীলন।

৩২। *(বিষ্ণু) ভাগবত পুরাণ*, ৭/১১/৮-১২

৩৩। *গীতা*,১৩/২৭-২৮

৩৪। *ভাগবত পুরাণ*, ১১/১১/৩১

৩৫। *গীতা*, ৫/২৯, ৯/১৮

৩৬। *ছান্দোগ্য উপনিষদ*, ৬/৮/৭

৩৭। *মহাভারত*, অনু. ১৪৫/১১/৬০-৮৫

৩৮। যোগী যাজ্ঞ বল্ক্য, ১/৬৮-৬৯

৩৯। *ভাগবত পুরাণ*, ১১/১৯/৩৮

৪০। *মহাভারত* অনু, ১৪৫/৯১/১১৮

৪১। *কেন উপনিষদ*, ৪/৮

৪২। *ভাগবত পুরাণ*, ৫/৫/১ 'তপো দিব্যং ..... ব্রহ্মসৌখ্যন্ত্বনন্তম': ৫/৫৯-১০-যদা মনোহৃদয় গ্রন্থিরস্য... তপসেহানিবৃত্ত্যা।

Dhaka University Institutional Repository

৪৩। *গীতা*, ১৭/১৭

৪৪। *বৃহদারণ্যক উপনিষদ*, ২/৪/৫

৪৫। *যোগী যাজ্ঞবল্ক্য*, ২/১২-১৩

৪৬। *মনু*, ২/৭৮-৮৭

৪৭। গীতা,১০/২৫

৪৮। শঙ্করাচার্য্যকৃত সর্ববেদান্ত সিদ্ধান্ত সার সংগ্রহ ১২৯-৩১

৪৯। শঙ্করাচার্য্যকৃত সর্ববেদান্ত সিদ্ধান্ত সার সংগ্রহ ২-১০২

৫০। *গীতা*, ২/৬২-৬৩,

৫১। *গীতা*, ৩/৪৩

৫২। *ভাগবত পুরাণ*, ১১/১১/১৭

৫৩। *মনু*, ৫.২৪, *ভাগবত পুরাণ*.৭/১৩/২৭

৫৪। *গীতা*, ১২/১৩, ১৫, ১৮, ১৯, ২/৫৬, ১৮/২৬

৫৫। *শঙ্করাচার্য্যকৃত বিবেক চূড়ামণি*-২৪

৫৬। *গীতা*, ২/১৪-১৫

৫৭। গীতা, ৪/৩৪

৫৮। *কঠ উপনিষদ*, ১/২/৮৯,

৫৯। *ছান্দোগ্য উপনিষদ*, ২/২৩/১

৬০। *গীতা*, ১৮/৫

৬১। *ছান্দোগ্য উপনিষদ*, ৬/১৭/৪

৬২। *গীতা*, ১৬/২

৬৩। *ভাগবত পুরাণ*, ৭/৬/১৯-২৪

৬৪। *মহাভারত*, ১২/৩৩৪/৪৩

Dhaka University Institutional Repository

৬৫। ঐ, ১২/৩৩৫/১২

৬৬। গীতা, ৬/৪৭,

৬৭। ঐ, ৯/২৯-৩২

৬৮। ঐ, ১৮/৬৫

৬৯। ঐ, ৯/১৪,

৭০। ঐ, ১০/৯

৭১। ঐ, ১০/১০/১১

৭২। ঐ, ১১/৩/৪০

৭৩। ঐ, ১১/৬/২৪, ৪৮-৪৯

৭৪। Vide. Ramnarayan Vyas, *The Bhagavata Bhakti Cult and Three Advaita Acaryas: Sankara Ramanuja and Vallabha*, Nar Publishers, Delhi, 1977, P-90

৭৫। ভাগবত, ৭/১০/২-১০

৭৬। ঐ, ১০/৩০/৫-৯

৭৭। Chatterjee, S.C. Ibid. P-180

৭৮। কঠ উপনিষদ,১/২/২৩, মুণ্ডক উপনিষদ, ৩/২/৩,

৭৯। গীতা, ১০/১০, ১১/৫৩-৫৪

৮০। ভাগবত পুরাণ, ৩/২৯/৮-১০

৮১। নারদ ভক্তি সূত্র, ৪

৮২। ঐ, ৫

৮৩। ঐ,৮

৮৪। ঐ, ১০

৮৫। ঐ, ৫৫

৮৬। স্বামী বেদান্তানন্দ, ভক্তি প্রসঙ্গ, কলকাতা, ১৬৮, পৃ.১৯ থেকে উদ্ধৃত

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

ঐশী প্রেম সম্পর্কে ইসলাম ও হিন্দু মতের তুলনামূলক পর্যালোচনা

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

ঐশী প্রেম সম্পর্কে ইসলাম ও হিন্দু মতের তুলনামূলক পর্যালোচনা

এ অধ্যায়ে আমরা ইসলাম ও হিন্দুধর্মের ঐশী প্রেমের তুলনামূলক আলোচনায় প্রয়াসী হব। ইসলাম ও হিন্দুধর্মের ঐশী প্রেমের মধ্যে যেসব বিষয় সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য রয়েছে তা নির্ণয় করার মাধ্যমেই উভয় ধর্মের ঐশী প্রেমের তুলনামূলক পর্যালোচনার চেষ্টা করা হবে। উল্লেখ্য যে, ইতোপূর্বে আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইসলাম ও হিন্দুধর্মে সত্তা সম্পর্কীত ধারণা, তৃতীয় অধ্যায়ে ইসলামে ঐশী প্রেম এবং চতুর্থ অধ্যায়ে হিন্দুধর্মের ঐশী প্রেম নিয়ে আলোচনা করেছি। বর্তমান অধ্যায়ে তুলনামূলক পর্যালোচনার ক্ষেত্রে প্রধানত তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ের আলোচনার উপর নির্ভর করা হবে।

ঐশী প্রেম সম্পর্কে ইসলাম ও হিন্দু মতের সাদৃশ্য

প্রায় প্রত্যেক ধর্মেই মরমীদর্শন একটি বিশিষ্ট দর্শনরূপে বিকশিত হয়েছে। ইসলামে মরমীবাদ তাসাওউফ বা সূফীবাদ এবং হিন্দু মরমীবাদ তথা ভক্তিবাদ বা বৈষ্ণববাদ নামে সমধিক পরিচিত।সূফীদের প্রেমানূভূতির সাথে হিন্দু মরমীদের প্রেমানুভূতির অনেক ক্ষেত্রে সাদৃশ্য রয়েছে। যেমন:

১. ইসলাম এবং হিন্দু উভয় ধর্মানুসারে পার্থিবজীবন হলো মানুষের পারলৌকিক জীবনের প্রস্তুতি গ্রহণের ক্ষেত্র স্বরূপ। ইসলামী মতে সাধারণভাবে মানুষের জীবনের লক্ষ্য জাহান্নামের কঠিন শাস্তি থেকে পরিত্রাণ লাভ এবং জান্নাতের পরমানন্দ ভোগ করা হলেও সূফীদের মতে মানব জীবনের লক্ষ্য হচেছ আল্লাহর দীদার বা মিলন লাভ করা। আর এজন্য প্রস্তুতি গ্রহণের ক্ষেত্র হলো পার্থিব জীবন। একইভাবে হিন্দু মতে জীবনের লক্ষ্য হচেছ যে ব্রহ্ম হতে জীবের উদ্ভব সেই ব্রহ্মে লীন হওয়া বা ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া। কিন্তু ব্রহ্মে লীন হওয়ার জন্য প্রয়োজন ব্রহ্ম

Dhaka University Institutional Repository

সাযুজ্যতা অর্জন করা। যে পর্যন্ত জীব তার উপযোগী না হয় সে পর্যন্ত তাকে কৃতকর্মানুসারে পুনঃ পুনঃ দেহ ধারণ করে কর্মফল ভোগ করতে জগতে আবির্ভূত হতে হয়। আর ব্রহ্ম সাযুজ্যতা অর্জনের জন্য যে সাধনার প্রয়োজন তার ক্ষেত্র হলো পার্থিব জীবন। কাজেই ইসলাম ও হিন্দু উভয় ধর্ম পার্থিব জীবনকে তার লক্ষ্য অর্জনের উপায় হিসেবে গ্রহণ করে।

২. সূফী ও বৈষ্ণব সাধনার পথ প্রেম ও পবিত্রতার পথ। তাদের মতে প্রেমের মাধ্যমেই কেবল পরমসত্তাকে লাভ করা যেতে পারে। উভয় ধর্মের ঐশী প্রেমের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় উভয় ধর্মই প্রেমকে ভয়হীন, স্বার্থহীন, অবর্ণনীয়, সূক্ষ্ম এবং উচচতম আদর্শ বলে অভিহিত করেছে।

৩. ইসলাম এবং হিন্দু উভয় ধর্মানুসারে আত্মা অমর। মুসলিম মরমী এবং হিন্দু মতে জীবনের লক্ষ্য যেহেতু পরমসত্তার সাথে মিলিত হওয়া, তার দিদার লাভ করা, তাই আত্মা যদি অমর না হয়, তাহলে মানব জীবনের উদ্দেশ্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। আত্মা যদি মৃত্যুতে বিনাশ হয়ে যায়, তাহলে ঈশ্বরের সাথে মিলন হবে কার? প্রেমাস্পদের সাথে প্রেমিকের মিলন যদি অসম্ভব হয় তাহলে প্রেমের সার্থকতা কোথায়? এ সার্থকতার জন্য প্রেমিকের বেঁচে থাকা প্রয়োজন, প্রয়োজন তার আত্মার অমর হওয়া। সুতরাং ঈশ্বরের সাথে আত্মার মিলন, মানব জীবনের এ লক্ষ্য তাত্ত্বিকভাবে প্রমাণ করে যে আত্মা অমর। তাছাড়া ইসলাম ও হিন্দু উভয় ধর্ম আত্মার ঐশী উৎসে বিশ্বাসী। ইসলাম মতে আল্লাহ্‌র নির্দেশ,[১] আর হিন্দু মতে আত্মা ব্রহ্মের অংশ।[২]

৪. মানবাত্মা স্বভাবতই নিত্য ও শুদ্ধ। পৃথিবীতে আগমনের পরে শুদ্ধ আত্মা লোভ-লালসা, কামনা-বাসনা, ভোগ-স্পৃহা, অর্থলিপ্সা, যশ-খ্যাতি, প্রভাব-প্রতিপত্তি, কৃপণতা, অহংকার ইত্যাদি খারাপ গুণের প্রভাবে পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত হয়। আত্মাকে তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে অর্থাৎ পরমসত্তার সাথে মিলিত হতে হলে কিংবা তাঁর গুণে গুণান্বিত হওয়ার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন তাঁর শুদ্ধতা অর্জন। ইসলাম ও হিন্দুধর্ম তাই আত্মার পবিত্রতা অর্জনকে মুক্তি লাভের প্রধান শর্ত বলে মনে করে। ইসলাম ধর্ম অনুসারে নাজাত

Dhaka University Institutional Repository

লাভের জন্য লোভ-লালসা, মোহ, হিংসা-বিদ্বেষ পরিত্যাগ করে আত্মার পবিত্রতা অর্জন করতে হয়। কুরআনে বলা হয়েছে: যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকট নিষ্কলঙ্ক আত্মা নিয়ে আসবে সে ব্যতীত অপর কেউ মুক্তি পাবে না।[৩] অনুরূপভাবে হিন্দুধর্মানুসারে হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ-লালসা, কামনা-বাসনা, ফলাকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি পরিত্যাগ করে মানুষ যখন নিষ্কাম কর্ম করতে সক্ষম হয়, তখন সে মোক্ষ অর্জন করে। অতএব ইসলাম ও হিন্দু উভয় ধর্মে ঐশী প্রেম লাভের জন্য আত্মার পবিত্রতা অর্জনকে আবশ্যিক শর্ত বলে মনে করা হয়।

৫. ইসলাম ও হিন্দুধর্মে ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। বাহ্যিক দিক থেকে হিন্দুধর্মকে বহুঈশ্বরবাদী বলে মনে হয়। সাধারণত হিন্দুরা অসংখ্য দেব-দেবী যেমন-ইন্দ্র, বিষ্ণু, গণেশ, কালী, সরস্বতী প্রভৃতির পূজা-অর্চনা করে থাকে। কিন্তু এসব দেব-দেবীর পশ্চাতে রয়েছে পরমসত্তা। বৈদিক সাহিত্যে এ সত্তাকে বিশ্বকর্মা, প্রজাপ্রতি; উপনিষদে ব্রহ্ম; গীতায় কৃষ্ণ নামে অভিহিত করা হয়েছে। বেদে বলা হয়েছে প্রজাপতি বা বিশ্বকর্মা সকল সত্তার স্রষ্টা। আবার উপনিষদে বলা হয়েছে, সেই অক্ষর পুরুষ জীবের জন্ম ও লয়।[৪] তিনি এ জগতের স্রষ্টা। কাজেই ইসলামের মত হিন্দুধর্ম এক ও অদ্বিতীয় সত্তার প্রেম পিয়াসী।

৬. সূফী ও হিন্দু মতে, সৃষ্টি স্রষ্টার আনন্দ জাত। তিনি চাইলেন সৃষ্টি হউক, আর অমনি হয়ে গেল। স্রষ্টা তাঁর খেয়াল-খুশীর খাতিরে আনন্দ সহচর হিসেবে জগৎ সৃষ্টি করলেন। জগৎ তাঁর লীলা বা প্রকাশ। নির্দ্বন্দ্ব, নির্বিঘ্ন, অবিকৃত আনন্দ পেতে হলে বন্ধুর সহচার্য কাম্য। সুতরাং স্রষ্টা যেখানে আনন্দ উপভোগের জন্য জগৎ সৃষ্টি করেছেন, সেখানে সৃষ্টির সেরা মানুষের সাথে তাঁর বান্দা মনিব সম্পর্ক হতে পারে না। বস্তুত ইসলাম ও হিন্দু মতে মানুষ ও স্রষ্টার সাথে প্রেম ও প্রেমাস্পদের সম্পর্ক বিদ্যমান। সূফী নিজেকে প্রেমিক এবং স্রষ্টাকে প্রেমাস্পদ বলে মনে করে এবং সেভাবে রূপকের ব্যবহারিক স্বরূপে তা অভিব্যক্ত করেন। একইভাবে বৈষ্ণবরা ভগবানকে প্রেমময় প্রেমিক এবং নিজেকে প্রেমিকার আসনে বসিয়ে ধ্যান করেন।

Dhaka University Institutional Repository

৭. ইসলাম এবং হিন্দু উভয় ধর্ম মনে করে প্রেম মানুষকে মুক্তি দেয়, জীবনকে উন্নত করে। ইহা জীবকে সকল প্রকার তুচ্ছতা, ক্ষুদ্রতা ও সকল সীমার উর্ধ্বে উঠায়। ইহা মানুষকে অহিংস, সহিষ্ণু, উদার ও পরোপকারী করে। ফলে প্রেমিকের নিকট ধনী-গরীব, শত্রু-মিত্রের কোন ভেদাভেদ থাকে না। তার নিকট সকল মানুষ সমান হয়।

৮. ইসলাম ও হিন্দু মতে প্রেম জগৎ ও জীবনের প্রেরণাশক্তি। উভয় ধর্ম মতে বিশ্বের সকল জড়বস্তু, প্রাণ, জীবন পরমসত্তা হতে উৎপত্তি লাভ করেছে এবং প্রত্যেক বস্তু বা অনু-পরমাণুর মধ্যে প্রেমের আর্কষণ শক্তি রয়েছে। এই আর্কষণ শক্তিই জগতের গতি-স্থিতির কারণ।

৯. ইসলাম ও হিন্দু উভয় ধর্ম মনে করে প্রেম তাত্ত্বিক জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। যেমন-প্রখ্যাত সূফী মাওলানা রুমী বলেন বুদ্ধি আংশিক ঐক্যসূত্র স্থাপন করতে পারে কিন্তু জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই দুয়ের দ্বৈততা সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করে ঐক্য স্থাপন করতে পারে না। প্রেম এক্ষেত্রে একমাত্র কার্যকরী শক্তি। একইভাবে উপনিষদে বলা হয়েছে বুদ্ধি বা বিচারমূলক জ্ঞানের দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায় না। এখানে আরো বলা হয়েছে আত্মা ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, অনুমানের অযোগ্য এবং প্রমাণের বর্হিভূত। কেবলমাত্র একে আত্মারূপে অনুভব করা যায় অর্থাৎ প্রেম বা স্বজ্ঞার মাধ্যমে একে উপলব্ধি করা যায়।

১০. ইসলামের সূফী এবং হিন্দু মতে মানব জীবনের লক্ষ্য পরমসত্তার সাথে মিলন। কিন্তু যতদিন না প্রেমিকের ভালবাসার পাত্র তার সর্বোচ্চ আদর্শ না হয় ততদিন তার মধ্যে প্রকৃত প্রেম জন্মাতে পারে না। যতক্ষণ হুঁশ থাকে, যতক্ষণ জাগতিক জ্ঞান জাগ্রত থাকে ও ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য অনুভূতি সজাগ থাকে ততক্ষণ তাকে দেখা যায় না, তার সাথে মিলিত হওয়া যায় না। সূফী এবং হিন্দু মরমীরা উভয়ই এ ধারণায় বিশ্বাস করে। যেমন পবিত্র কুরআনে সূরা আ'রাফ-এ বলা হয়েছে, হযরত মুসা (আ.) আল্লাহ্‌কে দেখতে চাইলেন কিন্তু আল্লাহ্ বললেন! তুমি আমাকে কিছুতেই (তোমার দেহের চর্মচক্ষে) দেখবে না। তুমি বরং তূর পাহাড়ের দিকে তাকাও। যদি তা স্বস্থানে স্থির থাকে তবে তুমি আমাকে দেখবে। এরপর

Dhaka University Institutional Repository

যখন তাঁর রব তূর পাহাড়ে জ্যোতিস্মান হলেন, তাজাল্লী প্রকাশ করলেন যখন তা পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল আর মূসা (আ.) বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। [৫] কিন্তু ইসলামের সর্বশেষ নবী (স.) মিরাজের সময় আল্লাহ্‌র সঙ্গে দিদার লাভে সক্ষম হয়েছিলেন; আর ইহা সম্ভব হয়েছিল আল্লাহ্‌ প্রতি তার একনিষ্ঠ প্রেম এবং তার প্রতি আল্লাহ্‌র করুণার ফলেই। একইভাবে হিন্দুধর্ম মনে করে সাধারণ চর্মচক্ষে ভগবানকে দেখা যায় না। ভগবান যদি ভক্তকে দিব্যচক্ষু দেন তবে ভক্ত তার মাধ্যমে তাঁকে দেখতে পান। যেমন অর্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শনের সময় ভগবান কৃষ্ণ দিব্যচক্ষু দিয়েছিলেন। এপ্রসঙ্গে রামকৃষ্ণ পরমহংস বলেন, "সাধনা করতে করতে একটি প্রেমের শরীর হয়... এই প্রেমের শরীরে আত্মার সাথে রমন হয়।"[৬]

১১. ইসলাম ও হিন্দু উভয় ধর্ম মনে করে ঐশী প্রেম স্বর্গীয়দান; কেবল সাধনার মাধ্যমেই ইহা অর্জন করা যায় না। আল্লাহ্‌ যাকে বিশেষভাবে মনোনীত করেন তাকে তা দান করেন। এ অনেকটা জিনুকের মুক্তার মত। কোন জিনুকের গর্ভে মুক্তা হবে তা আল্লাহ্‌র ইচছা ও পছন্দের উপর নির্ভর করে। তিনি যাকে করুণা করেন তাকেই তাঁর নূর থেকে আলো দান করেন। অর্থাৎ যাদেরকে আল্লাহ্‌ ভালবাসেন তারাই আল্লাহ্‌কে ভালবাসতে সক্ষম। তবে তাঁর কাছে কৃপা প্রার্থনা করতে হয়। চাওয়ার আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়ে তিনি দয়াদ্র হয় তাঁর কাছে আপনি টেনে নেন। এরূপ একই কথার প্রতিধ্বনি শোনা যায় উপনিষদে-উত্তমরূপে বেদাধ্যায়ন দ্বারা এই আত্মাকে পাওয়া যায় না।... এই আত্মা যাকে বরণ করেন (যোগ্য বলে গ্রহণ করেন) তিনিই তাঁকে পেয়ে থাকেন। তাঁর নিকট এই আত্মা স্বীয় তনু অর্থাৎ আপনার স্বরূপ ও মহিমা প্রকাশ করেন।[৭]

১২. সাধারণ মানুষ মরতে চায় না, মরণকে ভয় করে; ভালবাসে এ পৃথিবীকে, ভালবাসে এর প্রকৃতি এবং অপর মানুষকে। এ ভালবাসার বন্ধন ছিন্ন করে চলে যেতে তাঁর মন চায় না। কিন্তু সূফী ও বৈষ্ণব উভয় প্রেমের ক্ষেত্রে দেখা যায় উভয়ের মধ্যে যখন ঐশী প্রেম সুপ্রতিষ্ঠিত হয় তখন তারা মৃত্যুকে কামনা করেন, মর্ত্যজীবনকে তখন তাদের কাছে মনে হয় পিঞ্জিরাবদ্ধ পাখির মতো। পিঞ্জিরায় আবদ্ধ পাখি ডানা ঝট্‌ পটিয়ে যেমন উড়ে যেতে চায় অসীম আকাশের পানে তেমনিভাবে সূফী এবং

Dhaka University Institutional Repository

বৈষ্ণবরা প্রেমের অতিশয্যে মৃত্যুর মাধ্যমে অমৃত্যুর সাথে মিলিত হয়ে, অমৃত্যুর আনন্দ উপভোগে সদা উদগ্রীব থাকে। এ 'বেদনার পরিসমাপ্তি ও অবসানের চরমতৃপ্তি তাঁরই মিলনে। এ মিলনেই ভক্তের আত্মা পরম আনন্দ নীড়ে আশ্রয় লাভ করে চির শান্তি লাভে হয় অমর।

১৩. সূফী ও বৈষ্ণব উভয়ই পরমসত্তার প্রেমের কাঙ্গাল। মানবাত্মার সুপ্ত বিরোহবোধের উদ্বোধনই তাদের প্রধান কাজ। তাই দেখা যায় সূফী এবং বৈষ্ণবদের মধ্যে যখন ঐশী প্রেম সুপ্রতিষ্ঠিত হয় তখন প্রেমাস্পদই তাদের একমাত্র কাম্যবস্তু হয়ে দাঁড়ায়। এমনকি স্বর্গসুখ তাদের কাছে তুচছ বলে প্রতিয়মান হয়। তখন প্রেমিক জাগতিক আসক্তি ত্যাগ করে সর্বাবস্থায় তাঁর বিধানের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন, তাঁর গুণে গুণান্বিত হন, তাঁকে নিয়ে সদা ব্যাপৃত থাকে এবং তাঁর সাক্ষাৎ লাভের জন্য সদা ব্যাকুল থাকে। সর্বোপরি এরূপ অবস্থায় তারা সবকিছুকে আল্লাহ্ বা ব্রক্ষময় দেখেন।

১৪. সূফী এবং হিন্দু মতে মুক্তি প্রাপ্ত প্রেমিক মৃত্যুর পর প্রেমাস্পদের সাথে মিলিত হবে। হিন্দুধর্ম মনে করে যে, মোক্ষলাভের পর মৃত্যু হলে আত্মা ব্রক্ষের সাথে মিলিত হবে এবং ব্রক্ষ থেকে এ আত্মা আর কখনো বিচিছন্ন হবে না। এ অবস্থায় আত্মা অসীমতা অর্জন করে এবং ব্রক্ষের গুণে গুণান্বিত হয়। অনুরূপভাবে সূফীরা মনে করেন যে, পার্থিব জীবনে যদি আত্মার পরিশুদ্ধি ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়, তাহলে মৃত্যুর পর আত্মা আল্লাহ্র দিদার লাভে সক্ষম হবে। সূফীদের মতে, জান্নাত অজর্ন নয় বরং আল্লাহ্র সাথে মিলন বা তাঁর দিদার লাভই মানব জীবনের পরম লক্ষ্য। হিন্দু ও মুসলিম মরমীরা এও মনে করেন যে পার্থিব জীবনেই ব্রক্ষভাব প্রাপ্ত হওয়া[৮] বা আল্লাহ্ময় হওয়া যায়।[৯]

১৫. হিন্দুধর্ম মনে করে ইহজীবনে ব্রক্ষলাভ (জীবন্মুক্তি) সম্ভব। এবং জীবন্মুক্তির পর মৃত্যু হলে বা বিদেহ মুক্তিতে আত্মা ব্রক্ষে গিয়ে মিলিত হয়। এ মিলন হচেছ মানবাত্মার উৎসের নিকট গিয়ে পৌঁছা। অর্থাৎ লবন যেরকম পানির সাথে মিশে যায়, নদী যেমন সমুদ্রে গিয়ে একীভূত হয় তেমনি মানবাত্মাও ব্রক্ষের সাথে মিলিত হয়।[১০] লবন পানিতে অদৃশ্য হয়ে গেলেও পানির মধ্যে যেমন তার অস্তিত থাকে ঠিক ব্রক্ষের সাথে মানবাত্মা

Dhaka University Institutional Repository

একীভূত হলেও মানবাত্মার স্বাতন্ত্র্য থাকে। মানবাত্মা ব্রহ্মের সাথে একীভূত হয়ে স্বীয় অস্তিত হারায় না। তেমনি সূফীরাও মনে করেন ইহজীবনেই আল্লাহ্‌র সত্তায় স্থিতিলাভ সম্ভব, আল্লাহ্‌র ঐশীগুণে গুণান্বিত হওয়া সম্ভব। এবং মৃত্যুর পরে প্রেমিক প্রেমাস্পদ আল্লাহ্‌র সাথে মিলিত হলেও তার ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য হারায় না।

ঐশী প্রেম সম্পর্কে ইসলাম ও হিন্দু মতের বৈসাদৃশ্য

ইসলাম ও হিন্দুধর্মের ঐশী প্রেমের ধারণার মধ্যে যেমন কতকগুলো সাদৃশ্য রয়েছে তেমনি কতকগুলো বিষয়ে বৈসাদৃশ্যও রয়েছে। যেমন:

১. দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে মানুষের জীবন। সুষ্ঠুভাবে বেঁচে থাকার জন্য যেমন প্রয়োজন দেহের তেমনি প্রয়োজন আত্মার। দেহ হলো আত্মার বাহন সদৃশ। দেহ বস্তু জগতের সাথে সংশ্লিষ্ট আর আত্মা হলো এক আধ্যাত্মিক সত্তা। ইসলাম মানুষের দৈহিক ও আধ্যাত্মিক দিককে বিচ্ছিন্ন করেনা, পার্থিব ও অপার্থিব জীবনকে ভিন্ন মনে করেনা, বরং দৈহিক ও আধ্যাত্মিক উভয়ের সমন্বয়েই পূর্ণাঙ্গ জীবন গঠিত বলে মনে করে। কিন্তু হিন্দু মরমীরা আত্মশুদ্ধির ব্যাপারে দৈহিক আবেদনের গুরুত্বকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে। হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টানমরমীরা আত্মনিগ্রহকে ঐশী প্রেম লাভের উপায় বলে মনে করে। কিন্তু সূফীরা জীবনের পার্থিব তাৎপর্যকে নস্যাৎ করে আধ্যাত্মিক সাধনার দ্বারা মুক্তি লাভের অনুসন্ধান করেনা। এ কারণে ইসলামের সন্ন্যাসবাদ বা চিরকৌমার্যকে আদর্শায়িত করা হয়নি,বরং স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সংসার যাত্রা নির্বাহের ভিতর দিয়েই শ্রেয় ও প্রেয়োর অনুসন্ধান করতে বলা হয়েছে।

২. সূফীবাদ জীবনের বিভিন্ন দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে সীমারেখা না টেনে অন্যান্য সাধনার সাথে শ্রেয় ও প্রেয়োর সাধনাকে আলাদা না করে জীবনের প্রত্যেক স্তরের দায়িত্ব ও কর্তব্যের উপর সমান গুরুত্ব আরোপ করে। সূফী পরিবার ও তার সমাজের সদস্য এবং রাষ্ট্রের নাগরিক এজন্য একজন সূফী সাধক তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ছাড়াও পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র তথা বিশ্বমানবের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদন করেন। মনুষ্যত্বের

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ণতা সাধন বা ইনসান-ই-কামিল হওয়ার সাধনাই সূফী শিক্ষার মূল বিষয়। এজন্য তাসাওউফ খাঁটি ইসলামী জীবন চেতনায় উদ্বুদ্ধ মুসলমান হিসেবে জীবনের প্রত্যেক দিক ও স্তরের পরিক্রমনের উপর জোর দেয়। যে কোন সামান্য একটা দিকও বাদ দিলে জীবন পূর্ণভাবে বিকশিত হতে পারেনা।এ কারণেই ইসলামে সন্ন্যাস বা চিরকৌমর্যকে আদর্শায়িত করা হয়নি। পক্ষান্তরে হিন্দু মরমীরা জীবনের বিভিন্ন দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে সীমারেখা টানেন। এবং জীবনকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেন। এসব সাধু সাধারণত সন্ন্যাস জীবনের পক্ষপাতি এবং ধ্যানের মধ্যে এতবেশী পরিমাণ মশগুল থাকেন যে, জাগতিক কার্যাবলীর সাথে তাদের সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়।

৩. পরমসত্তায় লীন হওয়াই হিন্দু মরমী সাধকদের চরমলক্ষ্য। জগতের সর্বপ্রকার মায়া-বন্ধন কাটিয়ে আত্ম বিন্যাশের মাধ্যমে ঐশী সত্তায় লীন হয়ে আধ্যাত্মিক সাধনার চরম মনযিলে উপনীত হন এবং এভাবে তারা তাদের সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে তথা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে ফানা তথা আত্মবিনাশ সূফীদের পরম লক্ষ্য নয়। পরম লক্ষ্য হলো বাকা অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় অমর জীবন লাভ করা। মানুষের সাথে আল্লাহ্‌র সম্পর্ক গভীর ও অন্তহীন প্রেমের। যদি ঐশী সত্তার মধ্যে মানুষের অস্তিত্ব অবলুপ্ত হয় তাহলে প্রেমিক-প্রেমাস্পদ সম্পর্কের অবসান হয় এবং আল্লাহ্‌র সৃষ্টি কৌশল ও রহস্য মাঝপথে হারিয়ে যায়। কারণ সূফীদের মতে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ মহান আল্লাহ্‌কে শর্তহীনভাবে এবং সর্বাধিক ভালবাসবে।[১১]

৪. সূফীবাদের সাথে হিন্দু মরমীবাদের অন্য একটি প্রধান পার্থক্য হলো যে ইসলামে আল্লাহ্‌র সাথে বান্দার সম্পর্ক প্রত্যক্ষ, এর মাঝখানে তৃতীয় কোন পুরোহিত বা পাদ্রীসম শ্রেণী নেই। এখানে পীর বা শায়েখ দুর্গম সূফীপথের পথ প্রদর্শক বা মুর্শিদ মাত্র, তিনি পৃথক কোন শ্রেণীর প্রতিনিধি নন। কিন্তু হিন্দু ধর্মে ব্রহ্ম ও মানুষের মধ্যে তৃতীয় পুরোহিত শ্রেণীর অস্তিত্ব বিদ্যমান। এ পুরোহিতগণই আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করার যথার্থ পাত্র। ভক্তগণ তাঁর মাধ্যমেই আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা পৌঁছে দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

৫. হিন্দু মরমীদের ক্ষেত্রে দেখা যায় সাধক ধর্মের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দিককে পৃথকভাবে দেখে এবং সাধক যখন অভ্যন্তরীণ দিকের চর্চা ও সাধনা শুরু করেন, তখন তিনি ধর্মীয় বাহ্যিক ক্রিয়া-কলাপের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করেন। এ সময়ে ধর্মীয় বাহ্যিক ক্রিয়া-কলাপ না করলেও তার চলে। তাদের মতে, ধর্মীয় বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান নিম্নস্তরের সাধনা। ইহা সাধারণ মানুষের জন্য প্রয়োজন কিন্তু উচ্চ স্তরে আরোহন করলে সাধক এই সাধারণ স্তরকে উত্তরণ করেন। কাজেই এ সময় শাস্ত্রীয় বিধি-বিধান ও ক্রিয়া-অনুষ্ঠানাদি করার প্রয়োজনীয়তা হিন্দু মরমীরা বোধ করেন না। পক্ষান্তরে সূফীগণ সাধনার যত উচচ স্তরেই ওঠেন না কেন কোন সময়ই তিনি ইসলামী শরীয়তের সামান্যতম বিরোধিতা করতে পারেননা, বরং আরো ঘনিষ্ঠভাবে ইসলামের বাহ্যিক দিকের (শরীয়াতের) অনুসরণ করেন। বাহ্যিক (যাহিরী) ও অভ্যন্তরীণ (বাতেনী) দিকের সুসমন্বয়ের সাধনা সূফী দর্শনের পূর্ণাঙ্গ রূপ। বাহ্যিক অনুষ্ঠানাদি বাদ দিয়ে ইসলামে একজন সাধকের পক্ষে কখনই মারিফাত বা বেলায়েত লাভ করা সম্ভব নয়।

৬. সূফীবাদে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাকে অর্থ্যাৎ কাশফ, ইলহাম, এলকা, খোয়াব ও বাশারাতকে কুরআন ও হাদীসের অনুমোদন সাপেক্ষে গ্রহণীয় হতে হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, আধ্যাত্মিক জগতের কোন কিছু সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অনুভূতি বা স্বজ্ঞা লাভ করাকে কাশফ, আধ্যাত্মিক জগতের কোন গূঢ় বা জটিল বিষয়ে অন্তরে স্থির প্রতীতির সৃষ্টি হওয়াকে এলকা, আধ্যাত্মিক জগতের কোন কিছু সম্বন্ধে কোন জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়াকে ইলহাম বলে। অনেকের মতে কাশফ, ইলহাম এবং এলকা আসলে একই জিনিষের ভিন্ন নাম মাত্র। আবার খোয়াব বা স্বপ্নযোগেও অনেক গূঢ় রহস্য আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাদের সামনে প্রকাশ করা হয়। এই স্বপ্ন আক্ষরিক বা প্রতীক ধর্মী- এই উভয় ধরনেরই হতে পারে। বাশারাত শব্দের অর্থ সুখবর। সূফী বিশ্বাস করেন যে, অনেক সময়ে মহান আল্লাহ্‌ কোন ঘোষকের দ্বারা আধ্যাত্মিক জগতের কোন রহস্য তার প্রিয় বান্দাদের সামনে উন্মোচিত করেন। কিন্তু হিন্দু মরমীবাদের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাকে যাচাইয়ের কোন প্রত্যক্ষ মানদণ্ড নাই। আবার ইসলাম একজন সূফী যতবড়ই হোন না কেন তিনি নিজস্বভাবে নীতি নির্ধারণী কোন বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারেন না। এখানে নতুনভাবে উদ্ভাবিত কিছু শাস্ত্র পদবাচ্য হয় না; কুরআন ও হাদীসের

Dhaka University Institutional Repository

দ্বারা সমর্থিত হলেই ইসলামে কোন কিছু ভাষ্যের মর্যাদা পায় মাত্র। পক্ষান্তরে হিন্দু ধর্মে শাস্ত্র সৃষ্টি অনেক সহজ ব্যাপার। অবতার হওয়ার পথ পর্যন্ত এ ধর্মে এখনো রুদ্ধ হয়নি। তাই রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে অবতার মানলে কেউ সনাতন ধর্মের বাইরে চলে যান না। কিন্তু ইসলামে হযরত মুহাম্মদ (স.) শেষ নবী না মানলে, তাঁর অনুসরণ না করলে একজন আর মুসলমান থাকে না।

৭. একজন সূফী সাধক আল্লাহ্‌কে মাশুক (প্রেমিক) মনে করে নিজে পুরুষ হিসেবে তাঁর মনঃসন্তুষ্টির চেষ্টা করে। পক্ষান্তরে একজন বৈষ্ণব ভক্ত ভগবানকে পরম প্রিয় মনে করে নিজেকে দাসী, সখী, মাতা ইত্যাদি নানাভাবে বিভাষিত করে তাঁর ধ্যান করেন।

৮. সূফীরা পরমসত্তাকে অধিকাংশক্ষেত্রে নারীরূপে কল্পনা করেছেন। অন্যদিকে বৈষ্ণবরা তাঁকে পুরুষরূপে কল্পনা করেন, যার জন্য সমস্ত প্রকৃতি নারীরূপে পাগলীর মত ছুটে চলছে তাঁর অভিসারে।

৯. ইসলাম ধর্মে প্রেমিককে প্রেমাস্পদ-আল্লাহ্‌র সাথে মিলিত হবার পূর্বে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কবরে থাকতে হয়। এবং বিচার দিবসে তার আবার দৈহিক পুনরুত্থান ঘটে।[১২] কিন্তু হিন্দুধর্মে কবরের জগতের কোন ধারণা নেই।

১০. ইসলাম মতে পুনরুত্থানের পর শেষ বিচারের মাধ্যমে মানুষ তার কর্মানুসারে জান্নাত বা দোযখ লাভ করবে। জান্নাতবাসীরা সেখানে অনন্তকাল থাকবে তবে পাপীরা তাদের শাস্তির ফল ভোগ শেষে আল্লাহ্‌র মেহেরবাণী জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তথায় চিরদিন সুখ ভোগ করবে। কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রে জীবের কৃতকর্মানুসারে স্বর্গাদি ভোগের ব্যবস্থা আছে তবে তা অনন্তকালের জন্য নয়। যে কর্মবিশেষের ফলে জীবের স্বর্গাদি লাভ হয়, সেই কর্মের ফলভোগ শেষ হলেই তাকে আবার জন্মগ্রহণ করতে হয়। ভগবৎ প্রাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত জন্মকর্মের নিবৃত্তি নেই।

Dhaka University Institutional Repository

১১. হিন্দুধর্মের প্রেমের ক্ষেত্রে দেখা যায় ঈশ্বর মানুষকে ভালবাসেন। আর ভালবাসেন বলেই তিনি মানবের মঙ্গলের জন্য ধরাপৃষ্ঠে অবতরণ করেন। এবং মানবিক কল্যাণে কর্ম করে মানবের হৃদয় ও মন হরণ করেন। যার ফলে মানুষ তাঁর প্রতি প্রেমভাবাপন্ন হয়ে উঠে।যেমন ভাগবত পুরাণে বলা হয়েছে, 'আমি ভক্তের অধীন, সুতরাং পরাধীন।... আমি ভক্তের প্রিয়, ভক্ত আমার প্রিয়।'[১৩] কিন্তু ইসলাম ধর্মে এরূপ কোন ধারণার অবকাশ নেই। ইসলাম মতে আল্লাহ্ মানবকে তাঁর পরিচয় লাভের জন্য, তাঁর প্রেম লাভের জন্য মানবের সাহায্যের জন্য যুগে যগে নবী-রাসূল বা প্রেরিত পুরুষ পাঠিয়েছেন।কিন্তু তিনি নিজে কখনো অবতাররূপ গ্রহণ করেননি।

উপর্যুক্ত আলোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, ইসলাম ও হিন্দুধর্মের প্রেমের ধারণার মধ্যে বৈসাদৃশ্যের তুলনায় সাদৃশ্যের সংখ্যাই বেশী। উভয় ধর্মের মধ্যে যে,বৈসাদৃশ্যে রয়েছে তা মূলত সাধন পদ্ধতির মধ্যে। তবে এদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। ইসলাম ও হিন্দুধর্মকে তুলনা করা যেতে পারে বিভিন্ন সময়ে উদ্ভূত, বিভিন্ন দেশের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত বিভিন্ন আকৃতির নদী সমূহের সাগরের সাথে মিলিত হবার কর্ম প্রয়াসের সাথে। সাগরের সাথে মিলনেই যেমন নদীর সার্থকতা তেমনি মানুষকে পরমসত্তার সাথে মিলিত করণের মধ্যেই ধর্মের সার্থকতা। নদী সাগরে পতিত হয়ে যেমন সাগরের রং ধারণ করে, সাগরের গুণে গুণান্বিত হয় তেমনি ইসলাম ও হিন্দুধর্মে ঐশী প্রেমিকগণ পরমসত্তার সাথে মিলিত হয়ে তাঁরই গুণে গুণান্বিত হন।

বস্তুত মানব জীবনকে সুন্দর সুখময় এবং সার্থক করে গড়ে তোলার জন্যই জগতের ধর্মসমূহের উদ্ভব। যেমন হিন্দুধর্মে বলা হয়েছে ঈশ্বর মানুষের সংকট কালে তাঁর অসাধারণ ঐশী শক্তি বলে নরদেহ ধারণ করে মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ধরাপৃষ্ঠে আর্বিভূত হন; এই আর্বিভাবের মূল উদ্দেশ্য মানবকে দিব্যকর্মের আদর্শ দেখিয়ে দিব্যজীবনের অধিকারী করা।[১৪]একইভাবে ইসলামে বলা হয়েছে আল্লাহ্ যুগে যুগে মানবজাতির হেদায়েতের (মুক্তির) জন্য পথ প্রদর্শক হিসেবে প্রেরিত পুরুষ বা নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। এবং তাদের মাধ্যমে মানবজাতির জন্য দিয়েছেন

Dhaka University Institutional Repository

জীবন বিধান। এ প্রসঙ্গে কুরআনে বলা হয়েছে,"এমন কোন সম্প্রদায় অতীত হয়নি যাদের মধ্যে কোন ভয় প্রদর্শনকারী প্রেরিত হননি। পুরাতন পুস্তকে (Old Testament) অনেক প্রেরিত পুরুষের কথা কুরআনে উল্লেখ রয়েছে। ইসলামে বলা হয়েছে জাতিতে-জাতিতে, মানুষে-মানুষে কোন ভেদাভেদ নেই। সকলেই একই আদি পুরুষ থেকে উদ্ভূত। কাজেই সকল মানুষ ভাই-ভাই। সুতরাং প্রত্যার্দিষ্ট ধর্মসমূহ মূলত আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। তাই বিভিন্ন যুগে সৃষ্ট ধর্মসমূহের মধ্যে ঐক্য রক্ষার্থে আবার ইসলামে মহান আল্লাহ্‌ বলেন, "তুমি বল-হে গ্রন্থানুসারিগণ! আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে যে অভিন্নতা রয়েছে তার দিকে এসো যেন আমরা আল্লাহ্‌ ব্যতীত কারো উপাসনা না করি ও তাঁর কোন অংশীদার স্থির না করি। এবং আল্লাহ্‌কে পরিত্যাগ করে আমরা পরস্পর কাউকে প্রভূরূপে গ্রহণ না করি।[১৫] এই ঐক্যকে সুদৃঢ় করার জন্য কুরআনে আরো বলা হয়েছে,"তোমরা একযোগে আল্লাহ্‌র রজ্জু সুদৃঢ়ভাবে ধরে রাখ এবং বিভক্ত হয়োনা।"[১৬] আবার মানব সম্প্রীতি যাতে বিঘ্নিত না হয় এবং অন্যায়ভাবে একজন যাতে অন্যজনকে হত্যা না করে সেইজন্য কুরআনের হুশিয়ারী বাণী হলো: যে একজন মানুষকে হত্যা করছে সে যেন গোটা মানব জাতিকেই হত্যা করছে, যে একজন মানুষকে রক্ষা করছে সে যেন গোটা মানব জাতিকেই রক্ষা করছে।[১৭]

কাজেই উপরের আলোচনা থেকে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রতিয়মান হয় যে, বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে বৈসাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও প্রত্যেকটি ধর্ম মানুষকে ভালবাসতে শিখায়, অন্যের প্রতি সহানুভূতির কথা বলে, নৈতিক জীবনে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে, সর্বোপরি পরমসত্তাকে ভালবাসতে বলে। এবং উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করে-"প্রেমেই মুক্তি।" বস্তুত মানুষ যদি আল্লাহ্‌ বা ঈশ্বরকে ভালবাসতে পারে তবে সে ভালবাসতে পারবে তাঁর সৃষ্টি জীবকে। আর এরই ফলে প্রতিষ্ঠিত হবে একটি শান্তিময় ও সৌহার্দ্যময় বিশ্ব।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ

১। *আল কুরআন ১৭:৮৫*

২। *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ*, ৪/৩

৩। *আল কুরআন*, ২৬:৮৯

৪। *মুণ্ডক উপনিষদ*, ১/১/১

৫। *আল কুরআন*, ৭: ১৪৩

৬। স্বামী বেদান্তনন্দ, *ভক্তি প্রসঙ্গ*, কলকাতা, ১৩৬৮, পৃ. ১৯

৭। *কঠ উপনিষদ*, ১/২/২৩, *মণ্ডক উপনিষদ*, ৩/২/৩

৮। *মণ্ডক উপনিষদ*, ৩/২/৪; *বৃহদারণ্য উপনিষদ* ৪/৪/১১

৯। পার্থিব জীবনে আল্লাহ্ময় হওয়া বা আল্লাহ্র সত্তায় স্থিতি লাভ সম্ভব। মনসুর হাল্লাজ, বায়েজিদ বোস্তামি, আবু বকর শিবলি প্রমুখ প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

১০। *মণ্ডক উপনিষদ*, ৩/২/৮; *বৃহদারণ্য উপনিষদ*, ২/৪/১২

১১। *আল কুরআন*, ২: ১৬৫

১২। *আল কুরআন*, ২০: ৫৫;৭৫:৩৪

১৩। *ভাগবত পুরান*, ৯/৪/৬৮

১৪। *গীতা*, ৪/৮

১৫। *আল কুরআন*, ৩:৬৪

১৬। *আল কুরআন*, ৩:১০৩

১৭। *আল কুরআন*, ৫: ৩২

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার

উপসংহারে আমরা ঐশী প্রেম সম্পর্কিত বিভিন্ন অধ্যায়ে যে বিষয় আলোচিত হয়েছে এর একটি নির্যাস উপস্থাপনের চেষ্টা করবো।

ইসলাম ও হিন্দুধর্ম গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ঐশী প্রেম উভয় ধর্মেরই সারবস্তু। ইহা জগৎ সৃষ্টির কারণ, নৈতিকতার পূর্ণতম আদর্শ এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ভিত্তি। পরমসত্তা স্বপ্রণোদিত হয়ে এ জগতের সৃষ্টি করেছেন। প্রেমের বিনিময় সাধনই তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য। এবং এই সৃষ্টি রাজ্যের মধ্য দিয়ে নিজেকে বিকশিত করাই তাঁর পরম লক্ষ্য। তাই এ জগতের মূলে রয়েছে এক নিগুঢ় প্রেমের বন্ধন।

ইসলাম ও হিন্দুধর্ম মানব সাম্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। এ সাম্যের ভিত্তি প্রেমেই নিহিত রয়েছে। প্রেম মানুষকে জাতিভেদ ও বর্ণভেদ অতিক্রম করে একটি উদার, মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী করে তোলে। ইসলাম ও হিন্দু মতে আত্মা একটি আধ্যাত্মিক সত্তা। ঐশী উৎসের দিক থেকে সকল আত্মা পরম সত্তা (আল্লাহ বা ব্রাহ্ম) এর নিকট থেকে এসেছে এবং তাঁর নিকটেই প্রত্যাবর্তন করবে। কাজেই ঐশী উৎসের দিক থেকে প্রত্যেক মানুষ একই গুণের অধিকারী। অতএব, নিজেকে বড় ভেবে অহংকার করার আর অন্যকে ছোট ভেবে হেয় করার কোন অবকাশ নেই, মানুষে মানুষে কোন ভেদ নেই। কৃষ্ণাঙ্গ-শ্বেতাঙ্গ, ধনী-গরীব প্রভৃতিতে ভেদ করা যেমন অবাঞ্ছনীয় তেমনি উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণে পার্থক্য করাও অবাঞ্ছনীয়। সকল মানুষ এক পরম প্রেমময়ের প্রকাশ। উচ্চ বর্ণের মানুষ যেমন সাধনার মাধ্যমে তার প্রেমাস্পদকে লাভ করতে পারে, তেমনি পারে নিম্ন বর্ণের মানুষ। এজন্য ইসলামে মহানবী (স.) বলেছেন, কোন আরব কোন অনারবের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয় এবং কোন অনারব কোন আরবের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়; কোন সাদা কোন কালোর চেয়ে এবং কোন কালো কোন সাদার চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়। আমরা সবাই আদম সন্তান।

ঐশী প্রেম সকল প্রাণীকে ভালবাসতে শিখায়। ইসলাম ও হিন্দু মতে পরমসত্তা আল্লাহ্ বা ব্রহ্ম জগতের সকল বস্তুর স্রষ্টা। তিনি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের প্রতি যেমন প্রেমময় তেমনিভাবে অন্য জীবকেও ভালবাসেন। তাই বিবেক-বুদ্ধি, ক্ষমতা, অর্থ ও সৌন্দর্যের দিক থেকে যে নিম্নতর তাকে যেমন হেয় ভাবে দেখা

Dhaka University Institutional Repository

যায় না. তেমনি মানবেতর প্রাণীর প্রতিও নির্মম হওয়া উচিত নয়। কারণ মানবেতর প্রাণীও স্রষ্ঠার সৃষ্টি। এবং মানব কল্যাণেই এদের সৃষ্টি করা হয়েছে। এ সম্পর্কে ইসলামে বলা হয়েছে, "আল্লাহ্‌র সৃষ্টির সমস্ত প্রাণী আল্লাহ্‌র পরিবারের সদস্য, যিনি আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে যত বেশী ভালবাসেন, আল্লাহ্ তাকে তত বেশী ভালবাসেন।" আবার স্বামী বিবেকানন্দ বলেন- " জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।" ইসলাম বিনা প্রয়োজনে গাছের একটি পাতা ছিঁড়াতেও নিষেধ করে। স্রষ্টার সৃষ্টি জীব হিসাবে প্রতিটা জীবের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করতে সকল ধর্মই মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, এক ঐশী উৎসে বিশ্বাস, প্রেমময় সষ্টার একত্বে বিশ্বাস, ভ্রাতৃত্ব, সাম্য, মৈত্রী ও প্রেমের উপলব্ধি সৃষ্টি করে এবং মানবেতর প্রাণীর প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতা প্রকাশে প্ররোচিত করে।

ইসলাম এবং হিন্দুধর্মের ঐশী প্রেমের আলোচনায় দেখা যায় যে, উভয় ধর্ম দেহ ও মনের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করে মানুষের যথার্থ প্রকৃতি উপলব্ধিতে প্রয়াসী। প্রেম জড়বাদী চিন্তাধারার প্রভাবমুক্ত। ভোগ-বিলাস একজন প্রেমীকের কাছে নিতান্তই তুচ্ছ বিষয়। মানব জীবনের জন্য যেমন প্রয়োজন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের, তেমনি আত্মার খোরাক বা খাদ্য হলো ঐশী প্রেম। বর্তমান সময়ের দাবী হলো প্রেম বা আধ্যাত্মিকতার সাথে বস্তুবাদী বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সমন্বয় ঘটানো। তবেই মানব সমাজ হিংসা, দ্বেষ, হানাহানি থেকে মুক্ত হয়ে এ পৃথিবীকে যুদ্ধাবস্থা (দারুল হারব) থেকে শান্তির রাজ্যে (দারুসসালামে) পরিণত করতে পারবে। এমনি একটি সমন্বয়ের কথা বলেছেন বাংলাদেশের প্রখ্যাত দার্শনিক ড. জি সি দেব। তাঁর মতে, বিজ্ঞান আমাদের প্রাণচাঞ্চল্য, কর্মমুখরতা, বিষয়নিষ্ঠতা দান করে, বাস্তব মুখী করে তোলে। সভ্যতাকে উন্নততর স্তরে পৌঁছায়। ইহা ছাড়া ব্যক্তিজীবন, সামাজ এবং রাষ্ট্র কাঠামো, চিন্তা করা যায় না। অপরদিকে আদর্শ, মূল্যবোধ, প্রেমবোধ, লোভ-লালসা এবং ধনাসক্তিমুক্ত এবং সংযত জীবন গঠনের জন্য প্রয়োজন অধ্যাত্মবাদ বা ধর্মের।

ঐশী প্রেম মানুষকে পূর্ণ মানবে পরিণত করে। অন্যান্য প্রাণীর সাথে মানুষের একটা বড় পার্থক্য হলো- যে কোন প্রাণী জন্মগ্রহণ করে উক্ত প্রাণীর গুণাবলী নিয়ে। কিন্তু মানুষ, মানুষ হিসেবে জন্মগ্রহণ করেনা, তাকে মনুষ্যত্ব অর্জন করতে হয়। প্রেমের সাধনা হলো মনুষ্যত্ব অর্জনের সাধনা। এ সাধনার মাধ্যমেই মানবাত্মা ফিরে পায় তার সত্যিকারের রূপ। মনুষ্যত্বের সাধনা তথা

Dhaka University Institutional Repository

প্রেমের সাধনার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন আত্মশুদ্ধি। আত্মশুদ্ধির জন্য ইসলাম ও হিন্দুধর্ম হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ-লালসা, পরশ্রীকাতরতা, পরনিন্দা, মিথ্যাভাষণ, ধনাসক্তি, আত্মশ্লাঘা, ঈর্ষা, অহংকার, গর্ব, অতিভোজনস্পৃহা ইত্যাদি মানব প্রবৃত্তির ক্ষতিকর গুণগুলো দূর করণের সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। জোর দেয়া হয় মানব প্রবৃত্তির সদ্‌গুণাবলীর উপর। অর্থাৎ প্রেম, ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা, পবিত্রতা, দয়া-মায়া, দম, দান, আত্মসংযম, সরলতা, অহিংসা ইত্যাদি অর্জনের প্রতি। ইসলামে মহানবী (স.) প্রবৃত্তি দমনের সাধনাকে সবচেয়ে বড় ধর্মযুদ্ধ (জিহাদ এ আক্‌বার) বলে অভিহিত করেছেন। একইভাবে হিন্দুধর্মেও নৈতিকতার বাহ্য দিকের উপর গুরুত্বারোপের সাথে সাথে অভ্যন্তরীণ দিকের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

ঐশী প্রেম আমাদের নৈতিক জীবন আচরণে উদ্বুদ্ধ করে। ঐশী প্রেমের লক্ষ্য হচ্ছে পরমসত্তার সাথে মিলন। এজন্য মানুষকে প্রার্থিব জীবনে নৈতিক কর্ম সম্পাদন করতে হয়। প্রার্থিব জীবনে মানুষ নৈতিকতা অবলম্বন করবে একারণে যে এর মাধ্যমে সে পরম সত্তা আল্লাহ্ কিংবা ব্রহ্মের সাথে মিলিত হয়ে তাঁর অনন্ত সৌন্দর্য উপভোগ করবে; পরম আনন্দের অংশীদার হবে। অতএব, দেখা যাচ্ছে প্রেমিক হওয়ার সাথে নৈতিকতার একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। তাই ইসলাম ও হিন্দুধর্ম পরমসত্তাকে লাভ করার জন্য নৈতিক বিধির উপর জোর দেয়, যার সাথে পাশ্চাত্য দার্শনিক হেগেলের পূর্ণতাবাদের যথেষ্ট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। হেগেলের মতে 'Be a person' (মানুষ হও) এর গুঢ়ার্থ হচ্ছে আত্মপ্রসারতা বা সকলের সঙ্গে একাত্মতার উপলব্ধি। যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তির যথার্থ ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট হয়। হেগেলের মতে, পূর্ণতা লাভ করতে হলে মানুষকে সকলের মঙ্গলের জন্য নিজের স্বার্থকে বিসর্জন দিতে হবে; সকলের মঙ্গলের মধ্যে নিজের মঙ্গল উপলব্ধি করতে হবে। অর্থাৎ এর মাধ্যমে সে সত্যিকার মানুষে পরিণত হবে। আর এ কথাই বলা হয়েছে ঈশ উপনিষদের প্রথম মন্ত্রে বলা হয়েছে যে, ত্যাগের সাথে ভোগ করবে, কারো ধনে লোভ করবে না। পূর্ণতাবাদের দ্বিতীয় কথা হচ্ছে 'Die to Live' (প্রাণ দান করে প্রাণবান হও) এর অর্থ নিজের ইন্দ্রিয়ময়, স্বার্থময় ও আত্মকেন্দ্রিক জীবন পরিহার করে বৃহত্তর ও মহৎ জীবনের অধিকারী হওয়া। সূফীদের ফানা ও বাকার সাথে এর গভীর মিল লক্ষ্য করা যায়। ফানা অর্থ লীন হওয়া, অর্থাৎ নিজেক কামনা-বাসনা, লোভ-লালসাকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে ফেলা। এমনকি আমিত্ববোধকেও বিলীন করা। তবেই বাকার স্তরে পৌঁছা সম্ভব। বাকা অর্থ হলো স্থায়ীভাবে জীবন লাভ। এগুলো হলো সূফী প্রেম স্তরের সর্বোচ্চ দু'টি ধাপ। কাজেই ইহা সুস্পষ্ট যে, ঐশী প্রেমের মূলনীতি হচ্ছে- নৈতিকতার পূর্ণ

Dhaka University Institutional Repository

আদর্শের মূলনীতি। এ নীতির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে সম্ভব বর্তমান অস্থির, ঝঞ্জা-বিক্ষুব্ধ ভোগবাদী সমাজকে আদর্শ সমাজে পরিণত করা।

জগতের সকল ধর্মের ন্যায় ইসলাম ও হিন্দুধর্ম মানবতাবাদ, অহিংসা ও মানব জাতির ঐক্যের উপর গুরুত্বারোপ করে। যিনি অপরাপর মানুষকে ভালবাসে ঈশ্বর তাকে ভালবাসে। এ নীতি সকল ধর্মের অন্যতম মৌলিক নীতি। যেমন- গীতায় বলা হয়েছে যে, যিনি কাউকে দ্বেষ করেন না; যিনি সকলের প্রতি মিত্র ভাবাপন্ন ও দয়াময়, যিনি সমত্ববুদ্ধি ও অহংকার বর্জিত, যিনি সুখে-দুঃখে সমভাবাপন্ন, সদাসন্তুষ্ট, সমাহিত চিত্ত, দৃঢ়বিশ্বাসী, যার মন বুদ্ধি ঈশ্বরে অর্পিত তিনিই তাঁর প্রিয়। মানবতাবাদের এ নীতির সাথে সাথে গীতায় ঘোষিত হয়েছে অহিংসার বাণী- যা হতে কোন প্রাণী উদ্বেগপ্রাপ্ত হয় না এবং যিনি স্বয়ং কোন প্রাণী কর্তৃক উত্যক্ত হন না, এবং যিনি হর্ষ, অহর্ষ, ভয় ও উদ্বেগ হতে মুক্ত, তিনিই ঈশ্বরের প্রিয়। একই ভাবে মানবতা ও অহিংসার বাণী ঘোষিত হয়েছে ইসলামে। মহানবী (স.) বলেন- কেউই সত্যিকার মুমিন হতে পারবে না, যে পর্যন্ত সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অন্যের জন্য পছন্দ না করে। তিনি আরও বলেন- সত্যিকার মুসলমান তিনিই যার হাত, জিহ্বা ও ঠোঁট থেকে অন্যে মুক্ত। বস্তুত ইসলাম মতে মহান আল্লাহ্য় বিশ্বাস হলো সমস্ত পাপাচার ও অনাচারের দেয়াল স্বরূপ। অনুরূপভাবে বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গৌতম বুদ্ধ বলেন যে, কাউকে শারীরিক ও মানসিকভাবে আঘাত করা উচিত নয়, বরং মানুষের উচিত তাকে ভালবাসা এবং রক্ষা করা। মানবতাবাদ ও অহিংসার সাথে সাথে পবিত্র কুরআন ও উপনিষদে মানব ঐক্যের উপর গুরুত্বারোপ করেছে। যেমন- পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, সকল মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, ঐশী প্রেমের ধারণা মানুষকে ঈশ্বরকে ভালবাসতে শিক্ষা দেওয়ার সাথে সাথে অন্য মানুষকে ভালবাসতে, তার স্বার্থ সংরক্ষণ করতে উদ্বুদ্ধ করে।

প্রেম কেবল মানুষকে ভালবাসতে শেখায় না। ইহা মানুষকে উদার করে। অসাম্প্রদায়িক হৃদয়বৃত্তির জন্ম দেয়। সূফী ও বৈষ্ণবীয় প্রেম তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বৈষ্ণবদের উদারতার পরিচয় দিতে গিয়ে কোন এক কবি বলেন- বৈষ্ণবদের নাহি কোন জাত-ভেদ। আবার বৈষ্ণব কবি চন্ডিদাস

বলেন- "সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে কিছুই নাই"।

Dhaka University Institutional Repository

একইভাবে সূফীদের অসাম্প্রদায়িকতার পরিচয় দিতে গিয়ে কবি দৌলত কাজী বলেন যে, সূফীদের উদার অসাম্প্রদায়িক হৃদয়বৃত্তির কারণে এদেশে ইসলামের সাথে হিন্দু-বৌদ্ধ সংস্কৃতির সমন্বয় সম্ভব হয়েছিল। কোন সংস্কার নয়, এক অদ্ভুত মানবিক হৃদয়ানুভূতি ছিল সূফীদের সম্বল। সে অনুভূতি জাতিভেদ, বৃথা অহঙ্কার, আভিজাত্যবোধ, শ্রেণীর শোষণ এ সকল মানবীয় মূল্যবোধ বিরোধী ত্রুটিসমূহ থেকে একজন প্রেমিককে মুক্ত করে। প্রেমই তার অন্তরে বিরাজমান থাকে, সব ধরনের সাম্প্রদায়িকতা, জাতিগত ও ভাষাগত হিংসা-বিদ্বেষ চিরদিনের জন্য নির্বাসিত হয়। ঐশী প্রেমের এই উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে বাংলার এক সূফীর উক্তিতে: "প্রেমে রত যতজন নাহি কোন কুবচন, দ্বেষ-হিংসা, কদাচন, নাহি লয় মনে কখন। প্রেমে সহিষ্ণুতা করে, পর হিতে সদাই ফেরে, শত্রু-মিত্রের মঙ্গল করে সবারি সমানে হন"।

প্রেমের জ্ঞানতাত্ত্বিক গুরুত্বও মরমীদের চিন্তাধারায় অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। জ্ঞানের উৎপত্তি বিষয়ক মতবাদ হিসাবে স্বজ্ঞাবাদ দর্শনে আলোচিত একটি মতবাদ। সূফীর স্বজ্ঞার (কাশফ) সাথে প্রেমের আবশ্যিক সম্পর্ক রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। মরমী অভিজ্ঞতা বা অতিন্দ্রীয় অনুভূতি যে প্রেমের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত আল-গাযালী ও অন্যান্য বিখ্যাত সূফীদের রচনাবলীতে উল্লেখ রয়েছে। প্রেমের মাধ্যমে অতিন্দ্রীয় জ্ঞান লাভ করা যায় এধরনের বক্তব্য উপনিষদ ও গীতায়ও রয়েছে। সকল মরমীরাই এ বিষয়ে একমত যে, জগতের গূঢ় রহস্য বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জানা সম্ভব নয়। সাধারণত জ্ঞান লাভের প্রধান উৎস হিসেবে বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতাকে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে মরমীদের অভিমত হলো- বুদ্ধি আংশিক ঐক্যসূত্র স্থাপনে সক্ষম, কিন্তু জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়র দ্বৈততা সে সম্পূর্ণভাবে অতিক্রম করতে সক্ষম হয় না। আবার অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যে জ্ঞান লাভ হয় তাকেও অভিজ্ঞতার ভিন্নতা হেতু সর্বদা সত্য বলে গ্রহণ করা যায় না। একমাত্র প্রেমরূপ স্বজ্ঞা বা কাশফ এর মাধ্যমে মানুষ বস্তুসত্তার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এর যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে পারে।

পরিশেষে এ কথা বলা যায় যে, বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে যে হিংসা ও হানাহানি বিরাজ করছে এর প্রধান কারণ হলো প্রেমানুভূতির অভাব। সম্প্রদায়গত বিদ্বেষের উন্মেষ ঘটে স্বার্থের কারণে। ধর্মের মধ্যে যে বিদ্বেষের কোন স্থান নেই তা ধর্মকে যারা শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকতার গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছে তাদের পক্ষে কোনদিনই উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। প্রেমের মধ্যেই ধর্মের সত্যিকার শিক্ষা নিহিত, একজন প্রেমিকই প্রকৃত ধার্মিক।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

১। মৌলিক উৎস

ইসলাম ধর্ম:

আল কুরআন:

The Glorious Koran, trans, Pickthall, M., London: George Allen & Unwin Ltd. 5th ed.,1969

The Holy Qur'an, trans. & Commentary, 2 vols, Ali, Abdullha Yusuf, Lahore, 1938

কোরআন শরীফ, বঙ্গানুবাদ, ড: মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, আরবীর বাংলা উচচারণ, হযরত মাওলানা মফিজ উল্লাহ, চতুর্থ

তফসীর মাআরেফুল কোরআন, মুফতী মুহাম্মদ শফী, বঙ্গানুবাদ, মুহিউদ্দিন খান, মদীনা মোনাওয়ারা: খাদেমুল হারামাইন বাদশাহ ফাহদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হিজরী

হাদিস:

Imam Bukhari, Sahih Al-Bukhar, 9 vols., trans, Muhammad Muhsin khan, kitab Bhavan, 1984

Imam Muslim, Sahih Muslim, trans. Abdul Hamid Siddiqi, 4 vols., Lahore, Reprint 1987

ইমাম বুখারী (আবু আবদুল্লাহ ইবনে ইসমাঈল আল বুখার), বুখারী শরীফ, ১০ খন্ড, অনুবাদ, সিহাহ সিত্তাহ প্রকল্প, ইসলামিক

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দুধর্ম:

উপনিষদ, অনুবাদ, অতুলচন্দ্র সেন প্রমুখ, কলকাতা: হরফ প্রকাশনী, অখণ্ড সংস্করণ, ১ম মুদ্রণ, ১৯৯৪

বেদ, অনুবাদ, রমেশচন্দ্র দত্ত, ৫ খন্ড, কলকাতা: হরফ প্রকাশনী

শ্রীমদ্ভগবদগীতা, অনুবাদ, অতুলচন্দ্র সেন, কলকাতা: হরফ প্রকাশনী, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৭৫

২। গৌণ উৎস:

Ali, Maulana Muhammad, *The Religion of Islam*, New Delhi: S. Chand and co., 1950

Ali, Syeed Amir, *The spirit of Islam*, London: Methuen & Co. Ltd., 1922

Arberry, A..J., *Sufism, and account of the mystics of Islam,* London: George Allen & Unwin Ltd., 1950

Aurobindo, Sri, *The life Divine,* vol.1, India: Sri Aurobindo Ashram Pondicherry, 1973

Benjamin Walker, *Hindu World, an Encyclopedic Survey of Hinduism,* 2 Vols. London: George Allen & Unwin Ltd., 1968

Brandon, S. G. F., (ed.), *A Dictionary of comparative Religion,*London: Weidenfeld & Nicolson,2nd impression, 1971

Brody Baruch, *Readings in the Philosophy of Religion*(2nd ed), U.S.A, 1992

Chatterji, P., *Studies in Comparative Religion,* Calcutta: das Gupta Co. Pvt Ltd., 1971

Chatterji, S. C., *The Fundamentals of Hinduism,* (7th ed.), Calcutta University, 1970

Dhaka University Institutional Repository

Enamul Haq, *mohammad, A history of Sufism in Bangal,* Dhaka, Asiatic Society of Bangladesh, 1975,

Jurji, Edward J., ed., *the Great Religion of the Modern World,*New Jersey: Princeton University Press, Eighth Printing, 1967

Dasgupta, S. N., *Indian Idealism,* London: Cambridge University Press, 1933

....., *Hindu Mysticism*, Chicago: the Open Court Publishing Co., 1927

Dev, G. C., *Aspirations of the Common Man,* Dhaka: Dhaka University, 1963

Ghazali Imam, *Tahafut al Falasifa, Trans.,* Kemali, S. A., Lahore: Pakistan Philosophical Congress, 1985

Hammer Raymond, *Conceept of Hinduism,* The Worlds Religions, R. Pierce, Beaver &other (eds), England, 1989,

Hazrat Inayat Khan, *Ipiritual Liberty* ; *The Sufi message,* V.-v, Delhi, Motilal Banarsidass publishers, 1989

Hick, J., *Philosophy of Religion,* (2nd ed), New Jersey : Prentice Hall, 1973

Hamidullah, Muhammad, *Introduction to Islam,* Iran: Qum ; Ansarian publication, 1982

Hujwiri, *The Kashf Al Mahjub,* trans, Nicholson, Delhi, Taj Company, 1991 (edition)

Ikbal Ali Shah, *Islamic Sufism*, New Delhi, Adam publishers & Distributors, 1989

Iqbal, M., *The Reconstruction of Religious Thought in Islam,*(5th ed), New Delhi: Kitab Bhavan, 1994

Dhaka University Institutional Repository

Islam, Azizum Nahar, *The Nature of Self, Suffering and Salvation,* Allahabad: Vohra Puplishers, 1988

Jalaluddin Rumi, *The Mathnavi, trans. by Nicholson*, R.A., V,III, London, Lazac & co. Ltd. 1930

James William, *A Pluralistic Universe, U.S.A.*

Kalabadhi, Abu Baker al, *Kitab al –Ta'arruf li madhhab ahl al tasawwuf, Trans. Arberry, A.J., London, CambridgeUniversity Press, 1979*

Macdonald, D.B., *Aspecs of Islam,* New York: The Macmillan Co., 1911

....., *The Religious Attitude and life in Islam,* New York: AMS Press, Reprint-1970

Mariasusai Dhavamony, *Love of God, According to Saiva Siddhanta,* London, Oxford University Press

Matin, A., *An outline of Philosophy,* Dhaka: Mullick Brothers, 1968

Mia, Abdul Jalil, *Concept of Unity,* Dhaka : Islamic Foundation Bangladesh, 1980

Mukherji, A.C., *The Nature of the Self, Allahabad* : the Indian Press Ltd., 1943

Nicholson, R.A., *The Mystics of Islam,* Lebanon : Beirut ; khayats, 1966

....., *Islamic Mysticism,*New Delhi ; Aryan Books International, 1998

Otto, Rudolf, *Mysticism East and West,* New York, Living age Books, 1997

Radhakrishnan, S., *Indian Philosophy,* vol. I & II., London : George Allen & Unwin Ltd., Revised ed. 1929

....., *The Hindu View of Life,* London: Unwin Books, 1968

....., *Eastern Religious,* India,.

Shahbuddin, *The Awariful Ma'arif,* trans. persian to Eng.

H.Wilber force clarke, Delhi, Revised ed. 1987,

Smith, J.E., (ed.), *Philosophy of Religion,* New York : the Macmillan Company, 1965

Dhaka University Institutional Repository

Spencer, Sidney, *Mysticism in World Religion,* London : George allen & Unwin Ltd., 1963

Stace, W. T., *Mysticism and Philosophy,* New york, J.B. Lippingcott Company, 1960

Thilly, F., *A History of Philosophy,* (3rd ec.), New York ; Holt, Rinehart and Winston, 1957

Zaehner, R.C., *Hindu & Muslim Mysticism,* Oxford : Oneworld Publications, 1994

অরবিন্দ, *দিব্য জীবন*, ৫ম সংস্করণ, পন্ডিচেরী, শ্রী অরবিন্দ আশ্রম ট্রাষ্ট, ১৯৯৯

আমিনুল ইসলাম, *বাঙালির দর্শন ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৪.

....., মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি, ৩য় সংস্করণ, ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্থান, ১৯৯৬

..... *মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন*, ২য় মুদ্রণ, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ২০০০

আবদুল কাদের জীলানী, *ফতুহুল গয়ক*, অনুঃ মোহাম্মদ হাসান, চট্টগ্রাম ইসলামিয়া লাইব্রেরী, ১৯৭৬

আবদুর রাহীম, *সূফী তত্ত্বের আত্মকথা*, ঢাকা, নগর প্রকাশনী, ১৯৮৮

আশরাফ আলী থানবী, *শরীয়ত ও তরীকত*, (সঙ্কলন) দ্বীন সাহেব, অনুঃ আবদুল মজিদ ঢাকুরী, ২য় সংস্করণ, ঢাকা, ইমদাদীয়া লাইব্রেরী, ১৯৯৭

..... *রূহে তাসাওউফ*, উর্দু অনুবাদ, মুহাম্মদ শফী,বঙ্গানুবাদ, মুহাম্মদ হোছাইন, ২য় সংস্করণ, ঢাকা হাফিজিয়া কুতুবখানা, ১৯৯৭

আল্লামা হাফিয ইবনুল কায়্যিম, *রূহের রহস্য*, অনুবাদ, লোকমান আহমদ আমিমী, ঢাকা, ১৯৯৮

আবদুর রহমান, *কোরআন ও জীবন দর্শন*, ১ম ও ২য় খন্ড, চট্টগ্রাম, রহমানস পাবলিকেশনস, ১৯৬৩

আহমদ শরীফ (সম্পাঃ) *বাঙালার সূফী সাহিত্য*, ঢাকা, ১৯৬৯

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম গাযালী, *সৌভাগ্যের পরশমনি*, ৪ খন্ড, অনুবাদ, আবদুল খালেক, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৩৮

.....,*মিনহাজুল আবেদীন*, অনুবাদ, মজিবুর রহমান, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ

.....,*এহইয়াউ উলূমিদ্দীন*, *অনুবাদ এম,এন,এম ইমদাদুল্লাহ*, ৯খন্ড, নরসিংদী, তাজ পাবলিকেশন

ইসমাইল হোসেন সিরাজী, *হাকীকতে তাওহীদ*, ৩য় সংস্করণ, ঢাকাঃ ইসলামি ফাউন্ডেশন,বাংলাদেশ

..... , *তহাফুতুল ফালাসিফা*, অনুবাদ, আবুল কাসিম মুহাম্মদ আদমুদ্দীন, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০

....., *দাকায়েকুল আখবার*, অনুবাদ,আবদুল জলিল, ঢাকা: হক লাইব্রেরী, ১৯৯৫

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী, *দাকায়েফুল হাকায়েক*, অনুবাদ, মোহাম্মদ আবদুস সোবহান, ঢাকা: আল এহহাক প্রকাশনী, ১৯৯৭,

ইসমাইল হোসেন সিরাজী, *হাকীকতে হওহীদ*, ঢাকা ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৫

খলীফা আবদুল হাকীম, *ইসলামী ভাবধারা* (২য় সংস্করণ), অনুবাদ, সাইয়েদ আবদুল হাই, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭

গোবিন্দচন্দ্র দেব, *তত্ত্ববিদ্যা-সার*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৭৫

....., *ভাববাদ ও প্রগতি*, অনুঃ হোসনে আরা আলম, ঢাকা বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮

..... গোবিন্দচন্দ্র দেব, রচনাবলী, ৩য় খন্ড, সম্পাঃ হাসান আজিজুল হক, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৯

গুরুনাথ সেন গুপ্ত, *তত্ত্বজ্ঞান উপাসনা*, ৩য় মুদ্রণ, সত্যধর্ম মহামণ্ডল, বাংলাদেশ, ১৩৯৫

জালাল উদ্দিন রুমী, *মসনবীয়ে রুমী*, অনুবাদ মাওলানা আবদুল মজীদ, ৩ খন্ড, এমদাদীয়া পুস্তকালয়, ঢাকা, ২০০২

Dhaka University Institutional Repository

ডঃ তারাচাঁদ, *ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব*, অনুঃ করুণাময় গোস্বামী, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯, পৃ. ১৪ থেকে উদ্ধৃত

দেবর্ষি নারদ, ভক্তিসূত্র, কলকাতা,

দূর্গাদাস বসু সরস্বতী, *হিন্দুধর্মের সারতত্ত্ব*, ৪র্থ সংস্করণ, কলকাতা, কলকাতা সেবাশ্রম সংঘ, ১৪০৬

তন্ময় কুমার সরকার, *হিন্দুধর্ম ও দর্শনে ঈশ্বরের স্বরূপ*, (এম.ফিল. থিসিস), দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

নুরুল ইসলাম মানিক (সম্পাঃ) *ইসলামী দর্শনের রূপরেখা*, ২য় সংস্করণ, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৯

নিগূঢ়ানন্দ, *মৃত্যু ও পরলোক*, কলকাতা করুণা প্রকাশনী, ১৯৯৫

....., *আত্মার রহস্য সন্ধান*, কলকাতা দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৫

নেছার উদ্দীন আহমদ, *তালীমে মারেফাত, ছারছীনা, মুসলিম ষ্টোর*, ১৯৮৪

ফরিদ উদ্দীন আত্তার, *মান্তিকুত তোয়ায়ের*, অনুঃ আবদুল জলীল, ঢাকা, ইসলামিয়া লাইব্রেরী, ১৯৬৮

.....,*শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার আত্মা ও পরমাত্মা*, কলকাতা সাহিত্যম, ১৯৫

মুহাম্মদ মতিউর রহমান, *বাঙালির দর্শনঃ মানুষ ও সমাজ*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০০০, পৃ. ২৭

মুহাম্মদ আবু তালিব (সম্পাঃ), লালন শাহ ও লালন গীতিকা, ১ম খন্ড, ঢাকা, ১৯৬৮

মুফতী মুহাম্মদ শফী, *আত্মশুদ্ধি*, অনুঃ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান খান, ঢাকা মাকতাবাতুল আশরাফ, ১৯৯৯

মুহাম্মদ আবুল বাশার, *শরীয়ত ও মারেফাত পরিচিতি*, রাব্বানিয়া প্রকাশনী, ১৯৯৭

মমতাজ দৌলতান, *ধর্ম, যুক্তি ও বিজ্ঞান*, ঢাকা, জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ১৯৯৬

ময়াল, ডি. এডোয়ার্ডস্, *ধর্ম দর্শন*, অনুবাদ, সশীল কুমার চক্রবর্তী, ২য় সংস্করণ, পশ্চিম বঙ্গ, ১৯৮৯

Dhaka University Institutional Repository

শায়েখ শরফুদ্দীন আহমদ ইয়াহইয়া মানেরী (র.)*মাকতুবাতে সদী*, অনুবাদ,মীর হাসান আলী, ৩ খন্ড, ঢাকা, মীর পাবলিকেশনস্, ১৯৯৫

শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ, *শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ কথা মৃত্যু*, সমগ্র সংস্করণ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিকেশন্স, লিঃ ১৯৯০

সোলায়মান আলী সরকার, *ইবনুল আরাবী ও জালাল উদ্দীন রুমী*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪

স্বামী বিবেকানন্দ, *স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা* (সঙ্কলন), ২য় সংস্করণ, রামকৃষ্ণ মঠ, ঢাকা, ১৩৯৯

....., *ভক্তিযোগ*, চতুর্থ, সংস্করণ, কলকাতা, ১৩৪৯

স্বামী বেদান্তানন্দ, *ভক্তি প্রসঙ্গ*, কলকাতা, ১৩৬৮

সাইয়েদ আবদুল হাই, *দর্শন ও মনোবিদ্যা পরিভাষা কোষ*, ২য় খন্ড, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৬

সহিদুর রহমান, *মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি*, ২য় সংস্করণ, অনুবাদ ও সম্পাদনা, আমিনুল ইসলাম, ঢাকা নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৯১

হিরন্ময় বন্দোপাধ্যায়, *ভারতীয় দর্শন*, কলকাতা, ১৯৮০

স্বামী অভেদানন্দ, *মরণের পরে*, দ্বাদশ সংস্করণ, অনুবাদ, স্বামীপ্রজ্ঞানন্দ, কলকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯৭৫